ব রে ন ব সু

রঙরুট

বিভিন্ন ভাষায প্রকাশিত সংস্করণেব ভূমিকা সম্বলিত

পঞ্চম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬৪

বিভিন্ন সংস্করণের প্রথম প্রকাশ

হিন্দী	১৯৫৩
চেক	১৯৫৩
হাঙ্গেরীয়	১৯৫৩
ইংরেজী	১৯৫৪
চীনা	১৯৫৫
তেলেগু	১৯৫৫
রুশ	১৯৫৬
জার্মান	১৯৫৭

পাঁচ টাকা

সাধারণ পাবলিশার্স ৭ ওয়েষ্ট রো, কলিকাতা-১৭ হইতে নরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত
এবং রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস
প্রাইভেট লিঃ [illegible]

রু ড ব্ধ ট

লেখকের অন্যান্য বই

মহানায়ক
জঙ্গী ভিয়েৎনাম
নতুন ফৌজ
বাবুরামের বিবি
প্রান্তন (যন্ত্রস্থ)

প্রথম প্রকাশ ১৯৫০

শিলালিপি নয়, সেদিনের কথা

যুদ্ধ-সীমান্ত তখন এদেশে পেঁছে গেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ভয়াল অর্থনীতিক সংকট সৃষ্টি করে, তারই আড়ালে পেতেছে সৈন্য-সংগ্রহের ফাঁদ—মুখপাতে বাধ্যতামূলক নয়, আসলে কিন্তু তাই।

বিপ্লবের জিগির উঠলো দেশে, কারাবরণে ঘটলো তার সমাপ্তি।

বিপ্লব এলো না।

হতাশ মানুষেরা ভর্তি হলো সৈন্যদলে। তারা হলো দেশদ্রোহী। পল্টনী উর্দি গায়ে চাপালো, তার কলংক গায়ে আঁকলো, অত্যাচারে উৎপীড়নে দ'লে পিষে যেতে লাগলো।

তবুও এরাই যুদ্ধান্তে ফুঁসে উঠে জানালো মুক্তির দাবী। নিয়মতন্ত্রের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেতারা তখন রাষ্ট্রের প্রাকার খাড়া করতে ব্যস্ত—তাই দাবী উপেক্ষিত হলো।

বিপ্লব রয়ে গেলো অসমাপ্ত

রঙরুট তারই কাহিনী সৈনিক জীবনের পাঁচালি।

হিন্দী ১৯৫৩

শ্রীবরেন বসুর উপন্যাস রঙরুট খুবই খুশীর সঙ্গে হিন্দী পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। বাংলায় এই বইটীর দুইটি সংস্করণ হয়ে গেছে।

এই বইটী যখন সর্বপ্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয় তখন বাংলার লেখক ও পাঠকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সকলেই একবাক্যে এই উপন্যাসের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এই উপন্যাসটী বাংলা সাহিত্যের সীমারেখা বিস্তৃত করেছে এবং তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই উপন্যাসটীর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাঠকগণ নিজেরা পড়েই জানতে পারবেন। তবুও এইটুকু বলা আবশ্যক যে, লেখক যে প্লট নির্বাচন করেছেন তা আমাদের কাছে একদম নতুন। যেহেতু লেখককে পরাধীন ভারতের সৈনিক জীবনের তিক্ততা, অপমান ও অসম্মানের গ্লানি ভোগ করতে হয়েছে, সেই জন্য তথাকথিত প্রচলিত 'প্রেম কথা' থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বইটী খুবই মার্মিক ও হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

বইখানির বাস্তবতা আর সজীবতা এমনই যে, পড়বার সময় মনে হয় যেন একটী সত্য ঘটনার বর্ণনা পড়া হচ্ছে। আমাদের দেশের লাখ-লাখ যুবক যারা সৈনিক-জীবন যাপন করেছে, তাদেরই অনুভূতি একে পুষ্ট করে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সার ফলস্বরূপ সম্ভাব্য যুদ্ধকে চিরকালের জন্য খতম করতে ইচ্ছুক আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে এই উপন্যাসটী বিশ্ব-শান্তির পূণী শীতল বারিধারার মত মনে হবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

চেক্ ১৯৫৩

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে অমল নামে এক ভারতীয় যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে চাকুরী খুঁজছে—বরেন বসুর উপন্যাসখানি তারই জীবনের কাহিনী। তিনমাস ধরে চাকুরীর চেষ্টা তার বৃথা হল। অবশেষে এক বন্ধুর পরামর্শে সে গেল রিক্রুটিং কেন্দ্রে এবং ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীতে যোগ দিলে। ইঙ্গ-ভারতীয় এই ভাড়াটে বাহিনীতে যে সব ভয়াবহ ঘটনা বিদ্যমান, অমল তার সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হল। ইংরেজ উপরওয়ালাদের চোখে ভারতীয় সৈনিকরা তো ভেড়ার পাল ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষা-শিবিরের জীবনের বর্ণনা লেখক পূর্ণভাবেই দিয়েছেন—আর সে বর্ণনা ভয়াবহ বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসখানি পড়ে পাঠকের ফ্যাসিস্ত বন্দীশিবিরের কথা মনে না পড়ে পারে না। ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর দুর্বিসহ জীবন এখানে পরিস্ফুট—বইখানি তাই সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর এক বিশিষ্ট পরিচিতি। এতে, আমাদের জনগণতন্ত্রী বাহিনী তার সৈনিকদের প্রতি যে যত্ন করে থাকেন, আর ইংরেজরা তাদের সৈনাদের প্রতি যে অবহেলা করে থাকে, তা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাঠকরা পাবেন। তা ছাড়াও বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ভাড়াটে সৈন্য আর আমাদের দেশের রক্ষকদের মহান আত্মার সঙ্গেও তাঁকে মিলিয়ে দেখতে হবে। এই জন্যই শ্রী বসুর উপন্যাসখানি আজকের বিশ্বশান্তির সংগ্রামে এক শক্তিশালি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মহা দুর্বলতা আর ভাড়াটিয়া সেনা-বাহিনীর নৈতিক অধঃপতন বইখানির উপজীব্য।

হাঙ্গেরীয় ১৯৫৩
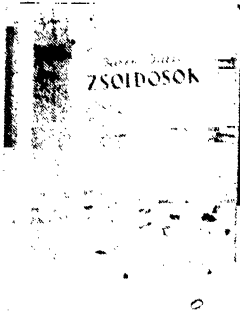
কয়েক শতকের সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের পর অবশেষে বারো কোটী বাঙালী তাঁদের নিজেদের কথা শোনাতে পারছেন। হাজার হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতির গৌরবে এঁরা গৌরবান্বিত হয়েও ঔপনিবেশিক শাসনে এবং শোষণে এঁদের অবর্ণনীয় অধঃপতন ঘটেছিল। দুঃখ-দুর্দশায় এঁরা ডুবে গিয়েছিলেন। এ-কথা সত্য যে, বিশ্ববিজয়ী ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলির পরাজয়ের পর বাংলার মানুষ উৎপীড়ক ও মহাজনেব হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন; কিন্তু এখনো পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁরা পাননি। এঁরা উন্নত জীবনের দাবিদার, তাই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোর মধ্যে থেকেও স্বাধিকারের দাবি তুলেছেন, এঁদের প্রগতিবাদী লেখক আর কবিরা আজ মুখর হয়ে উঠেছেন, আর বাংলা সাহিত্য তাই দ্রুত উন্নতিব পথে চলেছে।

প্রগতিপন্থী সাহিত্যে ভারতীয় জীবনের সত্য ছবি সুপরিস্ফুট। সামাজিক বাস্তবতার প্রকৃত প্রতিফলন দেখা দিয়েছে, মেহনতী মানুষের শোষণের কারণ ফুটে উঠেছে, শোষকের স্বরূপ সে প্রকাশ করছে। বাংলা সাহিত্য শোষণকারী সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের ভুঁইফোড় তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে হয়ে উঠেছে এক জোরদার হাতিয়ার।

বরেন বসু তরুণ প্রগতিকামী বাঙালী লেখকদের একজন। তাঁর 'রঙরুট' প্রগতি সাহিত্যের সেরা উপন্যাসগুলির একখানি। ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীতে যে ভয়াবহ অবস্থা ছিল, এখানে তারই মূর্ত প্রকাশ। ভাড়াটে ফৌজের দুঃখ-দুর্দশার খবরও এতে মেলে। তারা ভুখার জ্বালায় শোষকের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ে। ভারততো মনোহর যাদুর দেশ নয়, এ এক ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশার ভূমি, অভাব আর রোগের আকর। ধনবাদী শিল্পীরা এই হতভাগ্য দেশকে যে অবগুণ্ঠনে মুড়ে দিয়েছিলেন, 'রঙরুট' সেই অবগুণ্ঠন টান মেরে খসিয়ে দিয়েছে, ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে। উপন্যাস-খানিতে আমরা বাঙালী পরিবারের পরিচয় পাই—অভাব আর রোগে তারা জর্জর, উপবাসি জনগণ নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের কাছে, আর সাম্রাজ্যবাদ দেশকে বঞ্চিত করেছে স্বাধীনতা থেকে, দেশের মানুষকে করেছে লাঞ্ছনা। জাপান চড়াও হয়ে এসেছিল দেশ দখল করতে, তার পরাজয়ে এল হিসেব-নিকেশের পালা।

বাঙলার মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ভিড়ে গেলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শোষিত

জনগণকে শিকলে বেঁধে রেখেছিল, তাঁরা তা চুরমার করে ফেললেন। ব্রিটিশ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে তুলে দিল রাজনীতিক অধিকার। নয়া সরকার মেহনতী মানুষের মন জয় করে নিলেন তার ব্যাপক কৃষি সংস্কার আর বৃহৎ শিল্পের জাতীয়-করণ পরিকল্পনায়। কিন্তু সংস্কার তো শুধু প্রতিশ্রুতিই হয়ে রইল। বাঙালীর বুঝতে দেরী হল না যে, এক শোষকের বদলে এসেছে আর-এক শোষক—আমদানী হয়েছে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ। বিদেশী শোষক যেগুলি টোপ ফেলেছিল, দেশী বুর্জোয়ারা সেই টোপগুলিই গেলবার চেষ্টা করছে।

হাঙ্গেরীয় পাঠকের এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ পড়বার সুযোগ হল। এই প্রথম বাংলার মানুষের জীবন আর আজাদির লড়াইয়ের খাঁটি বিবরণ আমরা পড়তে পেলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁরা এমন দুর্দশা সয়েছেন, এমন শোষিত হয়েছেন, তাঁরা তো শীঘ্রই আজাদি পাবেন—যেমন পেয়েছেন আমাদের শক্তিশালী এশিয়ার ভ্রাতা চীনাগণ। এশিয়ার দাসত্ব-বন্ধনে বাঁধা মানুষ তাঁদের শিকল ধরে জোরে নাড়া দিচ্ছেন। বাঙালীর কাছে তাই পূর্ণমুক্তির দিন আগত।

ইংরেজী ১৯৫৪

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপি সংগ্রামে সক্রিয়-ভাবে যোগদানের জন্যই বরেন বসু ১৯৪২ সালে ফৌজে ভর্তি হন। তাঁর ফৌজি জীবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীতে ভারতীয় সিপাহীর প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামেরই কাহিনী। সামান্য বা সাজানো অভিযোগে তিনি বার বার সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

'রঙরুট' লেখকের ফৌজি-জীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশের পর বইখানি ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

চীন ১৯৫৫

新兵

'রঙরুট' সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যের একখানি সুরচিত উপন্যাস। ১৯৫০ সালে বাংলা ভাষায় উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয়, তখনই ইহা ভারতের সর্বত্র অত্যন্ত সমাদৃত হয়। অনতিবিলম্বে হিন্দী ও ইংরাজিতে উপন্যাসটির অনুবাদ হয়। ১৯৫৩ সালে জনতান্ত্রিক হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায়, হাঙ্গেরীয়ান ও চেক ভাষায় ইহা অনূদিত হয়। উভয় দেশে উপন্যাসটি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারতবর্ষ যখন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ছিল, তখন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে সব সামরিকবাহিনী সংগঠিত করে, সেই রকম একটী বাহিনীর সৈন্যদের জীবন-যাত্রা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর যুবকদের, প্রধানত কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের ছবি এতে অংকিত হয়েছে। অংকিত হয়েছে, সৈন্যদলে যোগদানের আগে ও পরে তাদের ধ্যান ধারণার বিবর্তন, পরিবর্তন।

ভারতীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামের যুগসন্ধিক্ষণে, লেখকের সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর জীবনযাত্রাকে বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করার এক গভীর তাৎপর্য আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ভারতীয় জনগণের স্বাধীকার দাবীর সংগ্রাম এতে প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় জনগণের জাতীয় স্বাধীকার অর্জনের দাবী, তাদের যুদ্ধবিরোধী মনোভাব ও ফ্যাসিস্ত-বিরোধী প্রতিরোধ, এই সৈনিকদের সংগ্রাম, সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই বিশ্বযুদ্ধে, ফ্যাসিবিরোধী জনগণের শক্তিমত্তা ও সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের নেতৃত্বে দুনিয়ার দেশে দেশে মানুষের সামরিক পরাক্রম হিটলার জার্মানী ও জাপানকে পরাস্ত করে। বিশ্বজনগণের এই বীরত্ব দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামেও নব প্রেরণা আনে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের ওপর এই পরিস্থিতির সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ে। তারা একদিকে, সৈনিকজীবনের নিরন্ধ্র গ্লানিময় জীবন যাপন করেছে, আর একদিকে তাদের চোখ জেগে থেকেছে মস্কোয়, স্তালিনগ্রাদে, যেখানে সোবিয়েৎ বাহিনীর বিজয় ঘোষিত হয়েছে। সোবিয়েৎ বাহিনীর বিজয় তাদের জীবনে সূর্যের খবর এনেছে, আগ্রহে আশায় তারা আবার জ্বলে উঠেছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে।

যখন হিটলার বাহিনী মস্কোর দেওয়ালে আক্রমণে আছড়ে পড়ছে, তখন উপন্যাসের

কাহিনীর সুরু। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অমল। বি, এ পাশ। অন্য ঔপনিবেশিক দেশের যুবকদের মতই সুদীর্ঘ বেকারী আর দারিদ্রের চাপে, সে নিরুপায়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদলের রেলওয়ে ইউনিটে যোগ দেয়। শিক্ষানবিশীর সময়ই সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর স্বরূপ তার চোখে পড়ে। তাদের দেশকে লড়াই করে বাঁচাবে এমন সাহসী জঙ্গী সৈন্য তৈরী করা এই সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল না। তারা চেয়েছে কুত্তার মত ভীরু, হাতিয়ারধারী যন্ত্র, যাদের ওপর তারা হুকুম চালাতে পারে। বৃটীশের নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যই ভারতীয় সৈনিকদের হাতে অস্ত্র দিয়ে জাপানী ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদীরা এই সৈনিকদের দিয়েই তাদের স্বদেশবাসীদের ওপর হামলা করিয়েছে। এমন কি, নিরস্ত্র জনগণের ওপর গোলাগুলী চালাতে বাধ্য করেছে। তারাও চূড়ান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী অধিকর্তাদের দ্বারা দলিত হয়েছে, মর্মান্তিক হয়েছে তাদের পীড়ন, তবু এই সব বেচারারাই আবার তাদের স্বদেশবাসীদের ঘৃণার পাত্র হয়েছে। অমল ও তার অন্যান্য সহকর্মী জয়ন্ত প্রভৃতিকে এই স্ববিবোধী অবস্থার তীক্ষ্নতম পর্যায়ে উপনীত হতে হয়েছে। সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী সামবিক বিভাগ ও ইংবাজ অফিসারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিলিত হযে তারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হযেছে। শেষ পর্যন্ত একদিন তাদের রাইফেল তারা ঘুরিয়ে ধবে শ্লোগান দিয়েছে, "সাম্রাজ্যবাদী ভারত ছাড়।" তারা এক আজাদ ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংগঠিত কবতে চেয়েছে। মাতৃভূমি ও জনগণকে রক্ষা করতে, সমস্ত রকম আক্রমণ বোধ করতে, তাবা এক প্রকৃত জনবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াস করেছে।

সৈন্যবাহিনীর জীবন যাত্রাব কাহিনীকে মূলতঃ কেন্দ্র করে, লেখক ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক তথা সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতির এক বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। ভারতীয় জনগণের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদেব অবজ্ঞামূলক মনোভাব, গুরুভার শোষণে নিপীড়িত ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়েব অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সহরের মজুর, মধ্যবিত্ত—তাদের বছরেব পর বছর বেকারী, দুর্ভোগ, নিপীড়ন, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্তরের জনজীবন, উপন্যাসে মুখ্যতঃ লেখক এইগুলিই ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্মা থেকে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর পশ্চাদপসরণ যুদ্ধের চিত্র হিসাবে, লেখক বেছেছেন। অগণন পলাযণপর সাধারণ মানুষ ও পযুর্দস্ত পশ্চাদপসরণ-বত সৈন্য, জাপানী বোমা ও মেশিনগানের দাপটে, ক্ষুধায়, রোগে, যন্ত্রণায় তাদের মৃত্যু, লেখক এইসব বাস্তব ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসে ফুটে আছে সেইসব কাহিনী, কেমন কবে ক্ষুধাব জ্বালায় তবুণী দেহ বিকিয়েছে, কেমন করে দান-ছত্র খোলার নামে, ফাটকাবাজরা, কালোবাজারীরা, বর্মার পথে পথে, ভাবতমুখো এইসব নিরুপায় মানুষের ওপর ডাকাতি করেছে। উপন্যাসে, ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখকের প্রবল আপত্তি ধ্বনিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, উপন্যাসটী বাস্তবতায়, তথা রাজনৈতিক তাৎপর্যে, সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যে একটী মূল্য-

ভাষণে, বিশ্বজনগণের কাছেও উপন্যাসটীর যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। অবশ্য এই উপন্যাসের মূল আবেদন ভারতীয় জনজীবন চিত্রণে। এই উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে, ভারতীয় যুবশক্তির উচ্ছল প্রাণোন্মাদনা, তাদের ন্যায়বোধ, নিপীড়িত জনতার সম্বন্ধে তাদের আন্তরিক সহানুভূতি, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকা, ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ, জীবনের প্রতি তাদের ভালবাসা, তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এখানে আমরা আরও পাই, ভারতীয় জনগণের স্বাধীন, সুখী, দেশগঠনের সংগ্রামের বিবরণ, বিশ্বশান্তির জন্য তাদেব সংগ্রাম।

লেখক বরেন বসু সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানি। তিনি বাঙ্গালী। ১৯৪২ সালে, ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণেব মানসে তিনি ভাবতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু তাঁব সে আশা পূরণ হয না। সৈন্যবাহিনীতে তিনি, ভারতীয় সৈন্যদের স্বপক্ষে, অত্যাচারী বৃটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে, বারবার লড়াই করেন। ফলে তাঁকে বহুবার শাস্তি পেতে হয়, কাবাদন্ড ভোগ করতে হয়। **'রঙরুট'** তাঁর প্রথম রচনা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অনেক বাস্তব উপকরণ তিনি পান, তারই ওপর গড়ে উঠেছে, উপন্যাসেব সুসমৃদ্ধ বাস্তবতা। ১৯৫৪ সালে পিপলস্ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, উপন্যাসেব ইংবাজী সংস্করণ থেকেই চীনা অনুবাদটী কবা হয়েছে। বইব ছবিগুলিও ইংবাজী অনুবাদ থেকে নেওযা, চিত্তপ্রসাদের আঁকা।

তেলেগু ১৯৫৫

শ্রী বরেন বসুর বাংলা উপন্যাস 'রঙরুট'-এর এখানি অনুবাদ। এই উপন্যাসে লেখক তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এক সুষ্ঠু, সুন্দর রূপ দিয়েছেন।

গত ফ্যাসি-বিরোধী মহাযুদ্ধে বিভিন্ন স্তরের মানুষেব প্রতিক্রিয়া, যুদ্ধমান দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, উপায়ান্তরবিহীন ভারতবাসীর যুদ্ধে যোগদান আর সেদিনের শাসক সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত ব্রিটিশ অফিসারগণের ভারতীয় আর অন্যান্য ঔপনিবেশিক ফৌজের উপর দুর্ব্যবহার আর নিষ্ঠুরতার চিত্র লেখক অসাধারণ বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রঙরুট-এর তেলেগু অনুবাদ করেছেন সনিপল্লী টাটাকারিয়া। বইখানি সেই বিগত মহাযুদ্ধের দিনের জীবনের এক ব্যাপক ভাষ্য—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার স্থান বহু উর্ধ্বে।

রুশ ১৯৫৬
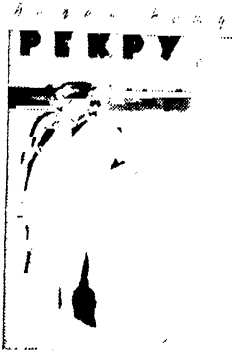
সোবিয়েৎ পাঠকেরা প্রতিভাশালী ভারতীয় লেখক বরেন বসুর বিশিষ্ট রচনাটীর সঙ্গে এখনও পরিচিত ন'ন।

১৯১৬ সালের ২৫শে জুলাই কলকাতায় বরেন বসুর জন্ম হয়। চৌদ্দ বছরের কিশোর যখন তিনি, তখন থেকেই তাঁর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে লেখকের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'বৃহত্তর সম্ভাবনা' প্রকাশিত হয়, ও বাংলার সাহিত্যজগতে সেখানি সাদরে গৃহিত হয়।

১৯৪২ সালে যখন জাপ্ সামরিক বাহিনী ভারতের সীমান্তে এসে হানা দেয়, তখন বরেন বসু ইংগ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন—তিনি আশা করেছিলেন যে এতে করে প্রত্যক্ষ ভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ মিলবে। সেনা-বাহিনীর চাকরী লেখকের পক্ষে এক কঠিন-কঠোর পাঠশালা হয়েই দেখা দিল। ঔপনিবেশিক সেনা-ছাউনিগুলির কুশ্রী বাস্তবতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন—যুদ্ধ তাঁর চোখের সামনে ভয়ংকর হয়ে দেখা দিল।

মহাযুদ্ধের পরে বরেন বসু গণজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়লেন, শান্তি সংগ্রামে যোগ দিলেন। তাঁর 'রঙরুট' এই শান্তির ভাবধারারই বিকাশ।

ক্ষুধা আর বেকারীর তাড়নায় ঔপনিবেশিক সেনাদলে যোগদানে বাধ্য ভারতীয় সৈনিকের দুর্ভাগ্যময় জীবন-কাহিনী বইখানির উপজীব্য। উপন্যাসের নায়ক অমল এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের সন্তান। সেনাবাহিনীতে ঢুকে পল্টনী জীবনের প্রাত্যাহিক-তার সঙ্গে পরিচিত হল—দেখতে পেল তার হীনতা, উচ্ছৃংখলতা, উৎকোচ গ্রহনের কুশ্রীতা; আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সাধারণ সৈনিকদের প্রতি বিদ্রুপের ভাগও সে পেল।

এই ঔপনিবেশিক সেনা-ছাউনিগুলি শ্রমিকদের হোস্টেল নয়, সেখানে তো মানুষ শত অভাবে বা শোষণেও তাদের আত্মমর্যাদা হারায় না। এ যেন এক আড়াল, যেখানে মানুষ মূক ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কিন্তু এই জীবনেও আলোর

পথের সম্ভাবনা দেখা দেয়, এই আলোর দূত অমল আর তার বন্ধুরা। এরা সাধারণ মানুষ, সৎ মানুষ। একই গোলক ধাঁধায় এরা ঘুরে মরছে—তারা মনপ্রাণ দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে ভালবাসে, আবার যে সেনাবাহিনী মাতৃভূমিকে অধীন করে রাখছে তাতে এসেও যোগ দেয়। অমল, জয়ন্ত আর অনন্তের চরিত্রে বিভিন্ন ভাবধারা আর স্তরের মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে বরেন বসু দেখিয়েছেন যে, সেনাবাহিনীর অনেক মানুষ নিজেদের দেশের প্রতি কর্তব্যে উদ্দীপ্ত। অতি নিপুনতা আর আবেগের সঙ্গেই তিনি পাঠকের সম্মুখে এনে তুলে ধরেছেন সৈনিকদের সত্য অভিজ্ঞতা, তাদের দেশাত্মবোধ প্রকাশের কামনা—তাদের সংগ্রাম।

অমল এবং অন্যান্য সৈনিকদের পাঠানো হ'ল আসামের এক সেনা-ছাউনিতে। এইখানে এসে তারা সীমান্তের পরিচয় পেল। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, কঙ্কালসার মানুষের দেখা মিলল। এই বাস্তুহারাদের সঙ্গে মিশে, তাদের সঙ্গে কথা বলে তারা জানলো দুর্দশগ্রস্ত নারী আর শিশুদের মর্মন্তুদ ইতিহাস। ঔপনিবেশিক ভারতের এমনি দশা যে, তারা যে শুধু সাহায্যই পায় না তা নয়, আবার তারা স্টেশনে স্টেশনে মাড়োয়ারী ও মহাজন দ্বারা শোষিত ও লুণ্ঠিতও হয়েছে। অভাবে পীড়িত মেয়েরা একমুঠো অন্নের জন্য নিজেদের বিক্রী করে দেয়। যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা এই সব কারণ থেকেই জেগে ওঠে—আর সৈনিকদের জীবনেও তা কায়েম হয়ে থাকে।

এই যে বন্দীজীবনের কালো ছবি, লেখক এর বর্ণনা দিতে গিয়ে ব্যাহত করেননি তাঁর উপন্যাসকে। পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জাতির স্বাধীনতার জন্য ভারতের মানুষের সংগ্রাম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় জীবনের স্পষ্ট ছবি।

বরেন বসু দেখিয়েছেন ভারত আর সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি আর বন্ধুত্ব কতখানি গভীর। হিটলারী হানাদারদের বিরুদ্ধে এক নিঃস্বার্থ যুদ্ধে রত সোবিয়েৎ জনগণের পক্ষে রয়েছে তাদের মন। স্তালিনগ্রাদের কাছে জার্মান সেনাবাহিনীর পরাজয়, সোবিয়েৎ জনগণের বিজয়ে, তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষই একমাত্র নিজেদের দেশের ঘাঁটি-রক্ষাকারী হতে পারে।—রুশরা জিতবেই কারণ ওরা জানে—কি ওরা রক্ষা করছে।

মানবতা, উদারতা, দেশভক্তি, ভারতের মানুষের সবচেয়ে মহৎ গুণগুলি অমল আর তার সহকর্মীদের চরিত্রে রূপ নিয়েছে। ওরা তাই ওদের সেনা-ছাউনির জাহান্নামে বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে দমিয়ে দিতে সমর্থ হ'ল। সমস্ত পল্টন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এল। জয়ন্তর একটি কথা মনে পড়ে—

সৈন্যেরা যদি কখনও দেশেব জন্যে নিজেব জীবন দান কবে তবেই তাদের ভাড়াটে সৈন্যেব লজ্জা ও অপমানেব প্রাযশ্চিত্ত হবে।

এইভাবেই শেষ হ'ল ববেন বসুব উপন্যাস। অন্যভাবে তো শেষ হতে পারে না। জীবনে তো এমনই হয।

'বঙবুট' উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যেব একটী নতুন বচনামাত্র নয, একটী আবির্ভাব। এখানে কিছুই চিবাচবিত চালে বযে চলেনি। অন্য লেখকদেব কাছে এব ঋণও খুবই সামান্য। উপন্যাসখানি জীবন্ত, দেশ আব সেনা ছাউনিব নির্মম ছবি আছে এখানে, এব বিষাদ-সুব মানুষেব মনে গিযে বেঁধে, সত্য আব ন্যাযেব মর্মে গিযে পেঁছিয। মানবতা বোধেব খাঁটি বচনা হিসেবে বইখানি মহান আব উন্নত ভাবধাবা জাগিযে তোলে। যে বাস্তব ভাষা ববেন বসু নিপুনভাবে ব্যবহাব কবেছেন, সেই পথে আজকেব ভাবতীয গদ্যেব নতুন শ্রীবৃদ্ধিব সম্ভাবনা বযেছে। তাঁব নাযক যেমন ভাবতীয মানুষেব স্বাধীনতাব নামে ঔপনিবেশিক সেনা-ছাউনিব প্রতিক্রীযাশীল শক্তিব বিবুদ্ধে জযলাভ কবেছে, তেমনি ববেন বসুব এই উৎকৃষ্ট উপন্যাস জয কবেছে পাঠকেব হৃদয। বহুপঠিত বইগুলিব মধ্যে ববেন বসুব উপন্যাসখানি স্বাধিকাবেই বিশিষ্ট আসন পেযেছে। আব পৃথিবীও যে বইখানি সম্বন্ধে এমন আগ্রহান্বিত, সেটাও আকস্মিক নয। গত চাববছবে বইখানি বাংলা থেকে হিন্দি, তেলেগু, ইংবেজী, চেক, হাঙ্গেবীয, চীনা ও জার্মান ভাষায অনূদীত হযেছে।

নিকোলাই টিখনভ

জার্মান ১৯৫৭

১৯১৬ সালেব ২৫শে জুলাই ববেন বসুব কলকাতায জন্ম হয। চৌদ্দ বছব বযেস থেকে তিনি মাতৃভূমিব স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে বেবোয তাঁব প্রথম গল্পেব বই 'বৃহত্তব সম্ভাবনা'। তাঁব দেশেব পাঠকেবা বই-খানিকে সাদবে গ্রহণ কবেন।

জাপানীবা যখন ভাবত সীমান্তে এসে হাজিব হয—ফ্যাসিবাদেব বিবুদ্ধে লডাই কববাব জন্য, তিনি ১৯৪২ সালে ইঙ্গ-ভাবতীয সেনাবাহিনীতে যোগ দান

করেন। সে এক কঠিন-কঠোর অভিজ্ঞতা—তিনি সেখানে ঔপনিবেশিক সেনা-ছাউনির কুশ্রীতা আর যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে পরিচিত হন।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই 'রঙরুট'-এর জন্ম। এতে আত্মজীবনীর যথেষ্টই উপাদান আছে, কিন্তু অতিরঞ্জন বা ছক-মাফিক রূপের আভাস নেই। এ এক জীবন্ত উপন্যাস। এর থমথমে আবহাওয়া মানবতা, সত্য আর ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাসে দীপ্ত। ভারতীয় মানবতাবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বইখানি, আর ভারতীয় গদ্যসাহিত্যেও তার বিশিষ্ট স্থান আছে।

গত চার বছরে রঙরুট-এর ইংরেজী, হিন্দি, তেলেগু, চেক, হাঙ্গেরীয়, চীনা আর রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

বইখানির বক্তব্য পাঠককে সঙ্গে সঙ্গেই আকৃষ্ট করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভারত তার চোখের সুমুখে ভেসে, 'হাজারো আশ্চর্যের দেশ'এর রোমান্টিক কাঠামো-টার আর কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের চাবুকের তলায় কোটি-কোটি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ আর জাপ সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতা প্রকটিত হয়। বুভুক্ষা আর দুর্দশায় জন্ম নেয় ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা। কি করে এক বিদ্রোহের অন্ধ আবেগ থেকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির মুক্তি-কামনায় মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে তার ক্রমবিকা-শের ধারা অপূর্ব শক্তির সঙ্গে বরেন বসু বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় ভাড়াটে সেনাবাহিনী হয়েছে তাঁর উপজীব্য। যুবকেরা কাজ আর ভাতের অভাবে বাধ্য হয়ে হয়েছে রঙরুট। এই দুঃখ-দুর্দশার হাপর থেকেই জন্ম নিয়েছে তাদের এই দশা বদলে দেবার কামনা। উপসংহারে যখন ইংরেজ মেজর নেলসনের বুকের উপরে সঙ্গীন উঁচিয়ে ধরেছে সংগ্রামীরা, বজ্রগর্জনে হেঁকে উঠেছে 'হল্ট', তখনই মনে হয়—দুনিয়ার যত উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির দিন আগত।

মস্কো হো গয়া! হিটলার মস্কো লে লিয়া—

চলন্ত বাসের মধ্যে যাত্রীরা হেঁকে ওঠে, এই টেলিগ্রাফওলা ইধর্!

গাড়ী থামল বৌবাজারের মোড়ে। হকারের দল বাসখানাকে ছেঁকে ধরেছে। কন্ডাক্টর ইতিমধ্যে টাইম নোট করিয়ে ঘন্টি মেরে দেয়। হকারের দল আর একটা ট্রামের পেছনে ধাওয়া করে! জনকয়েক লাফ মেরে চিৎকার করে ওঠে, মস্কো খতম্! হিট্লার ইন্ডিয়া আ রহা—

বাসের মধ্যে জনদুই কাগজ কিনেছে। ঠুলি-লাগান আলোর তলায় বসে কাগজ পড়ার যথেষ্ট অসুবিধে! তা বললে কি হবে, আশ-পাশ থেকে আরও কয়েকজন কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। হেড-লাইনটা দেখে নিয়ে এক ভদ্রলোক মুরুব্বীয়ানা চালে বলে উঠলেন, আরে মশাই চাষাভুষোর জারিজুরি আর কতদিন! লড়তে গেছে কিনা জার্মানির সঙ্গে! মস্কো খতম মানেতো ইন্ডিয়ায় আসার পথ পরিষ্কার!

এলেইতো বাঁচি দাদা, এই কলুর ঘানি যে আর টানতে পারি না! আসুক একবার হিটলার তখন শালাদের কে বাঁচায় তাই দেখব!

ঠিক বলেছেন দাদা, বেটাদের মুরোদতো কত! নিজেদের দেশই সামলাতে পারে না আবার ইন্ডিয়াকে সামলাবে! স্লিট-ট্রেঞ্চ কেটে আর ব্ল্যাক আউট করে বসে থাকলে যেন কেউ দেখতে পাবে না! শুনতে পাই লন্ডনতো গড়ের মাঠ হয়ে গেছে!

আরেঃ তাও বুঝি জানেন না! আমাদের বড়সাহেব প্যাসেজ বুক্ করেছিল প্রায় মাসতিনেক আগে। আজ আমি গিয়ে টাকা ফেরৎ নিয়ে এলুম। বাছাধনদের আর 'হোমে' ফিরতে হচ্ছে না'

বাসের কোণে যে জায়গাটায় সবচেয়ে অন্ধকার সেখান থেকে প্রবীণ এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ মশাই মস্কো কি সত্যিই ফল্ করল নাকি?

একজন টিটকারি দিয়ে ওঠেন, তাতে আপনার কি পাকা ধানে মইটা যাচ্ছে শুনি?

প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, তা একটু যাচ্ছে বৈকি! রাশিয়া হেরে

গেলে আর হিটলার ভারতে এলেই যদি স্বাধীন হয়ে যেতুম তাহলে মোটেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন হিটলার বৃটিশেরই মাসতুতো ভাই, আমাদের কেউই নয়!

বিজয় উল্লাসে কেমন যেন ভাঁটা পড়ে যায়। জনকয়েক বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে প্রবীণ ভদ্রলোকের দিকে বারেক চেয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়!

ওয়েলিংটনের মোড়। অমলের নামবার সময় হয়েছে। নামবার আগে আরও একবার সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের ধীর গম্ভীর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখে। বাস থেকে নেমে পড়ে প্রস্রাবখানার দিকে যেতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিরাট দুই লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেছে! যুদ্ধের দৌলতে এ এক নতুন ঢঙ হয়েছে! সব কিছুর জন্যই লাইন লাগাতে হয়! কিন্তু যতক্ষণে তার পালা আসবে ততক্ষণ অপেক্ষা করার মত অবস্থা তার নয়! অমল ভাবল, মাঠের মাঝখানে কাজটা সেরে নিলে কেমন হয়! ব্ল্যাক-আউটের দৌলতে কেউতো আর তাকে ওই দুষ্কর্ম করতে দেখতে পাচ্ছে না।

পার্কের কোণে বক্সিং-স্ট্যাডিয়াম। ঢাকনি-ঢাকা আলোর তলায় দুজন তখন বক্সিং লড়ছে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ল, বক্সিং দেখতে তার বেশ লাগে। এককালে তার শেখবার ঝোঁকও হয়েছিল! কিন্তু কি এমন পরমার্থ লাভ হত! চাকরির বাজারে বক্সিংতো আর এডিশন্যাল কোয়ালিফিকেশন নয়!

আবার অমল হাঁটতে সুরু করল। পশ্চিম-গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই তার মনে পড়ল, কাজটা এবার সেরে নিতে হবে। ব্ল্যাক-আউটের রাত, ঠুলি-লাগান আলোর তলায় সমস্ত মাঠটা কেমন যেন ধাঁধাল হয়ে উঠেছে। অমল এদিকওদিক দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে পড়ে। কাজ সেরে উঠতে গিয়ে শুনতে পেল চুড়ির ঠুণঠুণ শব্দ! কান খাড়া করে চোখ কুঁচকে সে মাঠময় খুঁজতে লাগল। কিছু দূরে যেন দুটো মানুষ খুব কাছাকাছি বসে! কি তারা হতে পারে? স্বামী-স্ত্রী! তাই যদি হবে তাহলে মাঠের মাঝে প্রেম করতে আসবে কেন! দুজনে রীতিমত জড়াজড়ি করে রয়েছে! আরও কিছুক্ষণ ওদের কার্য-

কলাপ দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু হ্যাংলার মত দাঁড়িয়ে থাকতেও সংকোচ জাগে। ভাবল, বসেই পড়া যাক্। বিয়েবাড়ীর নেমন্তন্ন, এক-আধঘণ্টা দেরী হলেই বা কি! এতো আর চাকরির ইন্টারভিউ নয়!

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অমল বসতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মেয়েটী উঠে পড়ে হনহন করে গেটের দিকে চলতে থাকে আর তার পেছন পেছন স্যুটপরা একটী লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে নাগাল ধরবার চেষ্টা করে। অমল অনুতপ্ত হয়ে ওঠে, সে-ই কি কোন ব্যাঘাত ঘটাল!

তার আর বসা হল না। আনমনা ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ অমলের মনে হল, বিয়েতো তারও হতে পারত! সমীরণের যখন বিয়ে হচ্ছে তখন তারই বা হতে পারে না কেন? হাসিতে তার ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে ওঠে, বেকার ছেলের আবার বিয়ে!

বিয়েবাড়ীর কানাতের তলায় এক কুঞ্জবন, তার মধ্যে মখমল-মোড়া সিংহাসন! কুঞ্জবনের মধ্যে গাছপালা, লতাপাতা, ফলফুল, নদীপাহাড়, চাঁদতারা কিছুই বাদ পড়েনি! অমল ভাবছিল, সমীরণ যখন ওই সিংহাসনের ওপর বসেছিল তখন নিশ্চয়ই তাকে একটা রাজা-গজা ধরণের দেখাচ্ছিল!

কুঞ্জবনের সামনে নিমন্ত্রিতদের আসর। আলো যাতে বাইরে যেতে না পারে তার জন্য সভাস্থল ডবল-তেরপলে মোড়া। বন্‌বন্ করে অনেকগুলো পাখা ঘুরছে! তবুও একটা ভেপসা গরম দম বন্ধ করে আনে। নানান রকমের নিমন্ত্রিত লোক, তাদের খাতিরের বহর দেখে বোঝা যায় কে কি দরের! ওরই মধ্যে কতকগুলো দল হয়ে গেছে আর সেখানে চলেছে তুমুল তর্ক।

কান পেতে অমল শুনল, মস্কো মশাই কবে খতম হয়ে গেছে! খবর কি আর এখানে দেয় কিছু! সঠিক খবর দিলে যে এখানে বিদ্রোহ সুরু হয়ে যাবে!

অমলের হঠাৎ মনে পড়ে যায় বাসের সেই প্রবীণ ভদ্রলোকের কথা। ওখান থেকে সরে গিয়ে সে অর এক পাশে বসল। সেখানে চলেছে জনচারেকের মধ্যে চাপা-গলায় আলোচনা। একজন বলছে, এই বেলা ধরে ফেলুন মশাই ব্লেড! যতো ধরতে পারবেন তত লাভ!

অমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেখা যাক কতদূর কি করতে পারি। এখন চলি তাহলে—রাততো অনেক হল।

নববধূর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখে, সে তারই মুখের দিকে চেয়ে আছে!

কেন যেন অমল একটু জোরেই হেঁটে চলেছে! স্কোয়ারের মধ্যে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! সমস্ত মাঠটার ওপর বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার মন্থর গতিতে হাঁটতে থাকে। কাজলটানা নববধূর চোখদুটো যেন তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে! আচ্ছা, অমন করে তার মুখের পানে চেয়ে ছিল কেন!

কিন্তু সমীরণই বা তাকে মিলিটারীতে ঢোকার কথা বলল কেন! সে যা বলতে চায়, তার অর্থতো এই যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই! কিন্তু কেন? কেন উপায় নেই! এই যুদ্ধের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায়! হচ্ছে বৃটীশের সঙ্গে জার্মানি আর জাপানের যুদ্ধ, তার মধ্যে পরাধীন ভারতবাসীর কি স্বার্থ থাকতে পারে!

কিন্তু সমীরণইতো বলল, তারাও মিলিটারী-কনট্রাক্ট ধরতে সুরু করেছে। সমীরণের শ্বশুর যুদ্ধের দৌলতে ব্ল্যাক-মার্কেটে এত পয়সা করেছে যে টাকার ওপর তাঁর কোন দুখ-দরদ নেই! সমীরণের বাবাতো এমন একজন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে কুণ্ঠিত হননি! কিন্তু এই মিলিটারী-কনট্রাক্ট নেওয়া, ব্ল্যাক-মার্কেটওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক পাতান, এ তো বৃটীশকেই সাহায্য করা!

ওয়েলিংটনের মোড় একেবারে ফাঁকা। ট্রাম অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে, বাস অনেকক্ষণ পরে পরে যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আউটের ঠুলির তলায় নির্জন নিথর রাস্তাটা ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে! বাড়ীর দেয়ালগুলোয় বড় বড় পোষ্টারগুলো কেমন যেন চোখ-মিটকি মারছে! সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অমল চেয়ে থাকে 'ভারতীয় সৈনিকদলে যোগ দিন' পোস্টারটার দিকে। এ পোস্টার সে অনেকদিন দেখেছে, কিন্তু আজ যেন সে নতুন চোখে দেখছে! ওই মানুষটাকে যেন তার খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে আর শুনতে পাচ্ছে সমীরণের ফিসফিস শব্দ, লাখে লাখে তোর মত লেখা-পড়া-জানা ছেলে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে! এদের থেকে আলাদা

আর তুই কি করবি?

একা দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন যেন ভয়ভয় করে। অমল হেঁটে চলেছে এস্‌প্লানেডের দিকে। ক্বচিৎ একটা ট্যাক্সি একদল বেসামাল এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েপুরুষ নিয়ে ঝনঝনিয়ে চলে যাচ্ছে! রিক্সায়-বসা মাতাল যাত্রীটীর মাথা পেছনে কাৎ হয়ে পড়েছে! গলির মোড়ে মোড়ে অন্ধকার যেন ওৎ পেতে রয়েছে! এ-আর-পি শেল্টারের নির্দেশগুলো যেন পথ রুখে দাঁড়িয়ে আছে! ব্যাফল-ওয়ালের আড়ালে আড়ালে কারা যেন থাবা মেলে রয়েছে! স্যাল্‌ভেশন-আর্মি-হেডকোয়ার্টারের সিঁড়িতে কে যেন একটী মেয়েকে সশব্দে চুম্বন করছে!

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড় বরাবর আসতেই একটা লোক সন্তর্পণে অমলের পাশে এসে চাপা গলায় বলে, ইয়ং গার্ল বাবু! এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান!

অমলের মনে হয়, ওই লোকটাই যেন দুপুরবেলায় হোয়াইটওয়ে-লেডল'র সামনে প্যারিস-পিকচার বিক্রী করে!

অমলদের সংসার ছোট কিন্তু তার আয়ের পরিধি আরও ছোট! কাজেই অভাব আর অনাটনের সংগে প্রতিপদে টানা-হেঁচড়া করে চলতে হয়। অমলের বাবা ননীগোপালবাবু গরীব হয়ে পড়লেও দারিদ্র্যকে স্বীকার করে নেননি! তিনি বংশানুক্রমিক জমিদার, জমিদারী তিনি অনেকদিন করেছেন! জমিদারী মেজাজ আজও তাঁর ছেঁড়া-ধুতি আর তালিমারা জামার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারে! বংশগৌরব আর ঐতিহ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র সান্ত্বনা।

জমিদারীর পালা শেষ হয়ে এসেছে, কেবল বেঁচে আছে তার ঠাটটুকু। আয়ের এক কপর্দকও হাতে আসেনা কিন্তু মাঝে মাঝে মামলা মোকদ্দমার খরচ ঠিকই জোগান দিতে হয়। ছেলেরা চোখে দেখে জোড়াতালি দিয়ে আভিজাত্য বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টা আর কানে শোনে জমিদার জীবনের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী দিনগুলির লোভনীয় কাহিনী।

ননীগোপালবাবুর তিনছেলে, দুইমেয়ে—স্ত্রী গত হয়েছেন, মা বর্তমান। বড়ছেলে বিমল ম্যাট্রিকের বেড়া টপকাতে পারেনি—সদাগরী

অফিসের সরকার, মাহিনা ত্রিশটাকা। মেজছেলে অমল বুদ্ধিমান; তাই আই-এ পাশ করার পর তাকে চাকরি নিতে দেননি! তাঁর ভাঙা সংসারকে গড়ে তোলার আশায় বাজি ধরে বসেন তার ওপর। যশ ও অর্থ দুইয়েরই দাদন দেন অমলের মারফৎ! অমল যদি বি-এ পাশ করতে পারে তাহলে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। আর বেশী পাশ করার জন্য চাকরিতে মাইনের অংকটাও হবে মোটা! আর ছোটছেলে কমলকে সোজাসুজি কেরাণীগিরি শিক্ষার জন্য কমার্স পড়াতে সুরু করেন।

বিমলের রোজগারে সংসার চলে না, তাই ননীগোপালবাবুকে সংগোপনে বড়লোক আত্মীয়দের কাছে হাত পাততে হয়। ভরসা এখন অমল। অন্তত একশটা টাকা সে যদি ঘরে আনতে পারে তাহলেই কিস্তিমাৎ! হাত পাতার দায় থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন। তারপর কমলের আয় যখন ঘরে উঠবে তখনতো হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের দিকে মন দিতে পারবেন।

কিন্তু বাদ সাধল পোড়া যুদ্ধ। বোমাতংকে কলকাতা সহর উজাড় হয়ে গেল! ফকির থেকে আমীর পর্যন্ত লোটাকম্বল সম্বল করে হল সহরত্যাগী। ননীগোপালবাবুর সংসার অচল হয়ে পড়ছে। বড়লোক আত্মীয়দের অনেকেই দেশত্যাগী হয়েছেন, কাজেই তাঁদের অংশটাতো বাদ পড়ছেই, তার ওপর আবার দিনের পর দিন জিনিসের দাম চড়ছে। সংসার চালান শুধু দুষ্কর নয়, এক কথায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। বি-এ পাশ করার পর তিনটী মাস কেটে গেছে, চাকরিতো দূরের কথা অমল মাসে বিশ-পঁচিশটাকার বেশী সংসারে দিতে পারেনি। তদুপরি ইভ্যাকুয়েশনের ধাক্কায় তার দুটী ছাত্র সহর ছেড়ে চলে গেছে। অমলের আয় একেবারে বন্ধ!

সেদিন অমল সকাল সকাল খেতে বসেছে, কোথায় নাকি বন্ধুদের সংগে বেড়াতে যাবে। ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে ঠাকুমা বললেন, হ্যাঁরা অমি, চাকরি-বাকরি কি তুই করবিনা নাকি? তিন-তিনটে পাশ করেছিস, তুইতো আর নির্বোধ ন'স!

অমল বলল, তিনটে পাশ কি বলছ ঠাকমা, কত ডজনখানেক পাশ-ওয়ালারাই ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে! চাকরির দরকার থাকলেই তো আর

চাকরি পাওয়া যায় না! চেষ্টা করছি, যেদিন জুটবে সেদিন থেকেই করব।

ননীগোপালবাবু আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন। অমলের উত্তর শুনে ঝড়ের বেগে একেবারে সামনে এসে বললেন, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে কি আর চাকরি পাওয়া যায়! আছতো মজায়, দিব্যি দুবেলা পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্ছ, লজ্জা করে না? আর আমি কিনা লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি! এসব নবাবি আর বেশী দিন চলবে না! এবার থেকে ভাতের বদলে ছাই বেড়ে দেওয়া হবে—হনহন করে ঘরের মধ্যে গিয়ে তিনি গুম হয়ে বসে থাকেন।

কিছুদিন যাবৎ অমল দেখছে, তার সংগে ঠাকুমা কেমন যেন খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন, কথায় কথায় চাকরির কথা তুলছেন আর তার উদাসীনতার প্রতি কটাক্ষ করছেন! মিনি আর রিণি মাঝে মাঝে কি যেন বলতে গিয়েও ঢোঁক গিলে নিয়েছে। তাহলে আজকের ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়!

ভাতের থালা থেকে অমল হাত গুটিয়ে নিল। চোখদুটো তার জ্বালা করছে, ঠোঁটটা সে কামড়ে ধরেছে। হাতের গ্রাস থালার ওপর রেখে উঠে পড়ছিল, ঠাকুমা তার হাতটা চেপে ধরলেন, আমার মাথা খা অমি, বাড়া-ভাত ফেলে উঠে যাসনি, মা-লক্ষ্মী বিরূপ হবেন!

মাথা গুঁজে অমল বাকী ভাতগুলো শেষ করে ফেলল। জামাজুতো পরে যখন সে বেরুচ্ছে, মিনি দৌড়ে এসে তার হাতে সুপারি দিয়ে বলল, রাগ করনা মেজদা, বাবার শরীর আজকাল মোটেই ভাল নেই, তার ওপর সংসারের এই টানাটানি!

অমল কোন জবাব না দিয়ে সুপারিটা মুখের মধ্যে ফেলে দিল। বারেক মিনির দিকে তাকিয়ে তার মনটা গর্জে উঠল, কেন, চাকরির চেষ্টা কি সে করেনি, না করছে না! স্টেটস্‌ম্যানের ওয়াণ্টেড-কলমে যত রকম চাকরির খবর থাকে তার কোনটাইতো সে এই তিনমাসে ঢুঁ-মেরে দেখতে কসুর করেনি। তবুওতো সে চাকরি পায়নি! তার যে খুঁটির জোর নেই! বড়লোক আত্মীয়েরা দশবিশ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু তার হয়ে সুপারিশ করতে তাঁদের সম্মানে বাধে!

বাড়ীর চৌকাঠ পার হয়েই অমলের মনে হল, বাড়ীতে ফেরা আর

তার কোন মতেই চলতে পারে না! চাকরির একটা ব্যবস্থা না করে এই কথার পর সে বাড়ীতে ফিরবে কোন মুখে! কিন্তু এ কি জুলুম! তার নিজেরই নেই কোন ঠিক-ঠিকানা অথচ তারই ওপর এতবড় দায়ীত্ব! সে রোজগার করতে না পারলে এতগুলো লোক না খেতে পেয়ে মরে যাবে!

রোদের তাপ বাড়ছে, রাস্তার পিচ গরম হয়ে উঠছে, হনহন করে অমল হে'টে চলেছে! গলগল করে তার শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছে। সোজা গিয়ে উঠল সমীরণের বাড়ী। সমীরণ বেরিয়ে আসতেই প্রশ্ন করল, হ্যাঁরে, সেই যে মিলিটারী চাকরির কথা বলেছিলি তার জন্য কোথায় যেতে হবে, কাকে পাক্ড়াও করতে হবে?

সমীরণ বলল, আরে চল, বসবি চল ঘরের মধ্যে। ভর্তি হওয়ার কথায়ই যে তোর মেজাজ মিলিটারী-মার্কা হয়ে গেছে!

অমল আর সমীরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে বসল। সমীরণ পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বলল, মিলিটারীতে ভর্তি হওয়া কি ঠিক করে ফেললি নাকি?

পাখার হাওয়া অমলকে যেন আরও ক্ষিপ্ত করে তুলছে। তার মনে হয়, এও যেন তার প্রতি বিদ্রুপ! ঠাকুমার ওই স্নেহের মতন! কিছুক্ষণ সে গুম হয়ে বসে থাকে। সমীরণ আবার বলে, তাহলে ঠিক করে ফেলেছিস্?

অমল ফেটে পড়ল, ঠিক আবার করব কি! আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে চলেছে! কি আমি করব বল? যুদ্ধের মৌকায় তোমরা গভর্ণমেন্ট-কনট্রাক্ট ধরছ, ব্ল্যাক-মার্কেট করছ, তোমাদের দিনকালতো ভালই পড়েছে! কিন্তু আমরা?

ঠিকানা জেনে অমল যখন বেরিয়ে এল তখন মনটা তার গেছে দমে। এতক্ষণ সে জানত, সাধারণ চাকরির মত তাকে তদ্বির করতে হবে, উমেদার পাকড়াতে হবে, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে! আর শেষ পর্যন্ত যথারীতি চাকরি হবে না! সে-ও এই মারাত্মক স্খলন থেকে বে'চে যাবে। কিন্তু মিলিটারী-চাকরির জন্য এর কিছুই করতে হবে না! গিয়ে দাঁড়ালেই চাকরি।

তবুও অমল রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করে, কয়েকটা জায়গায় শেষবারের মত ঢুঁ মেরে দেখে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কোথাও হয়নি। 'নো ভেকান্সি'র বোর্ডগুলো সেই একই উদ্ধত দম্ভে দরজায় দরজায় ঝুলছে, আর অফিসগুলোর দেয়ালে-দেয়ালে সেই একটীমাত্র পোস্টার, ভারতীয় সৈনিকদলে যোগ দিন।

অবশেষে অমল ফিরে এল বেকার-বিশ্রামাগার কার্জন পার্কে। পড়ন্ত রোদকে আড়াল করে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। তার মত আরও অনেকে এধারে-ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে। বেকার ছেলের দুপুর বেলায় বাড়ীতে থাকার অধিকার নেই! বাপ-মা সন্দেহ করবে 'পায়ের-ওপর-পা দিয়ে অন্ন ধ্বংসানর মতলব।'

আশপাশে দেখে নিয়ে অমল শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে তার সমস্ত উত্তেজনা উবে গেছে। আর কিছু তার করবার নেই, এইবার তাকে বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু বাড়ী ফেরার কথা মনে হতেই আতঙ্কে তার সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

অমলের কাছ থেকে হাতচারেক দূরে দুটী ছেলে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন মাটি চাপড়ে বলে উঠল, আলবৎ আমি মিলিটারীতে ভর্তি হব!

অপর ছেলেটী বলল, কিন্তু দেশের এই অবস্থায় মিলিটারীতে ভর্তি হওয়া মানে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

কিন্তু তোমরা কি করছ শুনি? একক সত্যাগ্রহ! বিশ্বাস-ঘাতকতা যদি বল সে কাজ সুরু করেছ তোমরাই সবার আগে। আমাদের মত গরীবদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ আর ভাইসরয়ের দরজায় ধর্ণা দিচ্ছ! খুব স্বাধীনতার লড়াই করছ! কেন, ডাক দাও বিপ্লবের, খতম কর বৃটীশের রাজত্ব, আমরাই রুখব জাপানিদের!

না না মাথা গরম করার সময় এটা নয়! হিংসাত্মক কোন পথ আমরা নিতে পারি না।

তা নেবে কেন! তাহলে যে জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে যাবে! দেখ দেশ-দেশ বলে খানিকটা ফাঁকা-বুলি কপ্চিয়ো না। আমরাই যদি বাঁচতে না পারলুম তবে দেশ তোমার স্বাধীন হবে কার জন্য শুনি? এই

আমার মত কত লক্ষ লক্ষ এরই মধ্যে মিলিটারীতে ঢুকে পড়েছে, তা জান ?

তারা ভুল করেছে !

এই মানুষগুলো তিলে তিলে মরলেই বুঝি তোমার দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে ? দেশকে যদি স্বাধীন করতে হয় তাহলে ওই ভিখাবীপণা ছেড়ে দিয়ে রীতিমত লড়াই করতে হবে ! সেই লড়াইয়ে যদি তোমরা কোনদিন নাম, তাহলে দেখবে তোমাদের কারও চেয়ে আমরা কম দেশভক্ত নই !

অমল ক্ষণেকের জন্য সেই ছেলেটীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হয়, এবার সে অনায়াসে বাড়ী ফিরতে পারে।

অমল ভেবেছিল ক্লাইভ স্ট্রীটে যারা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় তারা সকলেই বুঝি রিক্রুটিং-অফিসের সামনে এসে ভীড় জমাবে। কিন্তু আশানুরূপ ভীড় না দেখে কেমন যেন একটু ঘাবড়ে যায় !

একটী চৌকস-গোছের-ছেলে তখন আর একজনকে বোঝাচ্ছে, অভাবটা কি ! মে রোডে রয়েছে সাপ্লাই, অর্ডনান্স ! থিয়েটার রোডে হসপিট্যাল, পাইওনিয়ার ! কিন্তু ওগুলোতে কি ছাই কোন প্রস্পেক্ট আছে ! এ তবুও রেলের কাজ, একটা টেকনিক্যাল লাইন, শিক্ষিতদের তবু এখানে কিছুটা পোষায় !

অপর ছেলেটী বলল, তাই বুঝি ভদ্দরলোকেব ভীড়টাই এখানে বেশী !

সেতো হবেই, পেটে বিদ্যে থাকলে কি আর মাটি-কাটার জন্য সোলজার হতে যায় ! তাদের জন্যতো রিক্রুটিং-সেন্টার পথেঘাটে খুলে বসে আছে।

অমল এতক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারে। তা হলে এইটাই একমাত্র রিক্রুটিং-সেন্টার নয়। আরও অনেক আছে বেড়াজালের মত ! এতক্ষণে যেন তার ভীড়টাকে লক্ষ্য করে দেখার মেজাজ ফিরে এল। সে হিসেবে লোক এমনই বা কম কি ! অন্তত যাট-সত্তরজনতো বটেই। হরেক রকমের লোক ! ছোট ছোট কুণ্ডলি পাকিয়ে গল্পগুজব করছে।

সবকটা মিলে একটা ভীড় জমে উঠেছে!

সবচেয়ে চটপটে আর বচনবাগীশ যে দলটা তাদের অধিকাংশই সুট্ পরা। প্যান্ট আর সার্ট পরলে নাকি ভীষণ স্মার্ট দেখায়! সুতরাং যেমন-তেমন একটা প্যান্ট পরে তার তলায় সার্ট গুঁজে দিয়ে তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে চলাফেরা করছে! সিগারেট অল্পবিস্তর সকলেরই ঠোঁটে লেগে রয়েছে। কথায় কথায় 'শালা' 'মাইরী' সহজভাবেই বলছে। বিদ্যের দৌড় ফোর্থ-থার্ড ক্লাসের এলেকায়, কিন্তু এরা বলে থাকে ননম্যাট্রিক! কারখানায় মজুর বা অফিসের পিওন-অর্ডারলি হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে আরও একপুরুষের মত মুলতুবী রাখার উদ্দেশ্যে এঁদের এখানে আগমন!

আর একটা দল, তাদের মধ্যে বনেদী গন্ধ যেন এখনো কিছুটা রয়েছে! সুট বা জামাকাপড় যা পরে এসেছে সেগুলো তাদের নিজে-দেরই। জুতোর নমুনা অক্সফোর্ড-সু থেকে বিদ্যাসাগর-চটি পর্যন্ত। এদের অনেকেরই পিতা এখনও মাসে শ'-দুশটাকা রোজগার করে থাকেন। উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, পেটি-অফিসার, ছোট-খাট ব্যবসাদারের সন্তান এরা। ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট এমন কি অমলের মত গ্রাজুয়েটও যে আরও দু'একজন নেই এমন নয়! যুদ্ধের ঠেলায় বেচারাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে শোচনীয়! পিঠছেঁড়া-সার্টের ওপর চটকদার-কোট পরে ইজ্জৎ বাঁচান আর সম্ভব হচ্ছে না! লটারীর টিকিট কিনে জীবনের বাজেট কষার অবসর আর মিলছে না। তাই এরা এখানে এসেছে ভাগ্যের সন্ধানে! সমস্ত ভীড়টার মধ্যে এরাই অস্বস্তি ভোগ করছে সবচেয়ে বেশী। ঠিক সেই জাতের মেয়েদের মত যারা ঠেলাঠেলি করে বাসে ওঠে কিন্তু পাশে কোন পুরুষ বসলে সহ্য করতে পারে না!

বাকী দলটা নীচেরতলা সম্প্রদায়। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় তাদের জোটে না, জুতোর বালাই অনেকেরই নেই। ফেরীওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ছেকরাগাড়ীর গাড়োয়ান, রেস্তোরাঁর বয়, বাজারের ফড়ে, এমন কি পকেটমার-গাঁটকাটাও হয়তো দু'একজন আছে! এদের কেউ কেউ নির্বিকার চিত্তে মাটির ওপর বসে আছে, কতক অসীম কৌতুহলে বাবুদের কথাবার্তা শুনছে আর কেউ অতি সন্তর্পণে অফিসঘরের

সুইঙডোরটা একটু ফাঁক করে উঁকিঝুঁকি মারছে।

ভীড়ের মধ্যে নিছক দাঁড়িয়ে থেকে অনেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কর্মাভাবে দু'তিনটে বিড়ি ফোঁকা হয়ে গেছে এখন গলা জ্বালা করতে সুরু করেছে। একজন বাবুক্লাসের ছেলেতো রাগ করে চলেই গেল! সে নাকি মজা দেখার জন্য ভর্তি হতে এসেছিল! আর একজন পেছন থেকে তাকে ভেঙচে ওঠে, আরে, যাবে আর কোন চুলোয়! কালই আবার সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে। দেখগে যা, বাছার হাঁড়িতে এতক্ষণে ইঁদুরে ডন্ মারছে!

আর একজন বলে উঠল, আমরা না হয় পেটের দায়ে এসেছি কিন্তু এ শালাদেরওতো র'জত্বি রক্ষের দায় আছে! তবে বাবা এত ন্যাজে-খেলানর দরকারটা কি! দেখুন না মশাই, শালাদের বায়নাক্কা কত! একদিন গেল নাম লিখতে, একদিন ডাক্তারি করতে, আজ নাকি বণ্ড সই করতে হবে!

বন্ড আবার কিসের?

কে জানে মশাই অতশত!

অফিসঘর থেকে কেবাণীবাবু বেরিয়ে এলেন। হাঁকডাক করে সমস্ত ছেলেদের তিনভাগে ভাগ করে ফেললেন। প্রথমদল, মেডিক্যাল এক্সামিন যাদের হয়ে গেছে। দ্বিতীয়দল, মেডিক্যাল এক্সামিন যাদের হবে। তৃতীয়দল, নবাগত। তিনটী দল আলাদা আলাদা ভাবে আবাব কথাবার্তা সুরু করে দিয়েছে। নবীন উৎসাহে কেউ কেউ আবার নতুন করে বিড়ি ধরাতে সুরু কবেছে।

দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল, আপনার মাইনে কত হল?

এখন দেবে একুশটাকা। আমি শিখব ফায়ারম্যানের কাজ, পাশ করলে আরও পাঁচটাকা বাড়বে। তাবপর মাইনে নাকি কেবল বাড়তেই থাকবে! হবে দুশ, তিনশ! যেন ঠাকুমার ঝুলির গল্প রে! অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে দেবাব জন্য বসে আছে! শালাদের সব ধাপ্পাবাজি!

ধাপ্পাবাজি জেনেও ভর্তি হলেন?

করব কি বলুন মশাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! কোন্ চুলোয়ইবা আর যাব! তবুওতো এরা দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবে কিন্তু ঘরে যে

তাও জুটছে না। দেশে-গ্রামে থাকি, মোটা ভাত-কাপড় হলেই চলে যায়। চাকরি আমার বাপ-দাদা-চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও করেনি। কিন্তু জিনিসের দাম যেভাবে চড়ছে, তাতেতো মশাই আর দুদিন বাদে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। বুঝলেন না ব্যাপারটা, এ ব্যাটারা ইচ্ছে করেই জিনিসের দাম চড়াচ্ছে! তাহলেই আমাদের মত গরীবেরা মিলিটারীতে ঢুকতে বাধ্য হবে!

কেরাণীবাবু আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, প্রত্যেক দল সিংগল্-লাইনে ফল্-ইন্—

ফল্-ইন্ কথাটার অর্থ যারা বোঝে না তারা কেরাণীবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। বিরক্তিতে নাক কুঁচকে কেরাণীবাবু একের পেছনে আর একজনকে দাঁড় করিয়ে দেন। একে একে তিনটী দলই অফিসঘরে ঢুকতে থাকে।

নতুন যারা ভর্তি হবে তাদের এনরোলমেন্ট-ফর্ম ভর্তি করা চলতে লাগল। নাম, ধাম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, ধর্ম কিছুই বাদ পড়ল না। যারা চোখ কান বুজিয়ে টপাটপ না বলতে পারে সেখানে কেরাণীবাবুই কলমের ডগায় যা আসে তাই বসিয়ে দেন! সময় বড় কম, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়! ফর্ম ভর্তি হলে সেই ফর্ম হাতে করে নবাগতের দল আর একটী ঘরের সুইঙ-ডোরের সামনে আবার লাইন লাগায়।

অমল সুইঙ-ডোরের সামনে যেতেই মিলিটারী উর্দিপরা চাপরাশী নীরবে হাতটা তুলে ধরে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রাফিক-পুলিশি ঢঙে চাপরাশী হাতটা তুলেই রইল। ঘরের মধ্যে থেকে একটী ছেলে বেরিয়ে এল। সংগে সংগে ভেতর থেকে আওয়াজ এল, নেক্সট্—

চাপরাশী হাত নামিয়ে বলল, যাও, সাবকো সেলাম দেও।

ঘরে ঢুকে অমল হাতদুটো জোড়া করে কপালে ঠেকাল। ক্যাপটেন সাহেব হাত বাড়িয়ে ফর্মটা নিয়ে বললেন, সিট্ ডাউন্ প্লিজ।

অমল পাশের চেয়ারটায় যথাসম্ভব সহজ হয়ে বসবার চেষ্টা করে। তবুও অস্বস্তিতে তার সমস্ত শরীর ঘেমে ওঠে। অফিসার! তাঁর সামনে চেয়ারে বসাটাইতো ঔদ্ধত্য! তার ওপর আরও অস্বস্তি, সেলামের বদলে সে নমস্কার করে ফেলেছে!

ক্যাপটেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর পড়াশুনা করেছেন?

অমল বলল, এই বছর বি-এ পাশ করেছি।

তাই নাকি! ক্যাপটেন সাহেব ঝট্‌ করে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসলেন। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, তাহলেতো আপনাকে ভাল একটা চান্স দিতেই হবে! গুণের কদর আমাদের ডিপার্টমেণ্ট পুরোমাত্রায় করে। আচ্ছা, আপনি কি ধরণের কাজ পছন্দ করেন?

অমল বলল, রেলের কাজ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

সেতো বটেই, তা তো থাকবার কথাই নয়। থাকলেতো আপনাকে আমরা নিদেনপক্ষে ট্রাফিক-ইন্সপেক্টর করে ভর্তি করতুম। আপনার স্টার্টিং হত আড়াইশ টাকা। আমার মনে হয় গার্ডের কাজটাই আপনি পছন্দ করবেন?

খুশীর আতিশয্যে অমল যেন হাঁপিয়ে ওঠে। এতবড় একজন অফিসার, সাধারণ একটী রিক্রুটের ওপর এত সহানুভূতি! আর ওই কেরাণীগুলো, ওরাই যেন এক-একটা অফিসার! অমল হাত কচলে বলল, আমার ওপর পুরো একটী ফ্যামিলি নির্ভর করছে স্যার। দয়া করে এমন একটা কাজে আমায় লাগিয়ে দিন যাতে স্টার্টটা মোটামুটি ভালই হয় আর উন্নতিরও স্কোপ থাকে।

ক্যাপটেন সাহেব অমলের কথাগুলো যেন হাঁ করে গিলছিলেন। তার কথা শেষ হতেই টপ্‌ করে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, স্কোপ! আপনার জন্য রাস্তা একেবারে খোলা! গার্ড থেকে আপনি ট্রাফিক-ইন্সপেক্টর হতে পারবেন। তারপরই কিংস্‌-কমিশন। আর কিংস্‌-কমিশন পেলেই লেফটেনান্ট, ক্যাপটেন, মেজর, লেফটেনান্ট-কর্নেল, কর্নেল এ্যান্ড সো অন্‌—পথ একেবারে পরিষ্কার! ইট্‌ অল্‌ ডিপেন্ডস্‌ অন্‌ ইওর পেসেন্স এ্যান্ড এন্‌ডিওরেন্স!

অমলের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, তারই মাঝে দেখে সুবিস্তীর্ণ এক পথ তার কোথাও বুঝিবা কোন বাঁক নেই! ক্যাপটেন সাহেব ক্ষণেক অপেক্ষা করে বললেন, আপনি কি বিবাহিত?

অমল ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

ক্যাপটেন সাহেব কাৎ হয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর চোখটা বুলিয়ে

বললেন, আচ্ছা, আপনাকে আমি ডিরেক্ট থার্ড-গ্রেড্ গার্ডে ভর্তি করে নিলুম, আর লিখে দিচ্ছি গার্ডশিপ্ পাশ করলেই আপনি সেকেন্ড-গ্রেড পাবেন। লেখা শেষ করে ফর্মটা অমলের হাতে দিয়ে বললেন, পাশের ঘরে ক্লার্ককে এটা দিয়ে দিন আর জেনে যান আপনার নেক্সট্ কাজ কি।

অমল কেরাণীবাবুর হাতে ফর্মটা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ দাদা, থার্ডগ্রেড গার্ডের মাইনে কত?

কেরাণীবাবু মুখ না তুলেই বললেন, উপস্থিত ছাপ্পান্ন, পরে আরও এলাওয়েন্স পাবেন যখন ওভারসীজ যাবেন।

আর সেকেন্ড-গ্রেড?

ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, কত আবার! লাখ-পঞ্চাশেক মনে করেছেন নাকি? এই একশ'র মত, আবার কত চান মশাই?

ঘর থেকে বাইরে যেতে যেতে অমল শুনতে পেল, বুঝলেন হেমন্ত-বাবু, এইসব বাবুরা মনে করেছেন মিলিটারিতে ভর্তি হয়ে বুঝি গভমেণ্টের মাথা কিনছেন!

উত্তর এল, গভমেণ্টেরইতো বোকাম মশাই। এত মোটা মোটা মাইনে দেওয়ার কোনই দরকার ছিল না। দশবিশ টাকা দিলেও বাছাধনরা এমনই সুড়সুড় করে আসতেন। হাঁড়ি যে মশাই শিকেয় উঠেছে!

পরদিন মেডিক্যাল-এক্সামিন। অমল মেডিক্যাল-ইন্সপেক্শন্-রুমের বাইরে একটা বেঞ্চে হা-পিত্যেশে বসে আছে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী ডাক পড়ছে। লাইনের শেষের দিক থেকে একটী ছেলে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ মশাই, আমার বাঁ-হাতটাতো ভাঙা, আমাকে নেবেতো?

রুক্ষ্ম মেজাজ একটী ছেলে মাঝখান থেকে টপ করে বলে উঠল, খুব নেবে মশাই, খুব নেবে! হাতভাঙা কি বলছেন! কয়েকটা কবন্ধ এনে দিন না তাও পার হয়ে যাবে!

হাতভাঙা ছেলেটী স্বস্থানে ফিরে গেল আর আশ্বাসদাতা ছেলেটী আপন মনে গজগজ করে চলল। অমলেরও চুপচাপ বোকার মত বসে

থাকতে কেমন যেন খারাপ লাগে। পাশের ছেলেটীকে জিজ্ঞেস করল, এখানে লোক নেওয়া হচ্ছে এ খবর পেলেন কোথায়?

ছেলেটী বলল, কেন, আমাদের গ্রামে যে আর কিছুদিন আগে ঢেঁড়া দিয়েছে।

ক্রমিকনম্বর এক জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে এল। বয়স তার অন্তত পঞ্চাশ, স্বাস্থ্য তালপাতার-সেপাই। অমল তাকে জিজ্ঞেস করল, পাশ হয়ে গেছেনতো?

পাশ না হয়ে উপায় কি ভাই! তাই কিছু দক্ষিণা দিতে হল।

অমল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেন!

আর কেন! ডাক্তারতো বলে দিল চোখ আমার খারাপ, আন্‌ফিট্‌ ফর্‌ ষ্টেশন-মাষ্টার! এখন আমি যাই কোথায়! একপাল ছেলেপিলে নিয়ে কি পথে দাঁড়াব! তা দেখলুম ডাক্তার সাহেব সবল লোক আর খাঁইও কম! এক টাকাতেই কার্যসিদ্ধি হল!

রুক্ষমেজাজ ছেলেটী ফেটে পড়ল, ওরেঃ শালা, যে যার মৌকা নিচ্ছে! আমরা এসেছি পেটের দায়ে আর এরা সেই সুযোগে টু-পাইস করে নিচ্ছে! আমি কিছুতেই দেব না। দেখি শালারা ভর্তি করে কিনা!

অমল ভাবনায় পড়ে গেল, তার কাছেতো টাকা নেই! কিছুটা উসখুস করে, বারকয়েক গলা ঝেড়ে, কয়েকটা ঢোঁক গিলে পাশের ছেলেটীকে বলল, আপনার কাছে একটা টাকা বেশী হবে? তাড়াতাড়িতে টাকা নিয়ে বেরতে ভুলে গেছি। কালই আপনাকে দিয়ে দেব।

ছেলেটী কোঁচার খুঁট থেকে একটী টাকা বার করে দিয়ে বলল, ভর্তি যখন হচ্ছি তখনতো একসঙ্গেই থাকতে হবে, তবে আর ভয়টা কি! কাল কিন্তু মনে করে আনতে ভুলবেন না যেন।

এম্‌-আই-রুম্‌ থেকে ফিরে জানা গেল, লোক আমদানি বেড়ে গেছে, ভর্তির কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে! সুতরাং মেডিক্যাল্‌-এক্সামিন আর বন্ডসই একই দিনে সারা হবে। ছেলের দল বাইরে অপেক্ষা করছে। বন্ড কথাটার মধ্যে এমন নিগূঢ় একটা অর্থ আছে যে ছেলেরা সাধারণ-ভাবে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। একটী ছেলে অমলকে

জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ মশাই বণ্ড-ফণ্ড আবার কিসের! দাসখত্ লিখিয়ে নেবে নাকি?

তা বণ্ড একটা নেবে বৈকি! আমাদেরতো আর এরা বিশ্বাস করে না।

রুক্ষমেজাজ সেই ছেলেটী তেড়ে-ফুঁড়ে উঠল, মামার বাড়ী আর কি! চাকরি করতে এসেছি, চাকরির মত এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার চাই। বণ্ডে সই করব কি জন্য?

অমল বলল, ডাক্তারকেতো টাকা দেবেন না বলেছিলেন কিন্তু দিতেতো হল। অযথা লম্ফ-ঝম্ফ করে লাভ কি বলুন?

ছেলেটী কেমন যেন মিইয়ে যায়! অভিমানভরে বলে, তা বলে যা খুশী তাই করবে?

কেরাণীবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, আপনারা সিংগল-লাইনে আমার পেছন পেছন আসুন।

অমলের বুকের মধ্যে কেমন যেন ঢিপঢিপ করছে। বণ্ডে সই করার কথাটা বারবার ঘুরেফিরে মনটাকে বিরোধী করে তুলছে! তবুও উপায় নেই! বণ্ডে সই না দিলে এত সুলভ মিলিটারী চাকরিও পাওয়া যাবে না!

ক্যাপটেন সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকে ছেলেরা টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। আঙুল তুলে এক এক করে সকলকে গুণে ক্যাপটেন সাহেব বললেন, ওন্লি নাইন! বড্ড কম! কেরাণীবাবুকে নির্দেশ দিলেন, ভাল করে পাবলিসিটির ব্যবস্থা করুন, আমাদের সেণ্টারের কথা হয়তো লোকে জানতেই পারেনি!

কেরাণীবাবু চলে গেলেন। ক্যাপটেন সাহেবের মুখের ওপর বিরক্তির ছায়া কালো হয়ে উঠেছে। এনরোলমেণ্ট-ফর্মগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে পাশে সরিয়ে রেখে মুখ তুললেন। পেছনে একটু হেলে পড়ে বললেন, এনরোলমেণ্ট-ফর্মে একটা করে সই দিলেই আপনাদের ভর্তি হওয়ার কাজ শেষ।

রুক্ষমেজাজ সেই ছেলেটী বলল, কিন্তু কিসে আমরা সই দিচ্ছি সেটাতো আমাদের জানা দরকার।

অফ কোর্স! ঝট করে ক্যাপটেন সাহেব সোজা হয়ে বসেন, বিরক্তির ছায়া তাঁর মুখ থেকে চকিতে সরে যায়! হেসে সামনে ঝুঁকে বললেন, নিশ্চয়ই! সই করার আগে সর্তগুলো আপনাদের জানা এবং বোঝাও দরকার। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং খোলা মনেই আপনাদের সই দিতে হবে।

ছেলেরা নড়েচড়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়! ক্যাপটেন সাহেব টেবিলের ওপর হাতদুটো রেখে বলতে সুরু করলেন, আপনারা ভর্তি হবেন ইণ্ডিয়ান-আর্মি-এ্যাক্ট অনুসারে। মনে রাখবেন জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথ, যে কোন পথে, যে কোন দেশে যখনই যাওয়ার হুকুম হবে —তখনই সেই পথে, সেই দেশে, বিনা ওজরআপত্তিতে আপনাদের যেতে হবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপনাদের একসঙ্গে থাকতে ও খেতে হবে। ওপরওয়ালা অফিসারের আইনসঙ্গত হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে মানতে হবে। চাকরিব মেয়াদ—যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন, তারপব আরও বারমাস—যদি ততদিন আপনাদের রাখা প্রয়োজন হয়।

বলা শেষ করে ক্যাপটেন সাহেব নীবব স্তব্ধ ছেলেদের প্রতিটী মুখের ওপর চোখ বুলিযে চললেন। কতকটা আশ্বস্ত হযে সেই রুক্ষ্ম-মেজাজ ছেলেটীকে বললেন, আব কিছু আপনাব জানবাব আছে?

যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমরা মারা পড়ি তাহলে অমাদেব বাডীর লোকের কি হবে?

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপটেন সাহেব উত্তব দিলেন, সেক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট আপনার উত্তরাধিকারীকে আজীবন পেন্সন দেবে। ছেলেদের মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরে যায়, আশ্বস্ত হয়ে তাবা নড়েচড়ে দাঁড়ায়।

ক্যাপটেন সাহেব বললেন, আশা করি আর কিছু বোধহয আপনাদেব বলবার নেই। সকলকে নীরব দেখে রিভলভিঙ চেয়ারে হেলান দিয়ে পেছনে কাৎ হয়ে আবাব সুরু করলেন, আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ হয়তো উচ্চশিক্ষা ছেড়ে এসে ভর্তি হচ্ছেন। মনে মনে হয়তো ভাবতে পারেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল। ধবলাম, আপনারা বি, এ, বা এম, এ, পাশ করলেন, তাতেই বা আপনাদের কি এমন বড় বড় চাকরি জুটত! বড়জোর তিরিশটাকার স্কুলমাষ্টার না হয় চল্লিশ-

টাকার কেরাণী। জানেনতো তাদের অবস্থা! একশ' টাকার মুখ দেখতে তাদের চুল পেকে যায়! আর এখানে যা আপনারা সুরুতেই পাচ্ছেন তা নিশ্চয়ই স্কুলমাষ্টার বা কেরাণীর চেয়ে খারাপ নয়। তার ওপর প্রত্যেকটা ক্যাটেগরীর আছে তিনটে করে গ্রেড। একটা গ্রেড থেকে আর একটা গ্রেডে গেলেই কুড়ি, ত্রিশ থেকে নব্বইটাকা পর্যন্ত একবারেই বেড়ে যাবে। আর আপগ্রেডিঙের জন্য আপনাদের মোটেই ভাবতে হবে না! আপগ্রেডিঙ হবে অটোম্যাটিক্যালি। ট্রেণিংক্যাম্প থেকে যখন কোম্পানিতে পোষ্টেড হবেন তখন হবে আপনাদের সেকেণ্ডগ্রেড, আর ওভারসীজ যখন যাবেন তখন হবে ফার্ষ্টগ্রেড। বলা যায় না, হয়তো আর তিন-চার মাসের মধ্যেই আপনারা ফার্ষ্টগ্রেড পেয়ে যেতে পারেন।

সস্মিত মুখে ছেলেদের মুখের ওপর আবার একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, মনে রাখবেন, মাইনে হিসেবে যে টাকাটা হাতে পাবেন, ইচ্ছে করলে তার একটী পয়সা খরচ না-ও করতে পারেন। কারণ, মাইনে ছাড়াও গভর্ণমেণ্ট আপনাদের খাওয়া, পরা, থাকা, চিকিৎসা, যাতায়াত, সমস্ত খরচই দেবে।

অমল মনে মনে হিসেব করল, ছাপ্পান্নটাকা থেকে চল্লিশটাকা সে বাড়ীতে দেবে, দশটাকা পোষ্টঅফিসে জমাবে আর ছটাকায় হাত খরচ চালাবে।

শুধু তাই নয়, ক্যাপটেন সাহেব তাঁর বক্তব্য তখনও শেষ করেননি, গভর্ণমেণ্ট আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও চিন্তা করেছে। লড়াই আর কতদিন! বড়জোর দুবছর কি তিনবছর। তারপর যখন বেরিয়ে আসবেন তখন গভর্ণমেণ্ট আপনাদের জন্য চাকরি রিজার্ভ করে রেখেছে! আপনারা আর্মির যে ডিপার্টমেণ্টে কাজ করবেন পোষ্ট-ওয়ার-লাইফে আপনাদের জন্য সেই সেই ডিপার্টমেণ্টে চাকরি রিজার্ভ রাখা হবে। এই যেমন আপনারা রেলের কাজে ঢুকেছেন রেলওয়েতেই আপনাদের জন্য চাকরি রিজার্ভ থাকবে।

অমলের কেমন যেন খটকা লাগল। মুখস্থ করা গৎ বলে মনে হচ্ছে! তার মনে পড়ল সেই ফায়ারম্যানটীর কথা, 'যেন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকণ্যে দেবার জন্য বসে আছে!'

ক্যাপটেন সাহেব উঠে বসে ঘণ্টি মারলেন। বেয়ারা এসে সেলাম করে দাঁড়াতে বললেন, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি।

তারপর এক-একজনকে ডেকে এন্‌রোলমেণ্ট ফর্মের ওপর সই আর টিপসই করিয়ে নিলেন। সই করার কাজ শেষ হলে হাই তুলে আড়া-মোড়া ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা সকলেই কি বাড়ীতে জানিয়েছেন?

দুজন বাদে আর সকলেই বাড়ীতে জানিয়েছে। তাদের দুজনকে আলাদা দাঁড়াতে বলে বাকী সকলকে অফিসঘরে যেতে বললেন। বেয়ারা এসে কাঁচের গ্লাসে বরফজল দিয়ে গেল। একচুমুকে জলটুকু শেষ করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বাকী দুজনকে বললেন, তাহলেতো আপনাদের একদিন ছুটী দিতে হয় দেখছি! বাড়ীতে জানাতে হবে, তাছাড়া অন্য কোথাও মানভঞ্জনের পালাতো আছেই, কি বলেন?

অমল ভ্রূকুঁচকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ক্যাপটেন সাহেবের মুখের দিকে চাইল। লোকটা রসিকতা করছে নাকি!

ক্যাপটেন সাহেব সিগারেট কেসের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে দাঁত বার করে হেসে বললেন, তা দাওয়াই হিসেবে নিতান্ত মন্দ হবে না। বাঙলাদেশের মেয়েতো, মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার কথা শুনলে একেবারে মূর্চ্ছা যাবে!

অমলের কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে, ঘৃণায় তার সমস্ত শরীরটা উঠেছে কুঁচকে। লোকটার সামনে থেকে বিদেয় হতে পারলে যেন বাঁচে!

ক্যাপটেন সাহেব দুটুকরো কাগজের ওপর ছুটীর চিঠ লিখে তাদের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, সে আমরা বুঝতে পারি। বহু ছেলেকেইতো এখান থেকে পার করলুম! সকলেই কি আব পেটের দায়ে মিলিটারীতে ঢোকে! প্রেমের দায়েও বড় কম আসে না! হাউয়েভার, আই উইশ ইউ সাকসেস!

ক্যাপটেন সাহেবের হাত থেকে চিঠটা নিয়ে অমল টপ করে নমস্কার করল। ক্যাপটেন সাহেব হেসে বললেন, তা বেশ, শেষবারের মত করে নিন। এরপর থেকে কিন্তু স্যালিউট্‌। নাউ ইউ আর এ সোলজার!

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে অমল ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছে! মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার পর্ব শেষ! আর কি, সেতো এখন সৈনিক! এইবার বাড়ীতে জানাতে হবে। কিন্তু কথাটা সে পাড়বে কেমন করে! হঠাৎ তার চোয়ালটা শক্ত হয়ে ওঠে, দাঁতগুলো কড়মড় করতে থাকে! বাড়ীর সকলে ব্যথিত হবে! সেতো কয়েকটা মুহূর্তের জন্য! তারপর টাকা যখন হাতে পড়বে তখন সব ব্যথার উপশম হয়ে যাবে, স্নেহের চাপ যাবে বেড়ে! টাকার অংক যত বাড়বে স্নেহের মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়তে থাকবে! তবে আর ভয়টা কিসের!

আচ্ছা, বাবা কি করবেন? রাগ! তাতেই বা কি এসে গেল। ছাই খেয়েতো আর একটা মানুষ বাঁচতে পারে না! হ্যাঁ সোজাসুজি এই কথাই সে বলবে। কাকেও সে ছেড়ে কথা কইবে না! স্নেহ ভালবাসার মুখোস টেনে খুলে দেবে!

হেঁটেই সে চলেছে। বাড়ীর যত কাছাকাছি এসে পড়ছে ততই তার গতি মন্থর হয়ে আসছে। মনের কোন এক নিভৃত কোণে এই রূঢ় চিন্তার পাশাপাশি অতি কোমল আবেগময় একটা চিন্তা দানা বেঁধে উঠছে! ক্রমেই যেন সে ভীরু হয়ে পড়ছে। তার মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার খবরেতো বাড়ীতে মড়া-কান্না পড়ে যাবে!

কিন্তু সে-ই বা করবে কি! অতি সাধারণ একটা চাকরি জোগাড় করার জন্যতো সে অক্লান্ত চেষ্টা করেছে! আফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছে! আত্মীয়-অনাত্মীয়ের খোসামোদ করেছে! ঘুষ দিতে রাজি হয়েছে! তবুওতো তার চাকরি হয়নি।

দেশের লোক তাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে? তাতো বলবেই! কিন্তু কেবল তাকেই বলবে যেহেতু সে সাধারণ সৈনিক হয়ে চাকরি নিয়েছে! হত সে একটা বড় অফিসার লোকে তাকে খাতির করত! বৃটীশকে সে সাহায্য করছে? তাতো করছেই! কিন্তু যেহেতু তার অন্ন জুটছে না, তার বাড়ীতে হাঁড়ি শিকেয় উঠেছে তাই সে হল বিশ্বাসঘাতক! আর সমীরণেরা মিলিটারী-কনট্রাক্ট ধরেও দেশভক্ত রয়ে গেল! মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তারা মহামানবই রয়ে গেল! বড়লাটের বাড়ী ধর্ণা দিয়ে যারা ভিখিরীপণা করছে তারা হল জাতির

ভাগ্যনিয়ন্তা! আর বিশ্বাসঘাতকের তক্‌মা এঁটে দেওয়া হল তাদেরই গায়ে যারা হাভাতের দল!

বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কড়ায় হাত দিতেই অমলের বুকের মধ্যেটা দুরদুর করে ওঠে। একটু ইতস্তত করে সে কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে সাড়া দিল রিণি।

অমল চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। রিণি দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে অমল দরজা বন্ধ করার সময়টুকু অপেক্ষা করে রইল। তারপর রিণির সঙ্গে চলতে চলতে তার কাঁধের ওপর রাখল একটা হাত। অসহায় সে হাতের স্পর্শ রিণিকেও কাতর করে তোলে। বিষণ্ণ মুখে রিণি অমলের দিকে চোখ তুলে চায়।

জুতোজামা খুলে অমল রান্নাঘরেব দাওয়ায় এসে বসল। ঠাকুমা জপে বসেছেন। অমলকে দেখেই মালা ঘুরিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, হ্যাঁরে কিছু হল নাকি? তোর বাপতো আব পেরে উঠছে না!

অমল বলল, হ্যাঁ ঠাকমা, হয়েছে একটা—পরশু জয়েন করব।

মালা নামিয়ে ঠাকুমা বলে উঠলেন, তাই নাকি! তাই বুঝি মেজকর্তার আজ ঠাকমার কাছে বসবার ফুরসৎ হল?

অমল বলল, খাবার-দাবার কিছু আছে? বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

ঠাকুমা তারস্বরে হেঁকে উঠলেন, অরে অ মিনি রিণি, বলি তোরা গেলি কোথা! ছেলেটা তেতেপুড়ে এল, কোথায তাকে খাবার-দাবার দিবি, তা না ঘরের কোণে বসে দিনরাত ফুসুর-ফুসুর! কি যে তোদের এত কথা বুঝি না বাবা!

অমলের ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এইতো রঙ বদলাচ্ছে! ঠাকুমা একটু অপেক্ষা করে আবার হাঁকলেন, বলি অ মেয়েগুনো। বলি তোরা মরেছিস নাকি?

মিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁঝিয়ে উঠল, বাবারে বাবা এমন চেঁচাও তুমি, কানের পোকা বেরিয়ে যায়! কি, হল কি?

ঠাকুমা অমলকে বললেন, দেখলিতো, আমাকে গেরাহ্যিই করে না, আমি যেন বাড়ীর দাসী-বাঁদী কি একটা! এই যে এত চেঁচিয়ে মলুম, তা কথাটা কানে তুলল না! ঠাকুমা অনর্গল বকে চললেন।

মিনি অমলকে জিজ্ঞেস করল, বুড়ি কি বলছিল গো মেজদা?

আমাকে খেতে দিতে।

ব্যাপার কি, তোমার ওপর যে দরদ উথ্‌লে উঠল!

আমায় কিছু খেতে দে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

অমলকে রুটী-তরকারি দিয়ে মিনি চায়ের জল চড়িয়ে দিল। ঠাকুমার মেজাজ ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়েছে। মিনিকে বললেন, শুনেছিস. অমির চাকরি হয়েছে, পরশু থেকে যাবে। এতদিনে ভগবান বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। হ্যাঁরা অমি, মাইনে কত হল, পাকা চাকরি তো?

অমল বলল, উপস্থিত গোটা পঞ্চাশ! তা একরকম পাকা বৈকি।

অমলের পাতের দিকে নজর পড়তে ঠাকুমা বললেন, হ্যাঁরা, রুটী আর একখানা দেবে নাকি আর একটু পাটালি?

মিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, নাতির চাকরি হয়েছে শুনে খুব যে খাতির করছ দেখছি আর এতদিন কি করতে একটু ভেবে দেখতো! ওঃ, তোমরা কি সাংঘাতিক মানুষ!

ঠাকুমা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন, তা ছুঁড়ি, আমায় বলছিস কেনর‍্যা! এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম! যে গরু দুধ দেয় তার চাঁট লোকে সহ্য করে।

মিনি বলল, সেই জন্যইতো বলছি। এখন থেকে মেজদাও দুধ দেবে শুনে খুব যে তার খোসামোদ করতে সুরু করেছ।

অমল ধমক দিয়ে উঠল, আঃ মিনি. কি হচ্ছে! কিন্তু তার গলাও কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে। ঘরে গিয়ে তক্তাপোষের ওপর শরীরটাকে দেয় এলিয়ে। ওঃ তার সমস্ত শরীরটা যেন টনটন করছে!

রিণি অমলের মাথার কাছে বসে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিতে দিতে বলল, সত্যি মেজদা, তোমার চাকরি হয়েছে?

অমল বলল, হ্যাঁরে হ্যাঁ।

রিণি খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল. তাহলে আর কেউ তোমায় বকবে না, না?

অমল বিস্মিত দৃষ্টিতে রিণির মুখের দিকে চাইল! আটবছরের রিণির এই সরল প্রশ্নের কি উত্তর দেবে! গভীর কৃতজ্ঞতায় তার মনটা

যেন কাণায় কাণায় ভরে ওঠে। এই তো রয়েছে সহানুভূতি আর বুকভরা দরদ!

মিনি অমলের পাশে বসে বলল, কোথায় চাকরি হল মেজদা?

অমল খুব হাল্কাভাবে উত্তর দেয় মিলিটারীতে।

মিনি বলে উঠল, কক্ষণো না। তুমি মিলিটারী হতেই পার না। মাগো! মিলিটারীতেতো যত সব ছোটলোক ভর্তি হয়!

কড়া নাড়ার শব্দ হল। রিণি চলে গেল দরজা খুলতে। মিনি উঠে পড়ে বলল, যাই, বাবার জন্যে চায়ের জল বসাইগে।

ননীগোপালবাবু জামা ছাড়ছেন। ঠাকুমা খবর পেয়েই হাঁকাহাঁকি সুরু করে দিলেন, ওরে ননী, অমির চাকরি হয়েছে রে!

রান্নাঘরের দাওয়ায় রিণি একটা মোড়া পেতে দিল। ননীগোপাল-বাবু বসতে বসতে বললেন, না হওয়ারতো কিছু নেই, চেষ্টা করলেই হবে।

ঠাকুমা রিণিকে বললেন, কই, ডাক না অমিকে।

রিণি দৌড়ে গিয়ে অমলের হাতটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। অমল যেন আঁতকে ওঠে! মিলিটারীতে ভর্তি হওয়াকে কি এ'রা চাকরি বলে মেনে নিতে পারবেন!

ঠাকুমা হেঁকে উঠলেন, কইরে, অমিকে একটা পিঁড়ি পেতে দে না।

অমল মাটীর ওপরই বসে পড়ল, রিণি বসল তার কোল ঘেঁষে।

ননীগোপালবাবু বললেন, কবে জয়েন করতে হবে?

পরশু সকাল থেকে।

সকাল নাতো সন্ধ্যেবেলায় আবার কোন অফিস খোলে নাকি! কোথায় হল? এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট-লেটার পেয়েছিস? মাইনে কত?

অমল উত্তর দিল, উপস্থিত ছাপ্পান্ন পরে আরও বাড়বে।

ননীগোপালবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, একজন গ্রাজুয়েট হয়ে ছাপ্পান্ন টাকার চাকরি নিতে তোমার লজ্জা করল না! আর ওই টাকাতে সংসারের কতটুকু সুরাহা হবে?

আম্‌তা আম্‌তা করে অমল বল্লল, আমার জন্য সংসারে এক পয়সাও খরচ হবে না। থাকা খাওয়া পরা সমস্ত খরচই তারা দেবে। মাইনের

টাকাটা পুরোই হাতে থাকবে।

ননীগোপালবাবু চোখ কুঁচকে অমলের দিকে চাইলেন, এ আবার কোন ধরণের চাকরি!

মরিয়া হয়ে অমল বলল, মিলিটারী চাকরি।

তার মানে!

আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি।

ননীগোপালবাবু আঁতকে উঠলেন, মুখ দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাকাতর এক গোঙানি বেরিয়ে এল! স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মৌন আশঙ্কায় আর সকলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ননীগোপালবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, বাঃ বাঃ চমৎকার! আমার ছেলে সেপাই! আমার গ্রাজুয়েট ছেলে ছাপ্পান্ন টাকার সেপাই! বন্দুক ঘাড়ে করে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াবে! জমিদার বংশের ছেলে সেপাই সেজে রাস্তায়-ঘাটে মাতলাম করে বেড়াবে! বেশ করেছ বাবা, বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ, তোমার নিজেরও মুখ উজ্জ্বল করেছ! বাঃ, চমৎকার! উঠে তিনি ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

জপতপের ফাঁকে ঠাকুমা সব কথা শুনতে পাননি। রিণিকে জিজ্ঞেস করলেন, ননী ওরকম করছে কেন? অমির কোথায় চাকরি হয়েছে?

মিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, কোথায় আবার—মিলিটারীতে! এইবার তোমাদের সাধ মিটেছে তো?

এ্যাঁ, কি বললি! ঠাকুমা উঠে এসে অমলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, এ কি করলি দাদা।

পাশে দাঁড়িয়ে মিনি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে! তবুও তার চোখ দিয়ে কয়েকফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। রিণি এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ মিনিকে জড়িয়ে ধরে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

দুই

ট্রেণিং-ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে অমল কেমন যেন একটু ঘাবড়ে গেল। বিরাট এলেকা নিয়ে ক্যাম্পচৌহদ্দি, চারিদিকে বার ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া, ভেতরে সারি সারি লাল রঙের ব্যারাক্, মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মাঠ। প্রথম দৃষ্টিতেই জেলখানা বলে মনে হয়।

কাঁটাতারের বেড়ার ধার ঘেঁষে পায়ে চলার পথ। সেই পথ ধরে অমল গেটের দিকে এগুচ্ছে, হাতে তার ছোট্ট একটী সুট্কেশ। বেড়ার ধারে ছোট একটী দল মাটী কোপাচ্ছে, গাছের গোড়া খুঁড়ছে, চারা পুঁতছে। তাদের সকলেরই পরণে মিলিটারী ইউনিফর্ম! অমলকে দেখে সব কটা ছেলে কাজ থামিয়ে তার দিকে চোখ পাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, ত্রস্তে বারেক নিজের জামাকাপড় দেখে নিয়ে আবার তাদের দিকে তাকায়। তাদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওরে, আরও একটা ভেড়া এসে জুটলবে—বাকী সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

অমলের মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কি অভদ্র ছেলেগুলো! তাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে অমল হনহন করে হেঁটে চলল। কিছু দূর গিয়ে দুটো ব্যারাকের ফাঁক দিয়ে দেখল, প্রায় জনত্রিশ ছেলে মাথার ওপর হাত তুলে দৌড়চ্ছে। তাদের সামনে একটা লোক ছোট্ট একটা ছড়ি নেড়ে খুব তম্বিগম্বি করছে, আ বে গিধধড, ঠিকসে কদম্ রাখ্ — এদেরও পরণে মিলিটারী ইউনিফর্ম!

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেমন যেন তার সন্দেহ হয়, রেলওয়ে-ইউনিট বোধহয় এটা নয়! এদিকওদিক চাইতে চাইতে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটী ছেলে লম্বা একটা লাঠি হাতে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানর ভংগী দেখলেই বোঝা যায়, সে প্রহরী। অমল তাকে জিজ্ঞেস করল, মিলিটারী-রেলওয়ে-ইউনিটের ট্রেণিং-ক্যাম্পটা কোন দিকে বলতে পারেন?

প্রহরী বলল, এইটাই।

অমল বিস্ময়ে বেসামাল হয়ে পড়ে, এইটাই!

হ্যাঁ এইটাই! বাইরে থেকেই ঘাবড়ে গেলেন? এখনওতো ভেতরে ঢোকেননি!

অমল ফ্যালফ্যাল করে ছেলেটীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলেটী একপা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, কেটে পড়ুন মশাই যদি প্রাণে বাঁচতে চান! এই খাঁচার মধ্যে ঢুকলে কিন্তু এক্কেবারে দফা শেষ!

ক্ষণেকের জন্য অমল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় সে পালিয়ে যাবে? বাড়ীতে! অসম্ভব। গেটের দিকেই সে পা বাড়াল।

প্রহরী বিড়বিড় করে উঠল, পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে!

ক্যাম্পের গেট। জনকুড়ি ছেলে বেল্চা-গাঁইতি নিয়ে বিরাট এক ঢিবি কেটে সমতল করছে। অমলকে দেখে জনকয়েক কাজ থামিয়ে চিৎকার করে ওঠে, এসেছেন দাদা? আসুন—আসুন!

অমল থমকে যায়। তার আসার কথা কি এরা জানে নাকি!

একজন বলে ওঠে, ওরেঃ বাবা, আর কত শালা আসবে রে!

সকলে যেখানে কাজ করছে তারই মধ্যে একজন পরম নিশ্চিন্তে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে! এতক্ষণে বোধহয় তার খেয়াল হল। হঠাৎ সে খেঁকিয়ে উঠল, এইঃ, বকোয়াস্ মৎ কর্! অমলের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বলল, এই বাবু ইধর আ!

সম্ভাষণটা অমলের কাছে মোটেই মনঃপুত হয়নি। ইচ্ছে করছিল, কান ধরে লোকটাকে শিখিয়ে দেয় ভদ্দরলোকের সংগে কেমন করে কথা কইতে হয়। অমলের বিরক্তি দেখে একটী ছেলে বলে উঠল, চটে লাভ নেই দাদা, উনি হচ্ছেন হাবিলদার সাহেব। আমাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা!

সুটকেশটা নামিয়ে রেখে অমল হাবিলদার সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাবিলদার সাহেব বলল, ক্যা, রঙরুট হো?

বিমূঢ় দৃষ্টিতে অমল হাবিলদার সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে রইল। একজন বলে দিলে, রঙরুট হচ্ছে রিক্রুট কথাটার মিলিটারী সংস্করণ। যত্তো আকাট মুখ্যুর পাল্লায় পড়ে ইংরেজী ভাষার এমনি হাল হয়েছে!

অমল বললে, জী সাব্, দুরোজ আগে ভর্তি হুয়া হ্যায়। রিক্রুটিং

অফিসারের চিঠিটা হাবিলদার সাহেবের হাতে দিলে।

ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, এই রে, ভাল বিপদ বাধিয়েছেন দাদা। কাগজটা হয়তো উল্টো করে ধরবে! ওসব চাষ-আবাদ কি বাছাধনদের আছে!

আর একজন বলে উঠল, ওরে রজত যা না বাপু, কাগজটা একটু ভিজিয়ে দে।

রজত অবশ্য বেরিয়ে এল না। অমল ভাবছিল, এমন নিরক্ষর একটা মানুষ এতগুলো লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হল কেমন করে! কাগজটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে হাবিলদার সাহেব অমলকে বলল, ঠিক হ্যায়, রাহ্‌ধারী দপ্তরমে দে দেও, ঔর্ তুম আজ আপনা সামান্‌বগেরা ঠিক কর্ লেও—একটু থেমে পাশে চেয়ে বলল, মুখার্জি, তুম্ ইস্ বাবুকো আপনা ব্যারিকমে লে যাও, ঔর উধরই য়েক সীট্ ঠিক কর্ দেও।

জনকয়েক কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠল, জয় মা ধান্যেশ্বরীর জয়! এলেম আছে তোর রজত!

রজত মুখার্জি বেরিয়ে এসেই টপ্ করে অমলের সুটকেশটা তুলে নিয়ে বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

চলতে সুরু করে অমল বলল, আহা, তা আপনি কেন সুটকেশটা নিচ্ছেন! ওটা আমায় দিন।

রজত নির্বিকার, চলতে চলতে বলল, কেবলতো এই প্রথম দিনটার জন্য! এরপর আপনি মরে গেলেও কেউ আপনার দিকে ফিরে চাইবে না। কাকেও কোন সাহায্য করা ফৌজিশাস্ত্রে মহা অপরাধ।

মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে অমল বলল, আমাকে পৌঁছে দিযে আবার আপনি ফিরে যাবেন বোধহয়।

ক্ষেপেছেন নাকি! সারাদিনের মধ্যে আর মুখটী বার করছি না।

হাবিলদার যদি খোঁজাখুঁজি করে?

তা যাতে না করে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছি। শুনলেন না ওরা বলল, এলেম আছে তোর রজত।

অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রজতের মুখের দিকে চাইল। রজত বলল,

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না বোধহয়? একটু থেমে সুরু করল, তা কিছুদিন সময় লাগবে বৈকি। আমিও মশাই পাক্কা একটি মাস হালে পানি পাইনি। তারপর না ঘাঁতঘোঁত সব বার করলুম। ওই হাবিলদারটি হচ্ছে আমাদের ইমিডিয়েট বস, ওর ওপর আছে এক জমাদার, সে শালাতো কেবল ছোঁড়া-জোগাড়ের ধান্দায় থাকে! কাজেই হাবিলদারকে খুশী রাখতে পারলেই আমার পোয়াবার! মাঝে মাঝে এক-আধ পাঁট খাওয়াই। দিনকাল আমার ভালই কাটছে।

ব্যারাকের মধ্যে ঢুকে অমল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। হাসপাতালের ওয়ার্ডের মত দু'সারিতে খাটিয়া, তার ওপর বিছানাগুলো একই কায়দায় সাজান। লম্বালম্বি একসারিতে কম্বলগুলো ভাঁজ করে রাখা, তার ওপর মশারী গোল করে পাকান, কম্বলের সামনে মগ আর প্লেট। খাটিয়ার তলায় সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, তার ওপর জুতো।

আপন মনে অমল বলে ওঠে, বাঃ কেমন সুন্দর!

রজত বলল, কি?

বিছানা সাজানর কায়দাটা।

সত্যিই সুন্দর! কিন্তু এমনই মজা, আর দুদিন বাদে আপনিও ক্ষেপে উঠবেন।

সুটকেশটা মেঝেয় রেখে অমল একটা খাটিয়ার ওপর বসল। রজত বলল, বসার আগে চলুন কাজগুলো সেরে আসা যাক।

আবার কি কাজ!

তেমন মারাত্মক কিছু নয়। অফিসে এ্যারাইভ্যাল-রিপোর্ট দিতে হবে আর ষ্টোর থেকে কীট্ নিতে হবে। তাহলেই আজকের মত আপনার কাজ শেষ। সেই রোলকলের আগে আর কেউ আপনার খোঁজ করবে না।

অফিসের দিকে যেতে যেতে অমল রজতকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?

রজত বলল, আর বলবেন না দাদা, পুরনো পাপী! সেই প্রথম দিনকার ভর্তি। তা আজ মাসপাঁচেক হল বোধহয়।

তা হলেতো ভালই হল। আইনকানুন আপনি সবই জানেন, আমাকে

একটু সাহায্য করবেন কিন্তু—

রজত হেসে উঠল, এখানে আইনও নেই আর কানুনও নেই! এখানকার আইন আর কানুন হল কর্তাদের খেয়াল আর মর্জি। একটি কথা সব সময়ে মনে রাখবেন, আপনি হচ্ছেন একটি ভেড়া! ভীড় দেখলেই চোখ বুজে ভীড়ে পড়বেন। ব্যাস, আপনাকে আর কোন মিয়াঁ ধরে-ছুঁয়ে পাবে না।

অমল চমকে উঠল, তাহলে ছেলেগুলো তাকে ভেড়া বলে নিছক রসিকতা করেনি!

অফিসঘরের রোয়াকে উঠে রজত হাঁক দিয়ে উঠল, ওহে মিত্তির, নাও হে তোমার আর একজন নতুন কয়েদী।

অমলের বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কয়েদী! ক্যাম্পটা দেখে তারওতো মনে হয়েছিল জেলখানা!

মিত্তির অফিসের হেডক্লার্ক, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধমক দিয়ে উঠল, মনে ভেবেছিস কি রজত! এটা কি তোর হাবিলদার সাহেবের ঘর নাকি?

রজত চট করে যেন সপ্তমে চড়ে গেল, দেখ, সব সময়ে হাবিলদার হাবিলদার করিসনি। জানা আছে আমারও, কে কাকে কতখানি তেল মাখায়! আর তুমিই বা কি করে জেমসখুড়োর পুষ্যিপুত্তুরটী হয়েছ! কেন ক্ষেপাচ্ছিস মাইরি আমাকে, শেষকালে দেব হাটে হাঁড়ি ভেঙে!

অমলের দিকে নজর পড়তেই টপ করে পরের কথাগুলো গিলে নিল। নরম হয়ে বলল, যাক, এর নামটা লিখে নাও, আর কীট-ইনভেন্টরীটা দিয়ে দাও দেখি।

যথারীতি সইসাবুদ দিয়ে অমলের নাম খাতায় উঠল। কীট-ইন-ভেন্টরী নিয়ে স্টোরের দিকে যেতে যেতে রজত হঠাৎ বলে উঠল, শালারা হিংসেয় মরে যাচ্ছে! আরে বাবা, এলেম যদি থাকে, তোরাও ব্যবস্থা করে নে না। আমি কি তোদের মাথার দিব্যি দিয়েছি!

অমল বুঝতে পারে রজতের মেজাজ বিগড়েছে। স্টোর থেকে কীট্ নেওয়া পর্যন্ত অমল আর কোন কথা বলেনি। ব্যারাকে ফেরার পথে রজত বলল, আহা, তা আপনি গুম মেরে গেলেন কেন?

অমলেরও একেবারে চুপচাপ আর একটা মানুষের পাশাপাশি চলতে কেমন বিশ্রী লাগছিল। রজতের মেজাজ পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে সে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা রজতবাবু, ট্রেনিঙের কোর্স কতদিন?

রজত বলল, কোর্স-টোর্স বলে এখানে কিছু নেই। প্রতিমাসে অবশ্য একবার করে ট্রেড-টেস্ট হয়। তেমন তদ্বির যদি করতে পারেন তাহলে দশদিন ক্লাস-এ্যাটেন্ড করেও আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন। আর পাশ করাতো পকেটের জোরের ওপর নির্ভর করে। যারা উন্নতি করার স্বপ্ন দেখে তারা সাত-তাড়াতাড়ি টেস্ট দিয়ে কোম্পানিতে যায়! লাভের মধ্যে সেখানে দিনরাত রগড়ানি খায়।

কিন্তু কোম্পানিতে গেলেইতো সেকেন্ড-গ্রেড পায়?

ক্ষেপেছেন নাকি! ওসব ছেলে ভুলান ছড়া। রিক্রুটিং-অফিসারের আর কি! একটি ছেলেকে ভর্তি করতে পারলেই তার পকেটে কর্‌করে তিনটি টাকা। তাই দেখেন না, দয়ার অবতারটি সেজে বসে আছেন।

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওঃ কি সাংঘাতিক!

ব্যারাকে এসে অমল বোঁচকাটা খাটিয়ার ওপর ফেলতেই একরাশ ধুলো উড়ে এল। পাশের সীট্ থেকে ছেলেটি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, আচ্ছা লোকতো মশাই! একটু কমনসেন্সও নেই!

লজ্জায় অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। রজত রুখে দাঁড়িয়ে বলল, তুই থাম দিবাকর! ভারী আমার কমনসেন্সওয়ালারে! তোমার এটুকু কমনসেন্স হল না যে, উনি একজন নতুন লোক, কেমন করে জানবেন, তোমাদের ওই কম্বলে দেড়মণ ধুলো ভর্তি?

দিবাকর অমলের সামনে এসে বলল, কিছু মনে করবেন না মশাই, হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। রাগ কি আর সাধে হয়! শালারা মনে করে কি! ইন্ডিয়ানরা কি পরিষ্কার বিছানায়ও শুতে জানে না! খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই কম্বলটায় এর আগে অন্তত দু'শ-জন শুয়ে গেছে! কার কি ব্যামো ছিল কে জানে!

অমলের সমস্ত শরীরটা শিউরে ওঠে! হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চট্ করে খানিকটা পিছিয়ে গেল। দিবাকর কাঁধ কুঁচকে বলল, উপায় নেই মশাই, কোন উপায় নেই! এই হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড!

রজত অমলকে বলল, যাক, বিছানাটা লাগিয়ে ফেলুন, তবুও একটু আরাম করে বসতে পারবেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি ঘুরে আসছি, তারপর ক্যানটিনে খেয়ে নেব। এ বেলাটা এদের অল-ইন্ডিয়া-কারি আর ঘুঁটে-ব্র্যান্ড রুটী নাইবা খেলেন!

অমল তখনও কম্বলটার দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘৃণায় আর আতঙ্কে তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দিবাকর তার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বলল, বুঝলেন মশাই, এখানকার এই হল ব্যবস্থা আর এ ব্যবস্থা আমাদের মানতেই হবে।

অমল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, মানতেই হবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই! এই রকম একটা অস্বাস্থ্যকর ব্যাপারের দিকে যদি আমরা অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তাহলে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে।

রজত হো-হো করে হেসে উঠল, নতুন নতুন এই রকম মনে হবে অমলবাবু; আর কিছু দিন যাক তখন দেখবেন বিহিত করার কথা মনের ধারে-কাছেও আসবে না! যাক্, আপনি আপনার কাজগুলো সেরে ফেলুন, আমি আসছি ঘুরে।

রজত ব্যারাক থেকে বেরিয়ে গেল। দিবাকর আবার শুয়ে পড়ল তার খাটিয়ার ওপর লম্বা হয়ে। অমল তখনও সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে কম্বলটার দিকে চেয়ে।

ঘাড়টা কাৎ করে দিবাকর বলল, বুঝলেন মশাই, এক কাজ করুন। কম্বলটা মাঠে নিয়ে গিয়ে বেশ করে ঝেড়ে ফেলুন, তারপর ঘাসের ওপর পেতে দিন। ঘণ্টা তিন-চার কড়া রোদ পেলে ডিসিনফেকটেড হয়ে যাবে!

অমল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তখনই কম্বলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ঝেড়েঝুড়ে রোদে দিয়ে আবার ফিরে এল। দিবাকর ইসারা করে অমলকে কাছে ডেকে বলল, আজ সকালে এসেছেন বুঝি?

অমল মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

তা ওই রজতটা আপনার সঙ্গে ভীড়ল কি করে?

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে দিবাকর বলল, ওই চীজটির সঙ্গে একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

কেন বলুনতো?

সে কথা বুঝতে আপনার খুব বেশী দেরী লাগবে না। আপনাকে তো ক্যান্টিনে নেমন্তন্ন করেছে। দেখুন কোন দিক থেকে টোপ ফেলে!

ব্যারাকের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে একটি ছেলে হাঁক পাড়ল, কিরে দিবাকর খেয়াল আছে কটা বাজল?

দিবাকর আপনমনে বলে উঠল, কলুর বলদের আবার খেয়াল থাকা-থাকি কি! ঘানিতেতো জোতাই রয়েছি! ল্যাজমলা দিলেই চলতে সুরু করব।

কয়েকটা আড়ামোড়া ভেঙে সে উঠে পড়ল। সুটকেশের চাবি খুলতে খুলতে অমলকে বলল, এমন আকালের জায়গা আর কোথাও পাবেন না মশাই, তেলের শিশি, দাঁতের মাজন, সাবান, এমন কি টুথ-ব্রাশটা পর্যন্ত বাইরে রাখার উপায় নেই!

তেল মেখে সাবান আর গামছা নিয়ে বলল, চলুন স্নানটা সেরে আসা যাক। এখন তবুও কলের টাটকা জল পাবেন!

অমল জামা ছেড়ে গেঞ্জিটা খুলতে ইতস্তত করছে! দিবাকর তাড়া লাগাল, নিন মশাই তাড়াতাড়ি, আবারতো দশটায় ঘণ্টা পড়বে!

অমল জিজ্ঞেস করল, কিসের ঘণ্টা?

আর কিসের! খাওয়ার! খেয়েই ছোটো ক্লাসে। এগারটা থেকে চারটে পর্যন্ত ক্লাস। দেখুন না, সকালে একঘণ্টা পি-টি হওয়ার কথা, তার জায়গায় সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত করাবে ফেটীগ।

বিস্মিত কণ্ঠে অমল প্রশ্ন করে, ফেটীগ!

মাথার তালুতে বাঁহাতের চেটো দিয়ে তেল ঘষতে ঘষতে দিবাকর বলল, হ্যাঁ মশাই ফেটীগ! মিলিটারীতে এইতো মাত্র দু'টি কাজ, প্যারেড আর ফেটীগ। বাঁধন ছিঁড়ে যাবে মশাই মাটি কাটতে কাটতে আর কুলির মত বস্তা বইতে বইতে! এরই নাম ফেটীগ।

অমল আর দিবাকর স্নানের জায়গায় এসে পেঁছিল। প্রকাণ্ড লম্বা হৌজ, ডজনখানেক কল দিয়ে তোড়ে জল পড়ছে, চারপাশে তার সিমেন্ট-বাঁধান চত্বর। ছেলেরা চারিদিক ঘিরে স্নান করছে। অমল দেখল সকলেই সাবান মাখছে, টুথব্রাশে দাঁত মাজছে! মনে পড়ল তার রিক্রুটিং

অফিসের সামনে সেই ভীড়! সেখানে মানুষগুলোকে কেমন আলাদা আলাদা চেনা গিয়েছিল! কিন্তু এখানে সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে!

একটা রব উঠল, এইরে দেবদাস আসছে!

একটি বছর-ত্রিশের যুবক টুথব্রাশ মুখে চৌবাচ্চার চাতালে এসে দাঁড়াল। অমল ভেবে পেল না এর আগমনটা হঠাৎ এমন উদ্বেগের সৃষ্টি করল কেন!

দিবাকর বলল, দোহাই দেবদাস, আমার স্নানটা হয়ে যাক।

দেবদাস মুখভর্তি ফেণা নিয়ে বলল, তুমি কি এমন ষোলবছরের ছুঁড়িটি যে তোমার লজ্জা করবে?

দিবাকর তার চুলভরা বুকে সাবান ঘষতে ঘষতে বলল, কেন, লজ্জা-সরম বুঝি কেবল ছুঁড়িদের বেলায় আর তুমি একটা বুড়োমদ্দ এতগুলো লোকের সামনে উলংগ হয়ে নাচবে, সেটা বুঝি খুব বাহাদুরী!

দেবদাস ভারিক্কি গলায় ঘোষণা করল, এখানে যারা লজ্জাবতী লতা আছ তারা চোখ বন্ধ কর।

অমল সবিস্ময়ে দেখল, দেবদাস সত্যিই উলংগ হয়ে মাথায় জল ঢালছে!

স্নান সেরে ব্যারাকে ফিরে দিবাকর মগ আর প্লেট নিয়ে খেতে চলে গেল। অমল ভাবছিল, খাওয়াটা সেরে নিলেই হত। রজত সম্বন্ধে এই সময়টুকুর মধ্যে সে যতটুকু জেনেছে তাতে তার সংগে এইটুকু আলাপই যেন তাকে সংকুচিত করে তুলেছে।

খাওয়া সেরে ফিরে এসে দিবাকর ধীরে ধীরে ইউনিফর্ম পরল। কম্বলের ভাঁজের মধ্যে থেকে বার করল বইখাতা। যাওয়ার সময় অমলকে বলল, খেয়ে নিলেই পারতেন, রজতের কথাতো!

ধীরে ধীরে ব্যারাক থেকে সমস্ত ছেলেই বেরিয়ে গেল। কেবল একটি ছেলে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। তার জ্বর হয়েছে। অমল ভাবছিল, অসুখ-বিসুখ করলেও কি কেউ দেখেনা! তার ইচ্ছে হচ্ছিল ছেলেটির কাছে বসে তার একটু শুশ্রূষা করে।

হন্তদন্ত হয়ে রজত ব্যারাকে ঢুকে বলল, চলুন অমলবাবু খাওয়াটা

সেরে আসা যাক।

অমল বলল, স্নান সেরে নিন।

নাঃ, সে না হয় বিকেলে করা যাবেখন।

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে অমল বলল, আচ্ছা রজতবাবু, ওই যে ভদ্রলোকটির জ্বর হয়েছে, ওঁকে দেখাশোনা করার কোন ব্যবস্থা নেই?

কেন, সিক্ এন্-সি-ও'তো সকালে ওষুধ দিয়ে গেছে! আবার ঠিক এগারটার সময় ডায়েট্ দিয়ে যাবে। সে বিষয়ে ভাববার কিছু নেই! অনুষ্ঠানের ত্রুটী এখানে পাবেন না!

ক্যানটীনে ঢুকে ভাত আর ফাউলকারির অর্ডার দিয়ে রজত বলল, জানেন অমলবাবু শুধু এই ক্যানটীনটার জন্য আমাদের লঙ্গরের রান্না অত খারাপ! ক্যাম্পের অর্ধেক ছেলে বোধহয় তাদের মাইনের সবটাই এখানে খরচ করে। আর মাইনেরতো ওই বহর! পঁচিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ! তা থেকে আর বাড়ীতেই বা পাঠাবে কি?

অমল বলল, এটা কিন্তু ছেলেদের খুব অন্যায়।

আপনি তো বললেন অন্যায় কিন্তু তারাই বা করে কি? খাওয়ার জন্যইতো মিলিটারীতে ঢোকা! আর খেতেই যদি না পারল তাহলেতো মশাই বাড়ীতে পড়ে পড়ে মরতে পারত!

লঙ্গরের রান্না এত খারাপ হওয়ার কারণ?

কারণটা অতি সরল। একেবারে ত্রিশক্তি-অনাক্রমণ-চুক্তি! ক্যানটীনের মালিক টাকা খাওয়ায় ও-সি'কে খদ্দের পাওয়ার জন্য। আবার ওদিক থেকে লঙ্গরের কনট্র্যাক্টর খারাপ রান্না চালু রাখার জন্য টাকা দেয় ও-সি'কে! আমাদের ও-সি দুদিক থেকে টাকা খেয়ে ছেলেদের ডাণ্ডার ডগায় ঠাণ্ডা রেখেছেন! কেমন চমৎকার ব্যবস্থা বলুনতো?

অমল আরও একবার আঁতকে উঠল, কি সাংঘাতিক!

মাংস আর ভাত দিয়ে গেল। আহা, মাংসের কি চেহারা! গন্ধেই জিভে জল আসে! রজত খেতে আরম্ভ করে বলল, আপনার ওসব চলে-টলে নাকি অমলবাবু?

কি সব?

এই একটুআধটু তরল পদার্থ আর কি!

অমল শক্ত হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞচিত্তে দিবাকরকে স্মরণ করে বলল, না।

রজত কথার ওপর মোচড় দিয়ে বলল, আপনি যে দেখছি নিতান্তই বেরসিক মশাই! এটা না চলে, ডব্লিউ-স্কোয়ারের অপরটাতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না?

বিরক্তির সুরে অমল বলল, না আমার কোনটাই চলবে না।

এঃ একেবারে নাবালক! নাঃ, আমাকেই দেখছি শেষ পর্যন্ত আপনাকে গড়েপিটে মানুষ করে নিতে হবে।

খাওয়ার স্পৃহা অমলের উবে গেছে। ভাতের প্লেট থেকে ঝট করে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, তার মানে?

রজত মুচকে হেসে বলল, আপনিতো দেখছি আচ্ছা ছেলেমানুষ! রাগ না হয় আমার ওপর করুন, কিন্তু ভাতগুলো কি দোষ করল! একটু থেমে কনুইদুটো টেবিলের ওপর রেখে বলল, ব্যাপারটা কি জানেন? যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। মিলিটারীতে ঢুকেছেন মিলিটারীই আপনাকে হতে হবে। এখন না হয় ট্রেনিং-ক্যাম্পে আছেন, বেশ মজায় আছেন! কিন্তু কোম্পানিতে যখন পোষ্টেড্ হবেন, ওভারসীজ যখন যাবেন তখনতো কেবল প্যারেড আর প্যারেড! উঠাও রাইফেল! নামাও রাইফেল! বিদেশ-বিভূঁই জায়গা, প্রাণটা যে হাঁপিয়ে উঠবে! তাই ফুর্তি চাই, সৈনিকের জীবনে ফুর্তি চাই। কোম্পানিই আপনাকে মদ, মাগি, সবই যোগাবে। তা না-হলে এই কয়েদীর জীবন আর গরু-ভেড়ার মত ব্যবহারে যে ক্ষেপে উঠবেন মশাই! সহ্য করতে পারবেন না। কোন সহজ মানুষই পারে না। তখনতো ছুটবেন বিহিত করতে? ব্যাস, হয় ফাঁসিতে লটকে না-হয় গুলি করে আপনার ভবযন্ত্রণা শেষ করে দেবে!

অমলের সমস্ত শরীরটা বারকয়েক কেঁপে ওঠে! চাপা একটা আর্তনাদ যেন বুকের মধ্যে আছাড়িপিছাড়ি খেতে থাকে! রজতের আবেগময় মুখখানার দিকে সে নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলতে আরম্ভ করে, মদ খাওয়ার অভ্যেস আমারও কোনদিন ছিল না। আরে মশাই বিড়ি খাওয়ার পয়সা জুটত না তা আবার মদ! কিন্তু এখানে আসার মাসখানেকের মধ্যেই মদ ধরেছি।

বেড়ে আছি মশাই! সারাটা দিন ফাঁকিফুকি দিয়ে কোনরকমে কাটিয়ে দিই। সন্ধ্যের পর আপনারা যখন ওই মড়ার খাটগুলোর ওপর শুয়ে জাবর কাটেন, আমি তখন একটি পাঁট টেনে বুঁদ! তখন আমিই বা কে! আর শালা লাটসাহেবই বা কে!

অমলের কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছে। রজত যে ভাবে বলছে তাতে যেন লোভ লাগে!

রজত ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ এঁটো হাতেই অমলের ডান হাতটা চেপে ধরল, চলুন মাইরী, একটা দিন না-হয় চেখেই দেখুন! কোন রোগ যে হবে না সে বিষয়ে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি—রজতের চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে, মুখটা থম্‌থম্ করছে, কথাও কেমন যেন জড়িয়ে গেছে!

অমল ঘেমে উঠেছে। তার রীতিমত ভয় করছে! ঝট করে উঠে পড়ে বলল, আমি চললুম রজুতবাবু—

বিকেল বেলা। টেকনিক্যাল-ক্লাস থেকে ছেলেরা ফিরে এসেছে। ব্যারাক আবার সরগরম! অসীম ব্যস্ততার সংগে জনকয়েক বিছানা পাতছে। কেউ কেউ স্নান সেরে ধুতি-পাঞ্জাবী পরছে। অমল দিবাকরকে জিজ্ঞেস করল, এরা সব যাচ্ছে কোথায়?

দিবাকর বলল, নানান লোকের নানান যাওয়ার জায়গা। কেউ যাবে বাড়ী, যাদের বাড়ী কাছেই। কতক এমনি খানিকটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেফিরে বেড়াবে, হোটেল-রেষ্টুরেন্টে মুখ-বদলে আসবে। কতক যাবে মদ আর মাগির সন্ধানে। আর কতক স্টেশনে বসে মেয়ে দেখবে।

অমল বলল, আপনি যে কোথাও গেলেন না?

নাঃ, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ভাল লাগেনা। তাছাড়া বেরুলেই তো পয়সা খরচ। আর 'ম'কার ব্যাধিটা এখনও ধরেনি! শনিবার দুপুরে ক্লাসের পর বাড়ী যাই আর সোমবার পি-টি'র সময় ফিরে আসি। আমি মশাই ছাপোষা মানুষ, মাগ-ছেলে নিয়ে ঘর করতে হয়, ওসব উড়ন-চড়েমি আমাদের মানায় না!

অমলের মনে হয়, দিবাকরের কথা বলার ধরণটাই কেমন যেন অশ্লীল! এরকম ভাষায় আলাপ করতে তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। কিন্তু অনেকবার অনেকভাবে লক্ষ্য করে দেখেছে, নিছক অশ্লীলতা করার

জন্যতো দিবাকর এভাবে কথা বলেনা!

দিবাকর অমলের খাটের দিকে নজর করে বলল, কই অমলবাবু আপনার কম্বল তুলে নিয়ে এলেন না?

অমল বলল, এই যাঃ, এক্কেবারে ভুলে গেছি!

তা ভালই হয়েছে! বেশ গরম হয়েছে, শুয়ে আজ আরাম পাবেন। রোজই ভাবি কম্বলটা রোদে দেব। তা কি ছাই দেওয়ার যো আছে! ড্রেসিঙের জন্য চব্বিশভাঁজ আপনাকে রোজ করতেই হবে?

অমল কম্বলটা তুলে এনে ভাঁজ করতে লাগল। দিবাকর বলল, ওরকম ভাঁজ করবেন না। প্রথমে চওড়া দিক থেকে দু'ভাঁজ করে ফেলুন তারপর লম্বালম্বি তিনভাঁজ। ব্যাস, এইভাবে পেতে রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দিন। সকাল বেলায় উঠে ওটাকে আবার চারভাঁজ করে দেবেন, তাহলেই আপনার ড্রেসিঙের ভাঁজ হয়ে গেল!

দিবাকরের নির্দেশমত ভাঁজ করে কম্বলটা খাটিয়ার ওপর পেতে অমল বলল, এ যে অনেক ছোট হয়ে গেল, পা বেরিয়ে পড়বে যে!

তা একটু পড়বে বৈকি! রাত্তিরে আর কতক্ষণইবা আরাম করে ঘুমোবেন! দুদিন অন্তর মাঝরাতে উঠে দুঘন্টা করে লাঠি ঘাড়ে টহল দিতেই হবে। তার ওপর কোয়ার্টার-গার্ড-ডিউটী আছে সপ্তাহে একদিন, সেদিনতো আপনার কোয়ার্টার-গার্ডেই রাত্রিবাস!

কম্বল পেতে কীটগুলো নাড়াচাড়া করে দেখল বিছানার সরঞ্জাম ওইখানেই শেষ! আর যা কিছু রয়েছে, সেতো জামাকাপড়! অমল বলল চাদর বালিশ আবার কবে দেবে?

দিবাকর হো-হো করে হেসে উঠল, তবুও ভাল যে শুধু চাদর আর বালিশ চেয়েছেন! একটা বৌ যে চাননি এই রক্ষে! আরে মশাই ওরা জানে আমরা লোটা-কম্বলওয়ালার জাত! তবুও আমাদের বরাত ভালই বলতে হবে যে, গান্ধিজীকে দেখে একটা করে ল্যাঙ্গোট দিয়েই পোষাক শেষ করেনি! চাদর, বালিশ আপনাকে বাড়ী থেকে আনতে হবে।

অমল হতভম্ব হয়ে দিবাকরের দিকে চেয়ে আছে! শুধু একটা কম্বলের ওপর একটা মানুষ শোবে কি করে!

দিবাকর বলল, এক কাজ করুন, ফালতু জামাকাপড়গুলো ভাঁজ

করে আর একটা জামার মধ্যে পাকিয়ে ফেলুন আর আপনার গামছাটা পেতে দিন কম্বলটার ওপর। ব্যাস, আপনার বালিশ আর চাদর দুইই হয়ে গেল।

ব্যারাক প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। বাকী যারা আছে তারা ছোট ছোট দলে নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কোথাও দুটো খাটিয়া জোড়া লাগিয়ে চলেছে তাস। কোথাও রাজনীতির তর্ক। কোথাও 'সঞ্চয়িতা' থেকে একজন কবিতা পড়ছে আর জন দুই-তিন গালে হাত দিয়ে বসে শুনছে। কোথাও কেউ নাতিউচ্চস্বরে গান ধরেছে আর বাকী সকলে দেশলাইয়ের খোলে আঙুল ঠুকে তাল দিচ্ছে। কেউ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, কেউ খাটিয়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে চিঠি লিখছে। অসুস্থ সেই ছেলেটি মুখ থেকে কম্বলের ঢাকা সরিয়ে আর একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করছে, অপর ছেলেটি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ব্যারাকের ছোট্ট জানলাগুলো দিয়ে খানিকটা আলো এসে তখনও ব্যারাকের মধ্যে ঢুকছে। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি যেন ব্যারাকের দেয়ালে দেয়ালে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যারাকের মধ্যেকার সবকটি ছেলেই প্রায় চুপ হয়ে গেছে। কেবল গায়ক সেই ছেলেটির গানের স্তিমিত সুর তখনও ভনভন করছে। অমলের মনটা হয়ে উঠেছে ভারী। এই আবহাওয়ার বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য তার মনটা আকুলিবিকুলি করছে!

খনখন করে ঘন্টা বেজে উঠল! অমল দিবাকরের দিকে ফিরে চাইল। দিবাকর বলল, খাওয়ার ঘন্টা।

এ দরজা, সে দরজা, ও দরজা দিয়ে অনেকগুলো ছেলে হুড়মুড় করে ব্যারাকে এসে ঢুকল। যার যার খাটিয়ার তলা থেকে মগ আর প্লেট নিয়ে আবার তারা তেমনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। দিবাকর মগ ভর্তি জল আর প্লেটটা নিয়ে বলল, চলুন অমলবাবু দুটো খেয়ে আসা যাক। এ বেলাতো আর রজতের নেমন্তন্ন নেই!

লজ্জায় অমল কুঁচকে উঠল। রজতের নেমন্তন্ন-রহস্য দিবাকরও জানে নাকি! কে জানে, হয়তো সে-ও একজন ভুক্তভোগী!

ওরা দুজনে লম্বা একটা লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অমল

দেখল কিছুদূরে আরও একটা লাইন। জিজ্ঞেস করল, ওদিকে আবার লাইন দিয়েছে কারা?

মুসলমানেরা। তাদের আলাদা লঙ্গর কিনা।

কেন, মুসলমানেরা বুঝি আমাদের সঙ্গে খেতে চায় না?

মোটেই তা নয়! ওদের জাত আমাদের মত এত ঠুনকো নয়!

তবে যে আমরা বণ্ডে সই করলাম জাতিধর্ম নির্বিশেষে একই সঙ্গে থাকতে ও খেতে হবে!

বুঝলেন না, ওটা হচ্ছে কর্তাদের সুবিধের জন্য। যতদিন ডাইনিং-হল তৈরী হয়নি ততদিন দিব্যি আমরা একই সঙ্গে খেয়েছি! কিন্তু যেই ডাইনিং-হলটী তৈরী হল অমনি ধর্মের ওপর দরদ উথ্‌লে উঠল! জানেনতো এদের ডিভাইড-এ্যান্ড-রুল পলিসি!

একপা একপা করে ওরা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পাশে কাৎ হয়ে দেখে নিচ্ছে সামনে আর কতজন। দিবাকর ফোঁস করে উঠল, দেবেতো শালারা একচাঙড়া ভাত আর একহাতা কেলে ডাল!

অমল বলল, শুধু ডাল আর ভাত!

তা ছাড়া আর কি! কে আপনার কোলের মাগটী এখানে আছে যে আপনার জন্যে পাঁচব্যান্নন ভাত বাঁধবে! তাও যদি আবার ডালভাতের চেহারা দেখেন আপনার অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে!

অমল পরিবেশনকারীর সামনে এসে পড়েছে। প্লেট পাততে বিরাট একডেলা ভাত একটা খেন্তা করে তুলে তার ওপর ধপ করে ফেলে দিল। নিরেট ডেলাটা প্লেটের একপাশে পড়তে প্লেটটা বেসামাল হয়ে পড়ল। দুহাতে ধরে অমল সামলে নিল। পরিবেশনকারী খ্যাঁক করে উঠল, ক্যারে, বিলকুল নায় রঙরুট হো?

ভাতের জন্য বিরাট এক বাথ-টাব আর টীনের ক্যানেস্তারায় ডাল। ডাল-পরিবেশনকাবী গানের সুরে হাঁক পাড়ল—

আরে আ যা রঙরুট,
ঘরমে মিল্‌তা শুখা চাপাটি,
ফৌজমে মিলেগা ফু-রুট্‌,
আরে আ যা রঙরুট!

অমল এগিয়ে গিয়ে ভাতশুদ্ধ প্লেটটা পেতে ধরল। একহাতা ডাল প্লেটের ওপর ঢেলে দিতেই খানিকটা উপছে পড়ল তার গায়ে। অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখখানা রাগে থমথম করছে, সমস্ত শরীরটা কাঁপছে থরথর করে। দাঁতে দাঁত চেপে সে লোকটার মুখের দিকে কটমট করে চাইল। খোস মেজাজে পরিবেশনকারী ততক্ষণে তার পরের কলি ধরেছে—

আরে আ যা রঙরুট,
ঘরমে মিল্‌তা ফাট্টা কাপ্‌ড়া,
ফৌজমে মিলেগা সু-উ-ট্‌,
আরে আ যা রঙরুট!

দিবাকর পেছন থেকে অমলকে আস্তে ঠেলা দিল। অমল গেল এগিয়ে। তখনও তার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে রয়েছে। সে ভাবছিল, দরিদ্রনারায়ণ সেবার নামে কাঙালীভোজন সে অনেক দেখেছে। কিন্তু এরা অন্ন বিতরণ করছে কাদের!

খানা নিয়ে দিবাকর অমলের পাশে এসে বলল, প্রথম প্রথম দিনকতক একটু কষ্ট হবে অমলবাবু তারপর এ সমস্তই গা-সহা হয়ে যাবে।

চমৎকার সান্ত্বনা! অমল একথা এই একটী দিনের মধ্যে বহুবার শুনেছে। মন বিরোধী হয়ে উঠলেও সে চুপ করে থকে।

দিবাকর বলে চলেছে, এই হল ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ! একজন ইণ্ডিয়ানের জন্য দৈনিক খাইখরচ বাবদ গভর্ণমেন্ট বরাদ্দ করেছে পাঁচ-আনা। বেচারা কনট্র্যাক্টরতো আর অন্নছত্তর্ খুলে বসেনি !

ডাইনিং-হলে এসে ওরা ঢুকল। লম্বা একটা হল, সিমেন্ট-করা মেঝে। বসার বন্দোবস্ত ছেলেরা ইট কুড়িয়ে এনে নিজেরাই করে নিয়েছে। খাচ্ছে উবু হয়ে বসে সামনে প্লেট রেখে। দিবাকরকে দেখতে পেয়ে একটা কোণ থেকে একটী ছেলে হেঁকে উঠল, এই দিবাকর, কাঁচা লঙ্কা আছে রে?

দিবাকর অমলকে বলল, আসুন ওইদিকে।

হাফ-প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাঁচালঙ্কা বার করে ছেলেটীর

হাতে দিয়ে তার পাশের ইটটায় বসে পড়ল। দূরে একটা ইট দেখিয়ে অমলকে বলল, ওইটা টেনে নিয়ে বসে পড়ুন অমলবাবু।

ইট না নিয়ে অমল এমনি উবু হয়ে বসল। দিবাকর বলল, জানেন অমলবাবু, এই সমর প্রথমদিন ভাতের প্লেট ছুড়ে লাঙ্গরীদের মেরেছিল! তার জন্য ওর শাস্তি হয়েছিল পিঠঠু-প্যারেড্।

অমল জিজ্ঞেস করল, পিঠঠু-প্যারেডটা আবার কি জিনিষ?

দিবাকর বলল, জিনিষ অতি মনোহর। একটা প্যাকের মধ্যে অন্তত আধমণ ইটপাথর পুরে পিঠের ওপর ঝুলিয়ে দেবে। তারপর করাবে মার্চিং। প্রথমে কুইক-মার্চ, তারপর ডবল-মার্চ, তারপর মাথার ওপর দুহাত তুলে ডবল-মার্চ! সমর বলেই তাই সামলাতে পেরেছিল। কত ছেলে যে মশাই লটকে পড়ে!

সমর বলে উঠল, কিন্তু ছেলেরা এ সব জুলুম খুব বেশীদিন সহ্য করবে না। সহ্যেরওতো একটা সীমা আছে!

দিবাকর বলল, কি আর করবে! একটু ট্যাঁ-ফুঁ করলেইতো দেবে কোম্পানিতে চালান করে!

দু'একজনের বেলায় ওই রকমই হবে কিন্তু সব ছেলে মিলে একবার বেঁকে দাঁড়ালেই বাছাধনরা ঠাণ্ডা!

ওই আনন্দেই থাক! তোমার বিশমণ তেলও পুড়েছে আর রাধাও নেচেছে! শালা কনট্র্যাক্টরতো জমাদার, হাবিলদার, আর তার লেজুড়দের জন্যে আলাদা রান্না করে খাওয়াচ্ছে। তুমি ও-সি'র কাছে গিয়ে নালিশ করবে, খানা খারাপ—আর জমাদার, হাবিলদার গিয়ে বলবে, বহৎ আচ্ছা খানা সা'ব, ঘরমেভি ঐসা নাহি মিল্‌তা। ব্যাস তুমি হয়ে যাবে রিঙ-লিডার! ও-সি দিব্যচক্ষে দেখতে পাবে ক্যাম্পের মধ্যে চলেছে কনস-পিরেসি-ফর-মিউটিনি! অমনি তুমি চালান হয়ে যাবে ঠাণ্ডি-গারদ। আর আমরা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলব সমরটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ —স্থান, কাল, পাত্তর বোঝেনা! আমিতো যা বুঝি, মুখটী বুজে কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় করে যাও। আরে বাবা বুঝলে না আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

ভাতের প্লেট অমলের সামনে যেমনকে-তেমনি পড়ে রয়েছে। সে

কানে শুনছে দিবাকরের কথা, আর চোখে দেখছে তার থেকে কিছুদূরে একটী ছেলের কান্ড! ভাতের প্লেটটা উল্টে দিয়ে সে চিৎকার করছে, শালারা যদি আমাদের কয়েদী মনে করে থাকে তাহলেতো লপসী দিলেই পারে! ক্ষণেকের জন্য ছেলেটী তার চারপাশের ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ সে একলাফে এগিয়ে যায় লঙ্গরখানার দিকে, চিৎকার করে ওঠে, চল্, শালাদের লঙ্গরে আজ আগুন ধরিয়ে দেব।

দিবাকর অমলকে ঠেলা দিয়ে বলল, খেয়ে নিন অমলবাবু। ও ব্যাপার এখানে হামেশা ঘটছে। লাভের মধ্যে ছোঁড়াটার আজ আর খাওয়া হলনা।

খাওয়ার পালা শেষ করে সব ব্যারাকে ফিরেছে। আবার সব আপন আপন দলে ভাগ হয়ে আড্ডা জমিয়েছে। অমল আশ্চর্য হয়ে দেখে ব্যাবাকে ফেরার পর খানার কথা বোধহয় কারও একবর্ণ মনে নেই!

দিবাকর হাতমুখ মুছে গামছাটা মশারীর দড়ির ওপর মেলে দিয়ে বলল, এতেও শালাদের মন ভরেনা। এরপরও আবার রোল-কল! যেন খোঁয়াড়ে গরু-গিণতি করবে!

দিবাকর আর অমলকে এক-একখিলি পান দিয়ে সমর বলল, জানিস জগৎ সিংহটা দেখি রেলওয়ে-কোয়ার্টারের রকে বসে রয়েছে।

দিবাকর বলল, টেঁশো ছুঁড়িগুলো নাকি সব ওর প্রেমে পড়ে গেছে!

হ্যাঃ, আর লোক পেলেনা কিনা! কোনদিন মারধোর খাবে আর কি!

তা কি আর করবে বল। সাবাদিনটাতো কাটছে এদের হুকুম তামিল করতে। যে সময়টুকু ফাঁক পায় সে সময়টা নিয়ে কি করবে তাই বল?

অমলের দিকে ফিরে বলল, আচ্ছা অমলবাবু আপনিই বলুন, একটা জোয়ান-সোমত্ত পুরুষ-ব্যাটাছেলে, তার মনের খোরাকতো কিছু চাই! কিন্তু এরা তার কোন ব্যবস্থাটা করেছে? তাই মন তাজা রাখার জন্য মদ, মাগি, গুন্ডাবাজি করে বেড়ায়!

অমল বলল, কেন, আমরা নিজেরাইতো একজাগায় বসে একটু-আধটু পড়াশুনা, গান-বাজনা, খেলাধুলো করে সময় কাটাতে পারি।

আপনি যতটা সহজ করে বললেন অমলবাবু, কাজটা কিন্তু অত সহজ নয়। ওরকম কিছু একটা করতে পারলেতো আমরা মানুষ হয়ে যেতুম—দিবাকর যেন ঝিমিয়ে যায়, আপন মনেই বলতে থাকে, বুঝি,

কাজগুলো খুবই খারাপ। আমি ওকে বারণও করেছি। কিন্তু বার-বার মনে হয় এই ছেলেগুলোতো আগে এমন বদ ছিলনা! কিন্তু মিলি-টারীতে ঢুকেইবা এমন কেন হয়।

হুইসিল্ বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে হাঁক, রুলকলকে লিয়ে ফল-ইন—

ছেলেরা আড়ামোড়া ভেঙে মাথায় ফোরেজ-ক্যাপ লাগিয়ে গজগজ করতে করতে মাঠের দিকে চলল। একজন ল্যান্স-নায়েক ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ব্যারাকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হেঁকে চলল, ব্যারিকমে কোই নহি রহেগা, চলো সবকোই রুলকলমে—

রোল-কলে দাঁড়িয়ে অমল দেখল অনেক লোক, অন্তত পাঁচ-ছ'শতো বটেই! ব্যারাক ব্যারাক ভাগ হয়ে চতুষ্কোণ আকারে দাঁড়িয়েছে। হাবিলদার সাহেব হাঁকলেন, ঠিক্‌সে সুকের-ফরমেশনমে ফল্-ইন্—

দিবাকর অমলকে বলল, হাবিলদার কি বলল বলুনতো?

অমল বলল, ওই যে সুকের-ফরমেশন না কি যেন।

বলল স্কোয়ার ফরমেশন।

অমল খুঁকখুঁক করে হেসে উঠল। দিবাকর বলল, সাবধান, ও বেটা যদি দেখতে পায় তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।

বারকয়েক এ্যাটেনশান, ষ্ট্যান্ড-এ্যাট-ইজ হওয়ার পর পার্ট-ওয়ান্-অর্ডার পড়া সুরু হল। একটী লোক অনর্গল অদ্ভুত একটা শব্দ করে চলল। অমল ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কি ভাষা বলছে?

দিবাকর বলল, রোমান উর্দু।

তারপর ব্যারাক-কমান্ডারদের রিপোর্ট। ব্যারাকের নম্বর ধরে হাবিল-দার ডাক দেয় আর ব্যারাক-কমান্ডাররা তড়বড় করে কি সব যেন বলে। অমল তার একবর্ণও বুঝতে না পেরে দিবাকরের স্মরণাপন্ন হল, কি বলছে ওরা?

দিবাকর বলল, ব্যারাকের লোকের হিসেব দিচ্ছে। ওই যে বলল, দো রাহধারী—তিন সিক—বাকী ঠিক, তার মানে দুজন ছুটী নিয়ে বাইরে গেছে, তিনজনের অসুখ, বাকী সকলে রোল-কলে হাজির।

অমল বলল, কিন্তু বাইরে গেছেতো অনেকে!

দিবাকর হেসে উঠল, বুঝলেন না ব্যাপারটা, চোরেরাই যদি কনষ্টেবল

হয় তাহলে আর চোর ধরবে কে!

রিপোর্টিঙের পালা শেষ হলে হাবিলদার সাহেব কোথায় যেন গেলেন! দিবাকর বলল, গেল জমাদার সাহেবের কাছে রিপোর্ট দিতে। তিনি হয়তো উপুড় হয়ে পড়ে গা ডলাই-মলাই করাচ্ছেন! যাক্, সে শালা যে আসেনি সেই মঙ্গল! এলেইতো তাঁকে একটা সেলাম করতে হত!

অমল জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দিবাকরবাবু এই হাবিলদার জমাদাররাও কি রেলের কাজে ভর্তি হয়েছে?

দিবাকর বলল, মোটেই না, এরা হচ্ছে রেগুলার-ফোর্সের লোক। এদের এনেছে আমাদের মিলিটারী ট্রেণিং দিতে!

কিন্তু এরা যে একেবারে অশিক্ষিত।

সেই জন্যইতো ডিসিপ্লিন এত ভালো রপ্ত করতে পারে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই হাবিলদার সাহেব ফিরে এসে হুকুম দিলেন, রুলকল—ষ্ট্যান্ড-এ্যাট-ইজ—ষ্ট্যান্ড-ইজি। সবকটা লাইন থেকে জামার খসখস, গলাঝাড়া নাকঝাড়ার শব্দ একই সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল।

দিবাকর বলল, এইরে মেরেছে! এইবার শালার লেকচার সুরু হবে। অন্তত আধঘটী ঘন্টা গর্ভ-যন্ত্রণা!

হাবিলদার সাহেব গলা ঝেড়ে বললেন, শুনো জোয়ান্, ডিস্-পিলিন্‌কা বারেমে লেচ্‌কর্। সির্‌ফ্ দো বাত্। পহেলি বাত্—হুকম্ মানো। হুকম্ মান্‌নেকা তরিকা ক্যা হ্যায়? কান খুলো—মতলব্, গওরসে হুকম্ শুনো। আঁখ্ খুলো—মতলব, আচ্ছাসে দেখ্‌কর্ আপনা কাম্ সমঝ্ লেও। মুহ্ মত্ খুলো—মতলব্, কভি কোইভি কাম্ ইন্‌কার মত্ করো।

অমলের পাশ থেকে চাপা গলায় কে যেন বলল, ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে এমন টনটনে জ্ঞান না হলে আর তোমার মত মেড়াকে হাবিলদার বানিয়েছে! ছিলেতো যাদু ঝাড়ুদার, হিটলারের দৌলতে হয়েছ হাবিলদার!

দুস্‌রী বাত্—হাবিলদার সাহেব বারকয়েক পায়চারী করে বললেন, ফৌজমে কভি কিসিকি সাথ্ ভাই-বন্দি মত্ করো।

আবার চাপা স্বর, তা করবে কেন! কেবল ছোঁড়ার তালে ঘোরো।

ক্যোঁ কি ইসকা নতিজা বহত্ বুরা হোতা হ্যায়—দাঁড়িয়ে পড়ে

হাবিলদার সাহেব বলে চললেন, তব্ শ্নো য়েক্ কিস্সা—

চাপাম্বর সরব হয়ে উঠল, তোমার গ্ষ্টির পিণ্ডি! শালা কিস্সা বলার আর জায়গা পেলে না! ভেবেছ, দ্নিয়াটা ব্ঝি তোমারই মত আকাট!

কিস্সা স্র্ হলঃ রাম সিং হিন্দ্স্তানী ফৌজকা য়েক্ সিপাহি। ছ্ট্টিপর যব্ ঘর্ গয়া, উস্কা ওয়ার্দিবগেরা দেখকর্ উস্কা ভাই শ্যাম সিংকা বহত্ লালচ্ পড়া। য়োভি ফৌজমে ভর্তি হোনেকে লিয়ে রাম সিংকা কহা। রাম সিং উস্কো বহত্ মানা কিয়া ঔর্ বহত্ কুছ্ সম্ঝায়া। শ্যাম সিং নাহি মানা। রাম সিং ছ্ট্টি খতম্ হোনেকো বাদ্ উস্কোভি সাথ লায়া। শ্যাম সিং ফৌজমে দাখিল হো গয়া।

একট্ থেমে নীরব শ্রোতাদের ওপর চোখ ব্লিয়ে নিয়ে বলে চললেন, শ্যাম সিংকা বহত্ সরাপ পিনেকা আদত্ থা। য়েক্ রোজ শ্যাম সিংনে রাম সিংকো কহা, 'ভাইয়া, র্ল্কল্মে মেরা হাজরী দে দেনা, ম্যায় থোড়া দেরকে লিয়ে বহার যাউংগা।' রাম সিং ভাই-বন্দিসে শ্যাম সিংকো হাজির কর্ দিয়া। উধর্ হ্য়া ক্যা? শ্যাম সিং মাতোয়ালা হালত্ পর্ রেলমে কাট্ গয়া। সবেরে ও-সি সাবকে পাস রিপ্ট আয়া। রাম সিং ঝ্টা হাজরী দেনেকো লিয়ে পকড় গয়া। উস্কা বহত্ শক্ত সাজা মিলা ঔর্ সাথই সাথ নোক্রিসেভি বর্খাস্ত কর্ দিয়া—

কয়েকটী সরব দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তুমিওতো সরাপ-টরাপ খাও বাবা, তুমি কবে কাটা পড়বে?

হাবিলদার সাহেব স্বরের পর্দা আরও খানিকটা চড়িয়ে বললেন, আভি দেখো জোয়ান ভাই-বন্দিকা ক্যা নতিজা হ্য়া। য়্যাদ্ রাখো, আইন্দা কভি কিসিকা সাথ ভাই-বন্দি মত করো।

রোল-কল শেষ হলে ব্যারাকে ফিরে অমল খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল। শরীরটা বিষম ক্লান্তিতে ঘিরে ধরেছে, ইচ্ছে করছে শ্য়ে পড়তে। কিন্তু গামছা-পাতা বিছানা দেখে তার সমস্ত মনটা বিষিয়ে ওঠে। ব্যারাকের মধ্যে কর্মতৎপরতা আবার কিছ্টা বেড়ে গেছে। জনকয়েক মশারী ফেলে দিয়ে ছোট ছোট দলে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

অমল জিজ্ঞেস করল, এত রাতে আবার এরা কোথায় যাচ্ছে?

দিবাকর বলল, কোথায় আর যাবে! শীকারের সন্ধানে।

অমলের মনটা বিগড়ে যায়। সব ছেলেই কি বেশ্যাবাড়ী যায়! না না, সকলেইতো যায় না, দিবাকর যায়নি, সমর যায়নি, আর ওরাওতো যায়নি। ঢাকনি-ঢাকা আলোর তলায় বসে কেমন সুন্দর তাস খেলছে!

দিবাকর অমলের কাঁধে একটা টোকা মেরে বলল, দেখতে যদি চান, দেখুন ডানদিকের ওই কোনটায়।

সেদিকে চেয়ে দেখে অমল বলল, ওখানটাতো অন্ধকার!

চেয়ে থাকুন কিছুক্ষণ তবেতো দেখতে পাবেন।

অমল চেয়ে রইল। দেখল, ছোট্ট একটা লাল আলো ঘুরে ঘুরে দপ করে জ্বলছে আর নিভছে! জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি?

দিবাকর বলল, ওটা হল আমাদের ব্যারাকের আবগারী বিভাগ। এখন চলেছে গঞ্জিকাপর্ব!

অমল আঁতকে ওঠে, গাঁজা খাচ্ছে! এরা কারা?

এরা? এরা আপনার আমার মতই ভদ্রলোক।

অমলের যেন কথাটা বিশ্বাস হয় না। মনে পড়ে তার মিলিটারী চাকরি নেওয়ার কথায় মিনির মন্তব্য, মাগো, মিলিটারীতেতো যত ছোট-লোক ভর্তি হয়। এইটাই কি সত্যি!

দিবাকর জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে মশারীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলল, নিন্, শুয়ে পড়ুন অমলবাবু, খামখা বসে থেকে আর লাভ কি! এসব ব্যাপার যত দেখবেন ততই মন খারাপ হবে।

অমলও শুয়ে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল, এ কোথায় সে এল!

দিবাকর ডাকল, অমলবাবু?

বলুন—

আপনি কেন এখানে এলেন বলুনতো?

এ ছাড়া আর যে কোন রাস্তা খুঁজে পাইনি!

বলেন কি! বি,এ, পাশ করেছেন তবুও রাস্তা খুঁজে পেলেন না! তাহলেতো আমার কথাই ওঠে না। চাকরি একটা করছিলাম বটে মার্চেন্ট অফিসে। চারবছর ধরে চাকরি করেছি একপয়সাও ইনক্রীমেন্ট পাইনি। যে কুড়িটাকাতে সুরু, অনাদি অনন্তকাল ধরে সেই কুড়িটাকাই চলেছে।

জানেনতো বাঙালী বাড়ীর কারবার! খেতে পাও আর না পাও আগে-ভাগে বিয়েটী দেওয়া চাই। একুশবছর বয়সে বাবা আমার বিয়ে দিলেন। তখন কিছু কি আর ভাববার বা বুঝবার সময় পেয়েছি। উঠতি যৌবন, রক্ত গরম! বিয়ে মানে, একটী মেয়ে আমার পাশে শোবে! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! তার ওপর নতুন চাকরিতে ঢুকেছি, কত আশা! চারবছর কেটে গেছে, দুটী ছেলেমেয়ে, একটী পয়সাও আয় বাড়েনি। জিনিষপত্তর আক্রা হতে সুরু হল, সংসার ক্রমেই অচল হয়ে পড়তে লাগল। প্রথমে বড় মেয়েটার দুধ বন্ধ হল তারপর কচিটারও। তাতেও কি শানায় মশাই! বাবা ঘ্যানর-ঘ্যানর সুরু করলেন। সবই যেন আমার দোষ! মাইনে বাড়ছেনা, তাও আমার দোষ! জিনিষপত্তরের দাম বাড়ছে, তাও আমার দোষ! আর দুটী সন্তানের জন্ম দিয়েছি, সেইটাই বোধহয় আমার সবচেয়ে বড় দোষ! আমার মত অবস্থায় নিশ্চয়ই আপনি পড়েননি?

অমল বলল, না, আমার অবস্থা একটু অন্যরকম। কিন্তু আপনি বিবাহিত, ছেলেমেয়ে আছে, আপনাকে ওরা বাধা দিলে না?

আরে মশাই হ্যাঃ! বাধা সব শালাই দেয়! বাধা দিয়ে কি তারা উপোষ করে থাকবে নাকি! উপায় নেই মশাই! যুদ্ধের ঠেলায় মরতে আমাদের হবেই সে বাড়ীতে বসে উপোষ করেই হোক! আর লড়াইয়ের মাঠে গুলি খেয়েই হোক!

বাইরে থেকে সোরগোলের একটা শব্দ এল। ব্যারাক-সেন্ট্রী খুব কড়া মেজাজে কাকে যেন ধমক দিচ্ছে। একটু পরেই গোঙানির একটা শব্দ বারান্দা থেকে ছিটকে এল, কোন শালা বলে আমি মাতাল!

ব্যারাক-সেন্ট্রী হাঁক পাড়ল, যাও চুপ করে শুয়ে পড়, মাতলাম করার জায়গা এটা নয় রজত।

দিবাকর বলল, এই হল এখানকার রাতের জীবন অমলবাবু। রজতটা রোজ মদ গিলে আসবে আর এমনি হল্লা করবে। এরপর জগৎ সিংহিটার পালা। তার সে প্রেমকাহিনী শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে। তারপর এ লাইনেও নিত্যনতুন রঙরুটতো আছেই! তাদের কেউ এসে হড়হড় করে বমি করবে! কেউ পায়খানা-পেচ্ছাব করবে! কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে! কেউ হাঃ-হাঃ করে হাসবে! সে যেন

এক আজব ব্যাপার সুরু হয়ে যাবে!

জনকয়েক রজতকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। রজত ধস্তাধস্তি করছে আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। দিবাকর বলল, ওদিকে কান দেবেন না অমলবাবু, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

চোখ বন্ধ করতেই অমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, ওঃ—মাঃ—

সপ্তাহখানেক কেটে গেছে...

সকালের ফেটিগ শেষ হয়েছে, ছেলেরা একে একে ব্যারাকে ফিরছে। দিবাকর আর অরুণ কথা কইতে কইতে দরজা দিয়ে ঢুকল। দিবাকর বলে উঠল, দেখলেতো রজত শালা কতবড় হারামি!

অরুণ বলল, হারামির আর কি হল! বল, কেমন ওস্তাদ! নিজের কাজটি কেমন গুছিয়ে নিল।

দিবাকরের কথা শুনে অমল ভেবেই পেল না রজত ল্যান্স-নায়েক হওয়ায় দিবাকর হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন! দিবাকরইতো তাকে কতবার মতলব দিয়েছে দরখাস্ত লেখার জন্য টাকা নিতে। দিবাকর বলেছে, 'কেন নেবেন না মশাই! অন্য কেউ হলেতো নিত। অফিসের হেডক্লার্ক মিত্তিরতো শুধু দরখাস্ত পেশ করার জন্যই সিকিটা, আধুলিটা নেয়। আরে মশাই, আপনিতো আর দেশের কাজ করার জন্য এখানে আসেননি, এসেছেন টু-পাইস্ করতে।'—তবে রজতের বেলাতেই তার এত রাগ কেন!

সমর দিবাকরের কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, শুধু রজতের দোষ দিলে চলবে কেন দিবাকর, দোষ হচ্ছে আমাদের এই মধ্যবিত্ত জাতটার! আমরা যে কুত্তার জাত!

অরুণ সমরের দিকে তেড়ে গেল, কুত্তার জাত মানে? খবরদার জাত তুলে কথা বলবেন না।

সমর বলল, নিশ্চয়ই, আমাদের জাতটারই দোষ। আজ আমি রজতের মত বাগাতে পারিনি বলেই হিংসেয় তাকে গাল দিচ্ছি। আপনি কি বলতে পারেন রজতের রাস্তা ধরতে আপনার ইচ্ছে করছে না?

অরুণ পা ঠুকে বলল, কক্ষণো না! আপনার মত ইতর আমি নই।

সমর হেসে উঠল, এইতো মশাই, সত্যি কথাটাও স্বীকার করতে সাহস হল না!

অরুণের হাঁক-ডাক একটু জোরই হয়েছিল। ঝগড়া মনে করে অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কোথা থেকে রজত ভীড় ঠেলে একেবারে মাঝখানে এসে বলল, আমি বারণ করে দিচ্ছি, এসব আলোচনা যেন আর কোনদিন আমার কানে না আসে!

রজতের কথা শুনে অমল তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। রজতের ডানহাতে নতুন ষ্ট্রাইপটা ঝকমক করছে।

দিবাকর বলল, তুই থাম রজত, ষ্ট্রাইপতো একটা লাগিয়ে নিয়েছিস! তোরতো কেল্লা ফতে!

রজত দিবাকরকে লক্ষ্য না করে সমরকে বলল, আমার সম্বন্ধে কেউ কোন আলোচনা করতে পারবে না, এ আমি সাফ বলে দিচ্ছি।

অমল খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটা মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সাংঘাতিক বদলে যায় কেমন করে! রজতকে আরও কাছ থেকে দেখার জন্য ভীড় ঘেঁষে দাঁড়াল।

সমর বলল, চোখ রাঙিয়ে মুখ বন্ধ করবে নাকি?

রজত চিৎকার করে উঠল, আলবৎ

অমল ফস করে বলে ফেলল এতখানি ক্ষমতা একজন ল্যান্স-নায়েককে দেওয়া হয়নি!

দিবাকর বলে উঠল, দ্যাখ রজত তোর কেরামতি জানতে আর বাকী নেই। যে উপায়ে তুই ল্যান্স-নায়েক হয়েছিস সেই উপায়ে তুই হাবিল-দারও হবি! সেই ব্যবস্থাই করগে যা!

রজত হুংকার দিয়ে উঠল, দিবাকর খুব বেশী বাড়াবাড়ি করছ। বলে দিচ্ছি, তোমার মুখ থেকে যেন আর একটা কথাও না শুনি।

দিবাকর থতমত খেয়ে গেল। আজ প্রায় তিনমাস সে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছে। মিলিটারী আইন ও শৃংখলার যেটুকু নমুনা সে এই সময়ের মধ্যে দেখেছে তাতে এরপর আর একইঞ্চিও এগোন চলে না।

রজত ভীড় ফাঁক করে অমলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, এখানে একজন গ্রাজুয়েটের কদর একটা ঝাড়ুদার বা লাঙ্গরীর চেয়ে এক কাণা-

কড়িও বেশী নয়! এখানে কদর হচ্ছে এই ফিতের! বুঝলেন?

অরুণ এতক্ষণ সিগারেট ধরিয়ে রিঙ-প্র্যাকটিশ করছিল। রজতের কথাটা তার মনঃপূত হওয়ায় খুঁকখুঁক করে হেসে উঠল। আর জন-কয়েক অধীর আগ্রহে অমলের মুখের দিকে রইল চেয়ে।

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। রজতকে সে বলল, গ্রাজুয়েটের কদর মানুষের কাছেই হয়, মদের বোতল আর বেশ্যাবাড়ীতে নয়!

রজত মারমুখো হয়ে অমলের দিকে একপা এগিয়ে গেল। অন্য সকলের খুশীতে-ফেটে-পড়া হাসির চোটে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা, সে মীমাংসা এখনই হয়ে যাবে—হনহন করে সে বেরিয়ে গেল।

একটী ছেলে দৌড়ে এসে অমলের হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, বড় জব্বর বলেছেন দাদা—বাকী ছেলেরা ব্যাপারগতিক দেখে সুড়সুড় করে ছড়িয়ে পড়ল!

দিবাকর বলল, তাইতো ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হয়ে গেল! অমলের হাতটা ধরে তাকে টেনে এনে নিজের খাটিয়ার ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি কেন কথা কইতে গেলেন বলুনতো।

অমল বলল, সকলের কথার মধ্যে আমিও কথা বলেছি, হঠাৎ আমার ওপর ক্ষেপে ওঠার কারণ কি!

সে আপনি বুঝবেন না অমলবাবু। একজন গ্রাজুয়েট হয়ে কেন যে আপনি মিলিটারীতে ঢুকলেন!

সমর এসে দিবাকরের খাটিয়ায় বসল। দিবাকর বলল, কি করা যায় বলতো সমর?

সমর বলল, দ্যাখ দিবাকর, যা করলে অমলবাবু শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারেন সে কাজ আমি ওঁকে করতে বলতে পারব না। তার চেয়ে আমি বলব শাস্তি মাথা পেতে নিতে।

অমল আঁতকে উঠল, তাহলে তার শাস্তি হবেই! কি শাস্তি হতে পারে? পিঠঠু প্যারেড! বুকের মধ্যেটা তার ঢিপঢিপ করে উঠল। ক্যাম্পশুদ্ধ ছেলে তাকে দেখবে পিঠঠু প্যারেড করতে! ওই অরুণ আর তার দল তাকে টিটকিরি দেবে! আর রজত প্রাণখুলে তার ওপর

মাতব্বরী করবে! হঠাৎ অমল উঠে দাঁড়াল। নাঃ, এখনই সে রজতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলবে! না-হয় সে ক্ষমাই চাইবে! কিন্তু পিঠঠু প্যারেড! না, না, তা সে কিছুতেই পারবে না!

সমর আর দিবাকর একই সঙ্গে অমলের মুখের দিকে চাইল। অমল দেখল বিষণ্ণ মুখে সমর তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে আর দিবাকরের মুখখানা ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। অমল ধপ করে বসে পড়ল। অন্তত এই দুজন সমব্যথির সামনে দিয়ে সে কাপুরুষের মত রজতের কাছে গিয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াতে পারবে না।

দিবাকর বলল, আমার আজ হঠাৎ কেমন মেজাজটা চড়ে গেল। নিজেদের মধ্যে যা ইচ্ছে করনা কেন আমি সইতে রাজি আছি। কিন্তু বিভীষণদের আমি বরদাস্ত করতে রাজি নই।

অমল খাটিয়ার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পা'দুটো তার ঝুলছে, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। কি তার ভাগ্যে ঘটতে চলেছে সে কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না।

দিবাকর বলে উঠল, বোধহয় এযাত্রা আপনার ফাঁড়া কাটল অমলবাবু! জেমস খুড়োতো গাড়ীতে ষ্টার্ট দিচ্ছে।

সমর আড়ামোড়া ভেঙে অমলকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, উঠুন অমলবাবু, স্নানটা সেরে আসা যাক। জেমস সাহেব যখন চলেই গেল তখন নিশ্চয়ই রজতটা তেমন সুবিধে করতে পারেনি।

সমর উঠে গেল। দিবাকর উঠে তেল মাখতে সুরু করেছে। অমল উঠি-উঠি করেও যেন উঠতে পারছে না! মাথায় তেল ঘষতে ঘষতে দিবাকর বলে উঠল, ও মশাই, জল্লাদ ব্যাটা যে এইদিকেই আসছে!

জল্লাদটী হল রেল কোম্পানির ওয়াচ্-এ্যান্ড-ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টের সেপাই, করে ট্রেণিং-ক্যাম্পের দারোয়ানী, তার উপরি কাজ হল পিঠঠু প্যারেড করান। এ বিষয়ে সে এমনই কর্তব্যপরায়ণ যে ছেলেরা তার পিতৃদত্ত নামটাকে সংশোধন করে নিয়েছে!

জল্লাদ বাইরে থেকে হাঁকল, অমলবাবু, মিত্তিরবাবু সেলাম দিয়া।

দিবাকর খিঁচিয়ে উঠল, সেলাম কেন বলছ বাবা, বল বাঁশ দিয়া!

মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে অমল ভাবছিল, কি হতে পারে!

শাস্তি যদি কিছু হত তাহলেতো জেমস সাহেব নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাতেন। অফিসঘরের জানলা দিয়ে অমল মুখ বাড়াল, বুকটা তার দুরদুর করছে।

মিত্তির অমলকে দেখেই তেড়ে উঠল, মনে করেছেন কি আপনারা?

অমলের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে, দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

মিত্তির বলল, এরকম ছেলেমানুষি করলেন কেন বলুনতো?

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল মিত্তিরের মুখভাব যাচাই করতে থাকে! তার স্বরে যেন সহানুভূতির ছোঁয়াচ! অমল বলল, ছেলেমানুষি মানে!

হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেলেমানুষি! এখানে ওসব চলে না। এখানে গুণের কদর নেই মশাই! এখানে কদর তাদেরই যারা কুকুরের মত প্রভুভক্ত।

অমল বলল, কিন্তু আমিতো কোন অন্যায় করিনি। রজতবাবুর সংগে খানিকটা বচসা হয়েছে, সেটাতো আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার!

মিত্তির বলল, ব্যক্তি-ফ্যক্তি এখানে কিছু নেই মশাই। এখানে একদল হুকুম করে আর অপর দল মুখ বুজে হুকুম তামিল করে। রজত এখানকার হালচাল সুন্দর বুঝেছে কিন্তু আপনি কিছুই বোঝেননি!

অমল মাথা নীচু করল। তার মুখখানা থমথম করছে।

মিত্তির বলল, যাক, অল্পের ওপর দিয়েই আপনার ফাঁড়া কেটেছে। আপনার সবচেয়ে বড় দোষ কি জানেন? আপনার ওই ডিগ্রী। একে আপনি বাঙালী তায় আবার গ্রাজুয়েট! আপনিতো মশাই মারাত্মক জীব! যাক, শেষ পর্যন্ত আপনাকে কেবল কোম্পানিতে পোষ্ট করেছে।

অমলের চোখ কপালে উঠে গেছে! মুখটা হাঁ হয়ে গেছে! অস্ফুট একটা শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, আমার বিচার হয়ে গেছে!

মিত্তির অমলের কাঁধে হাত রেখে বলল, হ্যাঁ অমলবাবু, এখানকার রীতিই এই। রজত যে ল্যান্স-নায়েক, তার কথার আবার যাচাই কি!

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে অমল সোজা বাড়ীর পথ ধরল।

কোম্পানিতে পোষ্ট হওয়া মানেইতো লড়াইয়ের মাঠে যাওয়া! অমলের মন দমে গেছে। বাড়ীর সকলকে মনে পড়ছে, চেনাজানা সকলেই যেন তার সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে! আরতো এদের সংগে দেখা হবে না!

অন্যমনস্কভাবে অমল এগিয়ে চলেছে। পথে চেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। অমল আঁতকে ওঠে, ত্রস্তে নিজের জামাকাপড় দেখে নিয়ে যেন আশ্বস্ত হয়। ভাগ্যে সে মিলিটারী পোষাকে রাস্তায় বেরোয়নি! তাহলে হয়তো এই ভদ্রলোক তার সঙ্গে কথাই বলতেন না! মিলিটারী পোষাকে দেখলে কি আর তিনি ভাবতেন না যে, সে-ও একটি লম্পট, মাতাল, গুণ্ডা! এইতো দিনকয়েক আগে তার ব্যারাকের জনকয়েক ছেলে সন্ধ্যের অন্ধকারে একটি মেয়ের ঘরে জোর করে ঢুকেছিল। মেয়েটি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। বাইরের লোক জমা হয়ে ছেলেগুলোকে আচ্ছা করে মার লাগায়। এতে নাকি তাঁদের সৈনিকোচিত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়! তারা ক্যাম্পে ফিরে দল পাকিয়ে সেই বস্তি আক্রমণ করে। রীতিমত মারামারি হয়, জনকয়েক জখমও হয়। একথা কি আর কলকাতা সহরে জানাজানি হয়ে যায়নি!

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কি অমল, কি করছ এখন?

অমল বলল, এই রেলের একটা কাজ।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন, তা বেশ, তা বেশ। যা হোক্ একটা কাজে লেগে পড়া ভাল। আর আমার ছেলেটা এতদিন বসে বসে আড্ডা দিয়ে এখন গিয়ে ঢুকেছে মিলিটারীতে! ছি ছি, কি কাণ্ড বলতে! লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না! তাছাড়া সে কি আর বেঁচে ফিরবে! যদি একান্তই বাঁচে, তখন কি আর ভদ্র সমাজের যোগ্য থাকবে! কি করব বাবা, যার যেমন কপাল—ভদ্রলোকের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। অমলের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, মানুষ হও বাবা, বাপের মুখ উজ্জ্বল কর।

অমলের ইচ্ছে করে ছুটে পালিয়ে যেতে। ঢোঁক গিলে, ফ্যাকাশে মুখে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে সে হনহন করে হাঁটতে থাকে।

বাড়ী পেঁছে কড়া নাড়তে, রিণি দরজা খুলে দিল। অমলকে দেখে কয়েকটা পলকের জন্য রিণি স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর দৌড়ে খানিকটা ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ও বাবা, মেজদা এসেছে— মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, ছুটে এসে অমলকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে।

অমল রিণিকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, কিরে, ভেবেছিলি বুঝি মেজদা মরেই গেছে।

রিণি চোখ মুছে বলল, ধ্যেৎ—

তবে যে কেঁদে ফেললি?

কেঁদেছি বুঝি! অমলের হাতটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রিণি ঘরের দিকে চলতে থাকে।

রিণির হাঁকডাকে সকলেই উঠে এসেছেন। ঠাকুমা বললেন, কই, দাদার আমার ধড়াচুড়ো কই? এযে দেখছি ভদ্দরলোকের পোষাক!

কেন, মিলিটারী পোযাকে বুঝি ভদ্দরলোকের মত দেখায় না?

ও বাবা, গোরাপল্টনের নামে আমরা মুচ্ছা যেতাম!

অমল বুঝল, মিলিটারী সম্বন্ধে ধারণা, তার বাবা, ঠাকুমা, পিতৃবন্ধু আর মিনি সকলেরই এক! বোধহয় তার নিজেরও ওই একই ধারণা! সৈনিকের স্বপক্ষে বলার মত প্রবৃত্তি তারও মনে জাগে না।

ননীগোপালবাবু বললেন, তা এখন বাড়ী এলি যে! আজ ছুটী নাকি?

না, আজ ছুটী নিয়েছি, কালকে কোম্পানিতে বদলি হচ্ছি কিনা!

এইতো কদিন মাত্র ভর্তি হলি, এরই মধ্যে বদলি করছে যে?

কাজ শিখে নিয়েছি কিনা, তাই বোধহয় কোম্পানিতে পাঠাচ্ছে।

ননীগোপালবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, বোধহয় মানে কি? তোকে বদলি করছে, আর তুই জানবি না, বদলি করার কারণটা কি!

ক্ষণেকের জন্য অমল দমে গেল। মনে পড়ল তার এই কদিনের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা আর আজকের ব্যাপার! এই রূঢ় সত্যকে আর যেন সে চেপে রাখতে পারে না, বলল, মিলিটারীতে কাজ চলে হুকুমের ওপর। কারণ তারা জানায় না।

তাহলে মাইনেও নিশ্চয়ই বাড়বে?

তার কোন ঠিক নেই।

রান্নাঘর থেকে ঠাকুমা ননীগোপালবাবুকে ডাকলেন। যাওয়ার জন্য উঠে ননীগোপালবাবু বললেন, কিছুইতো দেখছি তুমি জান না! তুমি কি তবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছ নাকি!

মিনি চা নিয়ে এল, রিণি এসে অমলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চায়ে চুমুক দিয়ে অমল রিণিকে বলল, অমন চোখ পাকিয়ে কি দেখছিসরে?

রিণি চাপা গলায় যথাসম্ভব অমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আচ্ছা মেজদা, মিলিটারীতে ঢুকলে মানুষ নাকি খারাপ হয়ে যায়?

কে বলল?

আমরা শুনেছি। বলনা?

অমল ভাবছিল, কি কৈফিয়ৎ সে দেবে! আজতো আর সে আলাদা একটা মানুষ নয়, আজ সে সমস্ত সৈনিকের প্রতিনিধি! কৈফিয়ৎ তাকে একটা দিতেই হবে। জিজ্ঞেস করল, কি রকম খারাপ শুনি।

রিণি মিনিকে ঠেলা দিয়ে বলল, তুই বল দিদি।

মিনি চোখ নামিয়ে বলল, তারা সকলেই নাকি মদ খায়?

অমল মিনির গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেলল, দূর বোকা! সকলে মদ খেতে যাবে কেন? যাদের ইচ্ছে হয় খায়, আবার আমার মত আরও অনেকে আছে, যারা মদ খায় না।

রিণি হাততালি দিয়ে নেচে উঠল, দেখলিতো, আমি বলেছিলুম।

মিনি বলল, আমিওতো বলেছিলুম!'

পাশের ঘর থেকে ঠাকুমা ডাকলেন, অরে অ অমি, বলি শোননা এদিকে, তোর মিলিটারীর গল্প শুনি। অমল এলে বললেন, হ্যাঁরা, তোদের খেতে দেয় কেমনরে?

ক্ষণেকের জন্য অমল ইতস্তত করে, তারপর বলে যায়, খাওয়া? অঢেল! রোজ মাংস, তরিতরকারি প্রচুর, সকাল-বিকেল জলখাবার!'

ঠাকুমা বললেন, কিন্তু তোর শরীরতো খারাপ হয়ে গেছে!

ভীষণ খাটুনি কিনা!

ঠাকুমা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, কি কি খাবি বল? তোর বাপ বাজারে গেছে মাছ আনতে।

অমল বলল, জিনিষ অঢেল হলে কি হবে, রাঁধতে কি আর তারা জানে! তুমি যা রেঁধে দেবে, তাই ভাল লাগবে ঠাকুমা।

মার্চেণ্ট অফিসের কেরাণী বিমল বাড়ী ফিরল সন্ধ্যে উৎরে। এরকম সন্ধ্যে তার প্রায়ই হয়। সে বাড়ীতে ফিরলেই মিনি রিণির মুখ যায়

শুকিয়ে। একে তার মাইনে কম, তায় আবার খাটুনি বেশী! কাজেই তার মেজাজটা খিট্‌খিটে। অমলকে জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ এলিরে?

অমল বলল, তা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক হল।

আজ থাকবি, না আবার চলে যাবি?

নাঃ, খেয়েদেয়েই চলে যাব।

বিমল জামাকাপড় ছাড়তে চলে গেল। অমল উঠে এসে বসল রান্নাঘরের দাওয়ায়। তার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে! সকলেরই ব্যবহারের মধ্যে কেমন যেন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব! কোথা দিয়ে কেমন ভাবে যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে!

জামাকাপড় ছেড়ে, লুঙ্গি পরে বিমল অমলের কাছে এসে বসল। জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে তোর মাইনে কত তারিখে দেয়?

শুনেছিতো তিন-চার তারিখ।

তাহলে টাকাটা বাড়ী পাঠাবার কি ব্যবস্থা করবি?

নিজেই এসে দিয়ে যাব, এখনতো কাছাকাছি রয়েছি। আর যদি একান্তই না আসতে পারি, তাহলে মণি-অর্ডার করে দেব।

না না, মণি-অর্ডার করতে হবে না। আমি না হয় নিজেই গিয়ে—

বিমলকে কথা শেষ করতে না দিয়েই অমল বলল, না না, তোমার যেতে হবে না। হয়তো আমার সঙ্গে দেখাই করতে দেবে না!

দেখা করতে দেবেনা মানে? আব্দার নাকি! সোলজার হয়েছিস বলেতো আর স্লেভ হয়ে যাসনি?

অমল চমকে উঠল, সোলজার আর স্লেভ! এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য থাকা উচিত, তা কি আছে তাদের মধ্যে!

বিমল আবার জিজ্ঞেস করল, তোদেরতো ওভারসীজ যেতে হবে?

তাতো হবেই।

তাহলে এইবেলা একটা ইন্সিওর করে ফ্যাল।

ইন্সিওর! আমি করব! তার কি দরকার পড়ছে?

বিমল গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বারকয়েক কেশে বলল, ভেবেছিলুম, কথাটা তুমি বুঝবে। তোমার ওপরই ছিল আমাদের ভরসা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তুমি যখন মিলিটারীতে ঢুকেছ

তখনতো আর ভরসা করা যায় না। এখন যদি তোমার একটা ভাল-মন্দ কিছু হয় তাহলেতো সংসারটা যাবে ভেসে! ইন্সিওর একটা করা থাকলে তবুও দুটোদিন যোঝা যাবে!

এ কথার পর বিমল উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেল। অমল একা বাইরে বসে আছে। অনেক কথাই সে এতদিন ভেবেছে। মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার আগে থেকে আজকের দুর্দৈব পর্যন্ত! কিন্তু মৃত্যু যে তার এত কাছে একথাতো কোনদিন মনে হয় নি!

ঠাকুমাকে তাড়া দিয়ে অমল খেতে বসল। আর যেন সে পারছে না এই বাড়ীর মধ্যে থাকতে! অমলের খাওয়ার মাঝামাঝি কমল ছেলে পড়িয়ে ফিরে এল। জুতো খুলেই খাওয়ার জায়গায় এসে অমলকে বলল, তুমি কিন্তু ভীষণ ভুল করেছ মেজদা! অনায়াসে কিংস-কমিশন পেতে পারতে।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, সেটা অবার কি?

কমল বলল, মিলিটারী-চাকরী, তবে অফিসার হয়ে। স্টার্টিংই হত সাড়ে তিনশ! আমিতো ভাবছি, ঢুকে পড়ব!

হাতের ভাত অমলের হাতেই রয়ে গেল। চমকে উঠে সে কমলের দিকে চাইল। তার ইচ্ছে হল প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে, না না কমল মিলিটারীর মধ্যে তুই কিছুতেই ঢুকিসনি! আমার মতন করে তুই নিজেকে বিকিয়ে দিসনি! শুধু দুমুঠো ভাতের জন্য তুই শ্লেভ হতে যাসনি!

কিন্তু গলা দিয়ে তার একটি কথাও বেরিয়ে এল না। কেবল আতঙ্কিত দৃষ্টিতে সে কমলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল!

তিন

সুটকেশ সাজিয়ে অমল আবার তার অভিযানের জন্য তৈরী হল। মুভমেন্ট-অর্ডারটা আর একবার দেখে নিয়ে সযত্নে পকেটের মধ্যে রাখল। ব্যারাকটার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত আরও একবার চেয়ে চেয়ে দেখল। তার মনে হল, সৈনিকের জীবনটাই বুঝিবা যাযাবরের জীবন!

ব্যারাক থেকে বেরিয়ে মাঠে নামতেই দেখল, একটা দল ডবলমার্চ

করে মাঠটা প্রদক্ষিণ করছে। অমল চোখ কুঁচকে দেখল, দিবাকর তার মধ্যে আছে কিনা। বারবার তার দিবাকরের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আর কি কোনদিন দিবাকরের সঙ্গে দেখা হবে! সত্যিই এই ট্রেনিং সেন্টারটা একটা সরাইখানা! মনটা তার হাঁপিয়ে ওঠে। ক্যাম্পের ওই কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে যেন তার দম আটকে আসছে। জোর কদমে সে গেটের দিকে এগিয়ে চলল। একটি ছেলে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল, বারেক থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি দাদা চললেন? কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সেকথা জানার জন্য সে অপেক্ষাও করল না! বোধহয় তারা সকলেই জানে এই ট্রেনিং-সেন্টার থেকে মানুষগুলো কোথায় যায়!

চলেছে এগিয়ে গেটের দিকে, গতি তার মন্থর হয়ে গেছে। গেটের কাছাকাছি সড়কের দুইপাশে গুটীকয়েক ছেলে ইট বসাচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, চললেনতো দাদা স্লটার-হাউসে?

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার ইচ্ছে হল, ছেলেটীর কাছে কৈফিয়ৎ চায়, কেন সে কোম্পানিকে স্লটার-হাউস বলল! কিন্তু উপায় নেই। তাদের সামনে এক ল্যান্স-নায়েক ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে।

ক্যাম্প এলেকার বাইরে এসে সুটকেশটা নামিয়ে অমল রেললাইনের ওপর বসল। তার মনের মধ্যে ওই একটা কথা বারবার ঘোরাফেরা করছে। স্লটার-হাউস! এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে একটি দৃশ্য তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। একটি লোক একপাল ছাগল-ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পরদিন সকালে সেগুলোকে কেটে, ছাড়িয়ে, 'ফার্ষ্ট-ক্লাশ' ছাপ মেরে ঝুলিয়ে রাখবে মাংসের দোকানে। মাংসাশী মানুষের দল ভীড় করে দাঁড়াবে সেগুলোকে ঘিরে। অকস্মাৎ তার মনটা সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর শিরশির করতে থাকে। সত্যিইতো স্লটার-হাউস! যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া মানেইতো মৃত্যু!

মনে পড়ে প্রথমদিনে সেই প্রহরীর সাবধান-বাণী, 'এখনো পালিয়ে বাঁচতে পারেন!' কিন্তু কোথায়! পালানর কথা ভাবতে ভাবতে অমল আবার চলতে লাগল। কিছু দূরেই দেখা গেল রেল-কোম্পানির মাঠ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে সার-সার তাঁবু, দূর থেকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। দেখতে দেখতে অমল গেটের দিকে

এগোচ্ছিল। মাঠের মধ্যে চলেছে প্যারেড, ছোট ছোট অনেকগুলো দল একই তালে পা ফেলে, হাত দুলিয়ে, একই সঙ্গে ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে যাচ্ছে আসছে! সকলেরই পরণে মিলিটারী পোষাক, খাকি প্যান্ট, সার্ট, মাথায় শোলার হ্যাট—একেবারে পাকা পল্টন!

হলট্—হু কামস্ দেয়ার—

অমল আঁতকে পেছনে সরে যেতে গিয়ে প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি! বুকের ভেতরটা তার ধড়াস-ধড়াস করছে! তার বুকের ওপর সঙিগন উঁচনো! রাইফেলধারী লোকটি তার বুকের মধ্যে সঙিগনটাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য একেবারে তৈরী!

সেন্ট্রী হুঙকার দিল, বোলো, কোন হ্যায়?

গেটের পাশ থেকে একজন নায়েক বেরিয়ে এল। সেন্ট্রীর উদ্যত রাই ফেলটা এক ঝট্‌কায় নামিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, খুব বাহাদুরী হয়েছে দিনদুপুরে হু কামস্ দেয়ার! কেন, চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?

সেন্ট্রী জিভকেটে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, এই যাঃ, আমি এক্কে-বারে ভুলে গেছি!

নায়েক সাহেব খিঁচিয়ে উঠল, তা যাবেনা, তা না হলে আমার পাছায় বাঁশটা যাবে কি করে! তোমার এই কীর্তি যদি কোন অফিসারের চোখে পড়ত, তাহলে এতক্ষণে এই ফিতেদুটো খুলে রাইফেলটি ঘাড়ে নিয়ে তোমার মত দারোয়ানী করতে হত।

সেন্ট্রী মরমে মরে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। নায়েক সাহেব অমলের সামনে এসে বলল, আপনার কি দরকার মশাই এখানে?

অমল বলল, আমি এই কোম্পানিতে পোষ্টেড হয়েছি—মুভমেন্ট অর্ডারটা তার হাতে দিল।

মুভমেন্ট-অর্ডার দেখে নিয়ে নায়েক সাহেব বলল, আসুন আমার সঙ্গে।

গেটের মধ্যে ঢুকে কয়েকটা তাঁবু পাশ কাটিয়ে একটা তাঁবুর সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। নায়েক সাহেব অমলকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতর চলে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এসে বলল, আসুন, জমাদার সাহেব ডাকছেন।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকতেই জমাদার সাহেব খেঁকিয়ে উঠলেন, সুটকেশটা বাইরে রেখে এস। তোমার ওই মহামূল্য রত্ন কেউ চুরি করবে না।

অমলের সমস্ত শরীরে যেন বিষ ছড়িয়ে দিল। সুটকেশটা বাইরে রেখে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। জমাদার সাহেব হাতছানি দিয়ে তাকে কাছে ডাকলেন। টেবিলের সামনে গিয়ে অমল হাত তুলে নমস্কার করল।

জমাদার সাহেব তাড়া দিয়ে উঠলেন, ওসব সিভিলিয়ানী কায়দা এখানে চলে না, বুঝলে? বারকয়েক অমলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, তা বাবুর চেহারাটীতো দেখছি বেশ নাড়ুগোপালের মত! আর সাজপোষাকটীও একেবারে লক্কাপায়রা-মার্কা! কিন্তু ওসবতো এখানে কোন কাজে লাগবে না।

বিস্ফাবিত চোখে অমল জমাদার সাহেবকে দেখতে থাকে!

জমাদার সাহেব অমলের চোখের উপব চোখ রেখে বললেন, বিষ হলে একটু-আধটু আছে দেখছি! আচ্ছা, বিষদাঁত ভাঙার বন্দোবস্তও এখানে আছে। তোমার ওই কাকেববাসাব মত চুলে আজই কদমছাঁট দিতে হবে, বুঝলে?

অমলের পাশে দাঁড়িয়ে নায়েক সাহেব হাসি চাপবার চেষ্টা করছিল। অমল বারান্তরে জমাদার সাহেব আর নায়েক সাহেবের মুখের দিকে ফিরে ফিরে চাইছিল। এটা রসিকতা না অন্য কিছু!

জমাদার সাহেব বললেন, চাটুয্যে, তোমার ওপর ভার রইল, এর চুল যেন আজই কাটা হয়।

নায়েক চাটুয্যে বলল, আমি যে স্যার আজ গার্ড-কমান্ডার।

কুছ পরোয়া নেই, অর্ডারলি এন-সি-ও'কে বলে দেবে এটা আমার হুকুম। আর একে অর্ডারলি এন-সি-ও'র কাছে হ্যান্ডওভার করে দাও।

অর্ডারলি এন-সি-ও'র কাছে অমলকে হ্যান্ডওভার করে দিয়ে নায়েক চাটুয্যে বলল, তুমি যেন আবার এঁর ওপর দরদ দেখাতে যেও না। কেন স্ট্রাইপটা ঘোচাবে! জানইতো এখানকার হালচাল!

ল্যান্স-নায়েক দত্ত অমলকে বলল, চলুন, একে একে কাজগুলো সেরে ফেলা যাক—চলতে চলতে অমলের বিমর্ষ মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ঘাবড়ে গেছেন বোধহয়?

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে অমল বলল, না না, ঘাবড়াবার কি আছে!

আছে বৈকি। যেখানে মানুষ নিয়ে কারবার অথচ মনুষ্যত্বের নাম-গন্ধও নেই সেখানে যে কোন মানুষ নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল ল্যান্স-নায়েক দত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ভাবে, এওতো একজন ল্যান্স-নায়েক, তবে!

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলল, জমাদার দাসগুপ্তটা একটি অপূর্ব চীজ! লোকটার মন এত নোঙরা যে আমারতো সন্দেহ হয় ও কোনদিন কোন ভদ্রপরিবারে মানুষ হয়েছে কিনা!

অমল তখনও নিজেকে সামলাচ্ছে, ভাবপ্রবণ হওয়ার জায়গা এটা নয়! নিছক ভদ্রতার খাতিরে বলল, এতটা রূঢ় হবেন না।

ল্যান্স-নায়েক দত্ত হেসে বলল, ঠিকই বলেছেন। এতটা রূঢ় বোধহয় হওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রতি পদে পদে রূঢ় ব্যবহার সহ্য করে আর রূঢ় ব্যবহার করার শিক্ষা পেয়ে মনটা সত্যিই অনেক রূঢ় হয়ে গেছে।

কোম্পানি-অফিসে নামধাম লেখান হল। কীটস নেওয়া শেষ হলে ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলল, চলুন, আপনার সীটটা দেখিয়ে দিই—

লম্বা লম্বা সারিতে তাঁবু খাটান। তারই একটার সামনে দাঁড়িয়ে ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলল, উপস্থিত আপনি এই তাঁবুতে থাকুন, অন্য তাঁবুগুলো সবই ভর্তি।

একশআশি পাউন্ড তাঁবু। তার মধ্যে লম্বালম্বি দুলাইনে আটখানি খাটিয়া। ছ'টা সীটে বিছানা ড্রেসিং করা রয়েছে, কায়দাটা সেই ট্রেণিং-ক্যাম্পের ছকেই। একটা খালি খাটিয়ার ওপর কীটসের বোঁচকাটা নামিয়ে রেখে অমল বলল, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলল, জেনে বিশেষ লাভ নেই, দুদিন পরেই আবার ভুলে যাবেন। ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলেইতো আমাকে ডাকতে হবে। নাম ধরে ডেকে বন্ধুত্ব করা এখানে চলবে না!

অমল বলল, তাহলে এখন আমাকে কি করতে হবে?

আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না। এই আমাদের দিয়ে আপনাদের ঘাড়ে ধরে সবকিছু করিয়ে নেবে। সেইজন্যইতো এই ফিতেটা দিয়ে দুটি টাকা বেশী দেয়—ডানহাতের ফিতেটাকে দেখিয়ে বলল, আর এই-

টিকে বজায় রাখবার জন্য আমাকে দেখাতে হবে যে আমি খুব সুখে আছি! আর করতে হবে আপনাদের সঙ্গে কুকুর বেড়ালের মত ব্যবহার!

অমল বলল, তবে ওই ল্যান্স-নায়েকগিরি ছেড়ে দিলেইতো পারেন?

ওরে বাবা, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! কুকুরের মত এদের পায়ের তলায় পড়ে ল্যাজ নাড়ুন, আপনার দুশ খাতির! কিন্তু মানুষের মত মাথা উঁচু করার চেষ্টা যদি করেছেন অমনি বাঘের মত ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—উত্তেজনায় ল্যান্স-নায়েক দত্ত পায়চারী করতে থাকে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কি একটা বলতে গিয়ে সে থমকে গেল। একটী ছেলেকে ওইদিকে আসতে দেখে গলাটা নামিয়ে বলল, আমার আবার এসব কথা আপনাদের সঙ্গে কইতে নেই। যাক, একটু সাবধান হয়ে কথাবার্তা কইবেন। জমাদার সাহেবের চরেরা কিন্তু তাঁবুর মধ্যে টিকটিকির মত ওৎ পেতে থাকে!

অমল কম্বলে বাঁধা বোঁচকাটা খুলে বসল। কম্বল দুখানা ভাঁজ করে পাশে রাখল। মশারীটা মাথায় প্রায় ওরই সমান উঁচু। এইরকম ঢালু তাঁবুর মধ্যে টাঙাবে কি করে! আবার ভাবল, অন্য ছেলেরা যা করবে সে-ও তাই করবে। বুটজোড়া তুলে ধরে সে হেসে ফেলল, দুটোর ওজন বোধহয় পাঁচসের! তার ওপর আবার বলে দিয়েছে, তলায় কাঁটা বসাতে। ওঃ সে কি বিশ্রী শব্দ হবে! ঠিক যেন পাহারাওয়ালাদের মত। গরম মোজা, গরম হোসটপ, গরম পট্টি—এই দারুণ রোদ্দুরেও পায় জড়িয়ে রাখতে হবে! কিন্তু এইতো, ল্যান্স-নায়েক দত্তইতো কেমন সহজভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে!

খাকি সেলুলার সার্টদুটো তাকে বেশ ফিট করেছে। কিন্তু প্যাণ্টদুটো যে অদ্ভুত! না ফুল, না হাফ! ষ্টোরের অর্ডারলিটী বেশ বলেছে, দেড়তলা প্যাণ্ট! এ প্যাণ্ট নাকি মরুভূমি এলাকার সৈনিকদের জন্য। কিন্তু ষ্টোর-হাবিলদার যে বলল, কেটে হাফ-প্যাণ্ট বানিয়ে নিতে। তবে কি তারা ওভারসীজ যাচ্ছে না! গেঞ্জিদুটো পঁয়তাল্লিশ নম্বর! পরলেতো হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যাবে! অমলের হাসি পেল, ঠিক যেন মেয়েদের সেমিজ!

প্যারেড ভাঙার সংগে সংগে ছেলেরা তাঁবুতে ফিরল। অমলদের তাঁবুর ছ'জনের মধ্যে পাঁচজন যুবক আর একজন প্রৌঢ়। প্রৌঢ় আর চারজন তখনই মগ আর প্লেট নিয়ে ছুটল। অবশিষ্ট ছেলেটি, রসিদ, অমলকে বলল, আজ এলেন বুঝি?

অমল বলল, হ্যাঁ।

রসিদ মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে প্যাণ্টের ভেতর থেকে সার্টটা টেনে টেনে বার করতে লাগল। অমল রসিদের হাফ-প্যাণ্টটার দিকে নজর করে দেখে বলল, আপনার প্যাণ্টটাতো দেখছি বেশ ফিট করেছে।

ফিট কি আর সাধে করেছে! এক একটী প্যাণ্টের পেছনে লেগেছে দেড়টী টাকা।

কিন্তু এই গেঞ্জিগুলোও কি ফিট করাতে হবে?

কি দরকার পড়ছে! ওগুলোতো আর প্যারেড-ইন্সপেকশনের সময় দেখা যাবে না—একটু থেমে আবাব বলল, তাছাড়া ওগুলো বড় হওয়ায ভারী একটা সুবিধে হয়েছে। এই দেখুন না—প্যাণ্টটা একেবারে খুলে ফেলে বলল, ইচ্ছে করলে শুধু এই গেঞ্জিটা পরে সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে আসতে পারেন!

অমল হেসে উঠল, তা যা বলেছেন।

রসিদ খাটিয়ার ওপর বসে বুট মোজা খুলে পট্টিটা পাকাতে পাকাতে বলল, আপনি খেয়েছেন?

না।

তাহলে আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি চট করে গোসল সেরে আসছি। আর এখন গিয়েই বা লাভ কি, অন্তত আধঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—তাঁবুর পর্দাটা সরিয়ে সে ইনার-ফ্লাপের মধ্যে থেকে বার করল লুঙ্গি, গামছা আর তেলের শিশি। অবাক হয়ে অমল রসিদের কার্যকলাপ দেখছিল!

রসিদ বলল, কি করি বলুন, শালাদের সাফাইয়ের যা বহর! এসব জিনিস বাইরে রাখার উপায় নেই, তাহলেই টেনে নিয়ে যাবে, আর ফেবৎ চাইতে গেলেই চার্জ-সীট!

স্নান সেরে ফিরে রসিদ অমলকে বলল, ওসব এখন তুলে রাখুন, আমি সব ঠিক করে দেবখন।

খাঁওয়ার জায়গায় গিয়ে অমল দেখল সে আর রসিদ একই লাইনে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করল, এখানে বুঝি একটা লঙ্গর?

রসিদ বলল, দুটো আর করবে কেমন করে! লাঙ্গরীতো মোটে ছ'টা।

অমল যখন প্লেট পাতল তখন সে একটু আশ্চর্যই হয়েছিল। দেখল লান্স-নায়েক দত্ত আর একটী ছেলে পরিবেশন করছে! অমলের প্লেটে তরকারি দিয়ে ল্যান্স-নায়ক দত্ত রসিদকে বলল, এই ভদ্দরলোককে একটু দেখ রসিদ, উনি আজ নতুন এসেছেন।

খাওয়া সেরে অমল আর রসিদ তাঁবুতে ফিরে দেখে তাঁবুর দরজা ফেলা। রসিদ বলল, সুরু হয়ে গেছে। অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফিরে চাইল। রসিদ বলল, খাওয়ার পর ছোটকল্কে চলেছে!

ধোঁয়ায় ভর্তি তাঁবুটার মধ্যে ঢুকতেই দুর্গন্ধে অমলের গা-বমি করে উঠল। পাঁচজনে দুখানা খাটিয়ার ওপর মুখোমুখি বসেছে। প্রৌঢ় লোকটী তখন টান দিচ্ছেন আর বাকী ছেলেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই বিপুল টানের দিকে চেয়ে আছে! টান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়ের দেহটা সোজা হয়ে উঠছে। অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। একেবারে তার চোখের ওপর বসে গাঁজা খেতে সে আর কখনও দেখেনি!

কাতরস্বরে একজন বলে উঠল, আর না দাদা কল্কেটা যে ফেটে যাবে।

বোধহয় শিষ্যের কাতর প্রার্থনায় দাদার মন দ্রব হয়েছিল! টান চরমে ওঠার আগেই থেমে গিয়ে কল্কেটা সেই ছেলেটীর হাতে দিয়ে বললেন, নেঃ তোর কথায় এবারকার মত ছেড়ে দিলুম—

অমলের দিকে নজর পড়তে বললেন, কি ভাই চলে-টলে নাকি?

অমল কুঁচকে গিয়ে বলল, আজ্ঞে না।

কি জানি ভাই! নতুন এসেছ, জিজ্ঞেস করা আমার কর্তব্য। এটা না চলে অন্যরকম যদি চলেতো বল ভাই, সবরকম ব্যবস্থাই আমার কাছে আছে।

রসিদ প্রৌঢ়কে বলল, এবার দাদা দরজাটা তুলে দিই?

দে-না ভাই, তোদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না?

রসিদ তাঁবুর দরজা তুলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। অমলকে জিজ্ঞেস করল আপনার ক্যাটাগরী কি?

গার্ড।

আমি মনে করেছিলাম লোকো।

কেন!

ট্রাফিকের লোকেরা সব ভদ্দরমানুষ, আমাদের সঙ্গে মেশেই না।

উল্টো সারি থেকে নাকডাকার শব্দ শোনা গেল। রসিদ বলল, এখন এগুলো মড়ার মত ঘুমোবে। ক্লাসের হুইসিল পড়লে আবার ওদের ডেকে নিয়ে যেতে হবে। ঘুম কি আর ওদের সহজে ভাঙবে!

অমলের কেমন যেন আশ্চর্য ঠেকছিল। রসিদতো গাঁজা খায়না! কিন্তু গাঁজাখোর ওই লোকগুলোর ওপব তার কত দবদ! রসিদ আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কতদিন ভর্তি হয়েছেন?

অমল বলল, এইতো, বড়জোর দিন দশ-বার।

আর আমি, তিনটী মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল। কত ঝামেলা যে আমার ওপর দিয়ে গেল।

কি রকম?

তাহলে শুনুন সেই পযলা থেকে। আমার ভর্তি হওয়ার দিন পনের আগে একদল মানুষ আমাদের গ্রামে গিয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে হাতচিঠি বিলাতে সুরু করে। বেলের কাজে লোক নেবে। খাওয়া-পরা যাবতীয় খরচা গবরমেণ্ট দেবে, এর ওপর আবার মোটা মোটা মাইনে। কাজ জানাব দরকার নেই, গবরমেণ্টই শিখিয়ে নেবে।

একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বিছানার ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে রসিদ বলে চলল, আমাদের হাল তখন বেজায় খারাপ। আমাদের পাঁচবিঘে জমির একটা মৌজা তখন মহাজন পাঁচু শা'র কাছে বন্ধক পড়েছে। সুদের প্রথম কিস্তি আমরা দিতে পারিনি। আমার বাপ ঠিক করেছিল নতুন ধান উঠলে সুদে আসলে সবই শুধে দেবে। ফসল কাটতে গিয়ে লাগল হাঙ্গামা। পাঁচু শা তার লোক-লস্কর দিয়ে জমি ঘিরে রাখল, বলল টাকা আগে না দিলে ফসল কাটতে দেবে না। বাপ অনেক মিনতি করল, কিন্তু শোনে কে! বাড়ী ফিরে বাপ মতলব করল,

রাতারাতি ফসল কেটে ঘরে তুলবে। সারারাত ধরে ফসল কেটে ঘরে তুললাম। ফজরে পাঁচুশা'র লোকজন এসে বাড়ী ঘেরাও করল। তারা শাসাচ্ছে, হয় তারা সমস্ত ধান নিয়ে যাবে নয়তো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। বাপ আমার বাঘের বাচ্চা। বাপ লাঠি ধরল, আমার হাতেও লাঠি দিল, বলল, 'জান দেব—তবু ধান দেবনা।' আমার মা আর বোনেরা বঁটি, ঝাঁটা নিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল। আমার লাঠিতে একজন জখম হল।

রসিদের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। বিড়িতে জোর দুটো টান দিয়ে আবার বলতে সুরু করল, এই না দেখে বাপ ওই ঢেঁড়াওয়ালাদের একটা হাতচিঠি আমার হাতে দিয়ে বলল, পুলিশ আসার আগেই সদরে চলে যা, আর নাম ভাঁড়িয়ে মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে যা। আমিও ভর্তি হলাম। ওরা বলল, আমার মাইনে ত্রিশটাকা। সদর থেকে পাঠিয়ে দিল কলকাতার ট্রেণিং-ক্যাম্পে। কাজ শিখলাম মাসখানেক, তারপর এলাম এখানে। ট্রেণিং-ক্যাম্পে বলে দিল, কোম্পানিতে সব মাইনে পাবে। আর কোম্পানিতে বলল, ট্রেণিং-ক্যাম্পের মাইনের কথা আমরা কিছু জানি না, মাস শেষ হলে এখানকার মাইনে পাবে। আমার হাতে একটা পয়সা নেই, কারও কাছে কর্জ করতে পাবি না! সে প্রায় একটা মাস আমার কি কষ্টে কেটেছে, তা আর কি বলব! মাসকাবারে মাইনে নিতে গেলাম, দিলে পনেরটাকা! লুইস সাহেব মাইনে দিচ্ছিল, টাকাগুলো টেবিলের উপর রেখে বললাম, আমি কি তোমার ঘরের চাকর, পনেরটাকা মাইনে দিচ্ছ? তিরিশটাকা হিসাবে দু'মাসে ষাটটাকার একআধলা কম নেব না। লুইস সাহেবতো আমার কথা বুঝল না, সুবেদার সাহেব আমার কথা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল। সেই কথা না শুনে লুইস সাহেব চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম, ওসব সাহেব-টাহেব ডবাই না। সুবেদার সাহেব খপ করে আমাকে ধরে ফেলল। আমি সুবেদার সাহেবকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের কাছে এমন চাকরি আমি করব না।

রসিদ বিছানার ওপর উঠে বসল। তার শরীরটা যেন কেঁপে উঠেছে, চোখদুটো লাল টকটক্ করছে! নিভে যাওয়া বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, হায় খোদা, কোথায় কি! কোয়ার্টার-গার্ড থেকে দুজন

সেণ্ট্রী এসে আমার দুটোহাত চেপে ধরল আর পেছন থেকে গার্ড-কমাণ্ডার আমাকে গলাধাক্কা দিতে দিতে কোয়ার্টার-গার্ডে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। এমন জুলুমের রাজত্বে কি আর আমি করব, বসে বসে কাঁদতে লাগলাম। সবই আমার নসিবের ফের! খানিক পরে এল জমাদার সাহেব। কোন কথা না বলে দমাদম কিল ঘুঁষি মারতে লাগল! আমি কি করব বলুন, পিছমোড়া করে আমার দুইহাতে হাতকড়া লাগিয়ে রেখেছে! এরপর এল মেজর সাহেব। সেটা করল কি, আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমার পেটে মারল একটা ঘুঁষি! দম্ বন্ধ হয়ে আমি মাটীতে পড়ে গেলাম। মেজর সাহেব বুট দিয়ে আমাকে একটা লাথি লাগিয়ে চলে গেল।

অমলের দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। সমস্ত শরীরটার মধ্যে দিয়ে শিরশির করে একটা কাঁপুনি খেলে চলেছে। রসিদের মুখখানা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, কেবল শুনতে পাচ্ছে, রসিদ তারপরও বলে চলেছে, এত করেও শালারা সন্তুষ্ট হল না। পরদিন আমার সালিশ বসল। আমি নাকি লুইস সাহেবকে মারতে গেছি। সরমের কথা আর বলব কি, আমাদের দেশী মানুষ ওই সুবেদার সাহেব আমার খেলাফ সাক্ষী দিল। আমাব আঠাশদিন কয়েদ হল।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রসিদ চুপ করল। চোখদুটো তার জলে ভরে উঠেছে। বুজে-আসা গলায় রসিদ বলল, তারপর থেকে জমাদার সাহেবের ওই টিক্‌টিকিগুলো সারাক্ষণ আমার পেছনে লেগে রয়েছে। যেন আমি একটা দাগী আসামী!

ক্লাসের হুইসিল পড়াব সংগে সংগে রসিদ আর অন্য সকলে চলে গেছে। তারপব অমল একটু ঘুমোবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ঘুম তার আসেনি। ভয়ে সে কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছে।

কি অমলবাবু ঘুমোচ্ছেন নাকি? ল্যান্স-নায়েক দত্ত তাঁবুতে ঢুকল।

ধড়মড় করে উঠে বসে অমল বলল, না, একটু শুয়েছিলুম। আসুন!

ল্যান্স-নায়েক দত্ত অমলের পাশে বসে বলল, আমি কিন্তু গল্প করতে আসিনি। এসেছি কর্তব্য পালন করতে। ষ্ট্যাডিং অর্ডার শোনাতে।

অমল তার মুখের দিকে চাইল, ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলতে সুরু করল,'আজ থেকে আপনার রীতিমত সৈনিকজীবন সুরু হল। ট্রেণিং-ক্যাম্পতো মশাই শ্বশুরবাড়ী! এখন থেকে আপনার চলাফেরা, ওঠা-বসা, সব কিছুই এই ষ্ট্যাডিং অর্ডার মোতাবিক্ করতে হবে।

এখানকার প্রোগ্রাম হল, সকাল পাঁচটায় রিভেলী অর্থাৎ ঘুম থেকে ওঠা। এরপর পাবেন একঘন্টা সময়; তার মধ্যে পায়খানা, মুখ ধোয়া, চা খাওয়া, বিছানা-ড্রেসিং সেরে পি-টি'র জন্য তৈরী হয়ে নিতে হবে। ছ'টা থেকে সাতটা পি-টি। তারপর আধঘন্টা ব্রেক-অফফ, তার মধ্যে আপনাকে ইউনিফর্ম পরে নিতে হবে। সাড়েসাতটা থেকে এগারটা প্যারেড। তারপর খানা আর রেষ্ট। ফের একটা থেকে সাড়েতিনটে টেকনিক্যাল-ক্লাস। সাড়েতিনটে থেকে চারটে টিফিন অর্থাৎ আপনি পাবেন এক কাপ চা। চারটে থেকে পাঁচটা গেমস। সাতটায় রাতের খাওয়া, ন'টায় রোল-কল। দশটা-পনের মিনিটে লাইট-আউট অর্থাৎ আলো নিভিয়ে আপনাকে শুয়ে পড়তে হবে।

অমল বলল, তাহলে একটুআধটু ঘোরাফেরার কোন উপায় নেই?

আছে বৈকি! সপ্তাহে কেবল একদিন বেলা একটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ছুটী পাবেন। ফুল-ইউনিফর্মে বেলা এগারটার সময় আপনাকে কোম্পানি অফিসের সামনে ফল-ইন করতে হবে। সুবেদার সাহেবের ইন্সপেকশনে যদি উত্তীর্ণ হতে পারেন তবেই ছুটী পাবেন।

তারপর?

ল্যান্স-নায়েক দত্ত একখানা খাতার পাতা খুলে বলতে লাগল, এই হুকুমের কোন রদবদল না হওয়া পর্যন্ত এই ষ্ট্যান্ডিং অর্ডার আপনাকে মেনে চলতে হবে। প্রথমদফা হচ্ছে আউট-অফ-বাউন্ডস্, ক্যাম্পের আশপাশের বস্তি, সহরের সমস্ত বেশ্যালয় আর সিভিলিয়ান্‌কোয়ার্টার।

তাহলে কি আমার নিজের বাড়ীতেও যেতে পারবনা?

হুকুম শোনান আমার কাজ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নয়! দ্বিতীয়দফা হচ্ছে ক্যাম্প-ডিসিপ্লিন, সর্বদা ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে, মাথায় সব সময়ে হ্যাট রাখতে হবে, সকল অফিসারকে সকল সময়ে সেলাম করতে হবে।

অমল আবার প্রশ্ন করল, একই অফিসারকে একই দিনে যতবার দেখব ততবারই সেলাম করব?

এইতো, একটু একটু বুঝতে পারছেন দেখছি! তারপর তৃতীয়-দফা—ক্যাম্পের মধ্যে মাদক দ্রব্য আনা বা রাখা নিষিদ্ধ। মদ খাওয়া মঞ্জুর কিন্তু মাতাল হওয়া দণ্ডনীয়।

অমল বিস্ময়ে ফেটে পড়ল, মদ খেতে পারবে অথচ মাতাল হতে পারবে না, এ আবার কি রকম হুকুম!

ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলল, একেই বলে মিলিটারী-হুকুম। যাক, চলুন আমার সঙ্গে, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, বাথরুম, সেলুন ক্যানটীন, অফিস, সব আপনাকে চিনিয়ে দিই।

সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে অমলকে দেখিয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে ল্যান্স-নায়েক দত্ত বলল, চুলটা কিন্তু গেমসের আগেই কেটে নেবেন। বুঝলেন না, ওই খেঁকি কুকুরটাকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই!

টেকনিক্যাল-ক্লাস শেষ হলে রসিদ ছাপাছাপি একমগ চা নিয়ে তাঁবুতে ঢুকে অমলকে বলল, নিন, মগটা পাতুন, আপনার জন্যও এনেছি।

খাটিয়ায় বসে চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বলল, আপনার প্যান্টদুটো আজই দরজীকে দিয়ে আসতে হবে। আপনি না-হয় দু-একটা দিন আমার একটা প্যান্ট পরে কাজ চালিয়ে দেবেন।

অমলের চোখদুটো যেন জ্বালা করে ওঠে! তাকিয়ে তাকিয়ে সে রসিদকে দেখে আর বারবার তার মনে পড়ে দিবাকরের কথা! এইতো রয়েছে কত মানুষ যাদের মধ্যে আছে বুকভরা দরদ আর গভীর সহানুভূতি!

অমল বলল, আমি কি করে দবজীর দোকানে যাব?

কেন! ল্যান্স-নায়েক দত্তকে দিয়ে একটা পারমিট করিয়ে নিননা।

কিন্তু আমাকে যে আবার চুল কাটতে হবে, জমাদার সাহেবের হুকুম। আর ল্যান্স-নায়েক দত্ত যে বলল গেমসে ফলইন করতে!

রসিদের মুখখানা মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল, এরই মধ্যে জমাদার সাহেবের নেকনজরে পড়েছেন!

চা খাওয়া শেষ করে অমল চুল কাটতে গেল সেলুনে। দেখল, সে

ছাড়াও খদ্দের আরও জনকয়েক রয়েছে। একজন খালি গায়ে একখানা ইটের ওপর বসে চুল কাটছে। তাঁবুর মধ্যেকার ভেপসা গরমে তার গা দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে আর কাটা চুলগুলো তার সর্বাঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। একের পর এক ক্রমিকনম্বর অনুযায়ী চুল কেটে উঠে যাচ্ছে। চুল কাটার ব্যাপারটাও এখানে অনেক সরল! ঘাড় আর মাথার দুপাশে ক্লিপ্ চালিয়ে প্রথমদফায় মাথার শাঁস বার করে দেওয়া তারপর একটু-আধটু কাঁচির ছাঁট!

অবশেষে অমলের পালা এল। ইটের ওপর বসে অমল মাথাটা পেতে দিল। সেইক্ষণে চকিতের জন্য তার মনে হল, সে হাড়িকাঠে মাথা পেতে দিয়েছে!

হঠাৎ আর একজন তার পাশে বসে পড়ে বলল, তালুকদার আমারটা ঝটপট সেরে দাওতো! ছ'টাব শো'য়ে জমাদার সাহেবের সঙ্গে সিনেমায় যাব।

তালুকদার অমলের মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, আপ থোড়া ঠাড় যাইয়ে, হাবিলদার সাবকো পাঁচমিনিটমে হো যায়গা।

অমল দেখল হাবিলদার সাহেবের চুল কাটার পদ্ধতীটা কিন্তু অন্য রকমেব। চামড়ার একটা ব্যাগ থেকে আরও একটা ক্লিপ আর রকমারি কাঁচি-চিরুণীও বার হল, আর তার সব ক'টারই ব্যবহার হতে থাকল! তালুকদারের হাত কিন্তু এখন আর ঝড়ের বেগে চলছে না! অবশেষে হাবিলদার সাহেবের মাথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ মালিশও হল! গায়ের চুল ঝেড়ে হাবিলদার সাহেব যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন অমল সবিস্ময়ে দেখল, তালুকদার চুল ভালই কাটে! তবে, সেটা কি শুধু হাবিলদার সাহেব বলেই!

চুল ছেঁটে তাঁবুতে ফিরে অমল সাবান আর গামছা নেওয়ার জন্য সবেমাত্র সুটকেশটা খুলে বসেছে এমন সময় হুইসিল্ বেজে উঠল. আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁক, গেমসকে লিয়ে ফল-ইন—

'অমলকে এসে পাকড়াও করলেন এক নায়েক সাহেব, এইঃ, চলো ময়দানমে।

অমল বলল, এইমাত্র আমি চুল কেটে আসছি।

তবে আর কি, আমার মাথা রক্ষে করেছ! চুল কেটেছ বলে যদি খেলতে না চাও তাহলে আজ খাওয়াটাও বন্ধ রেখ!

অমল মুখ ফিরিয়ে নায়েক সাহেবের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঝনাৎ করে সুটকেশের ঢাকনাটা ফেলে দিয়ে-হনহন করে মাঠে বেরিয়ে গেল।

খেলা সুরু হল। নিস্পৃহ থাকার সংকল্প নিয়েও অমল বেশীক্ষণ উদাসীন থাকতে পারল না। খেলার মাঝে সে-ও মেতে উঠল। দু'-একজন ভাল খেলোয়াড়ও আছে। খেলা বেশ জমে উঠল!

খেলা শেষ হলে অপর দলের লেফট-ইনকে দেখিয়ে অমল তার দলের হাফ-ব্যাককে বলল, ও ভদ্দরলোকতো বেশ খেলেন।

হাফ-ব্যাক আঁতকে উঠল, ভদ্দরলোক কি মশাই! উনি যে সুবেদার সাহেব। আপনার সাহসতো কম নয়! খুবতো চার্জ করছিলেন!

প্রায় ঘন্টাখানেক মাঠময় দৌড়দৌড়ি, দাপাদাপি করে অমলের মনটা যেন অনেক হাল্কা হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, খেলার আনন্দটুকু গেল উবে! তবে কি এবার তাব সুবেদার সাহেবের কাছে ডাক পড়বে!

স্নান সেরে তাঁবুতে ফিবে অমল দেখল রসিদ তার মশারীটা খাটিয়ে দিচ্ছে। তাকে দেখেই রসিদ বলল, নিন, চলুন তাড়াতাড়ি। আপনার পারমিট আমি ল্যান্স-নায়েক দত্তর কাছ থেকে এনে রেখেছি।

অমল বলল, আর আপনার

আমার জন্য পারমিট লাগবে না—অমলের আরও কাছ ঘেঁষে এসে চাপা গলায় বলল, পায়খানার বোতল হাতে থাকলেই ক্যাম্পের গেট একেবারে খোলা। যাওয়ার সময় বোতলটাকে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে যাব আর ফেরার সময় বোতলটা হাতে করে ঢুকে পড়ব।

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল রসিদের মুখের দিকে তাকাল। রসিদ ম্লান কণ্ঠে বলল, এখানে এসে পর্যন্ত যেন একটা চোর বনে গেছি। কোন কাজ সিধাসিধি করবার উপায় নেই! এমন কি কারও সঙ্গে দিল খুলে দুটো কথা কইবারও উপায় নেই!

যা বলেছিস মাইরী, বলতে বলতে একটা ছেলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। রসিদের মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

আগন্তুক শিবদাস বলল, আমারতো মাইরী এখানে থাকতেই ইচ্ছে করে না।

অমল রসিদের দিকে তাকিয়ে দেখল, রসিদের চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে উঠেছে।

রসিদ বলল, ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে যে কাজটা আপনি করছেন তার জন্য সরম লাগেনা? আমাকে আবার কোয়ার্টার-গার্ডে পুরতে পারলে জমাদার সাহেব বুঝি আপনাকে ল্যান্স-নায়েক বানিয়ে দেবেন?

শিবদাস আমতা আমতা করে উঠল, যাঃ মাইরী, কি সব বলছিস! আমি কি তাই বলেছি নাকি—বলতে বলতে সে সরে পড়ল।

রসিদ বলল, লোকটাকে চিনে রাখুন, জমাদার সাহেবের টিক্‌টিকি।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে রেলের ইয়ার্ড পার হয়ে ওরা সদর রাস্তায় এসে পড়েছে। রাস্তার একধারে বস্তির সারি আর অপরধারে বাগান-বাড়ীর ছ্যাতলাধরা পাঁচিল। রাস্তাটা সরু হলেও পিচ-ঢালা। ইলেকট্রিক যদিও নেই কিন্তু ঠুলি-লাগান গ্যাসগুলো জেবলে দিয়েছে। দু'পাশে কাঁচা নর্দমা পাঁকে ভর্তি, সবুজ আচ্ছাদনের ওপর বড় বড় ফোস্কা ফুটে রয়েছে! তার ওপর কঞ্চি-দিয়ে-বোনা সেতু, বস্তিতে যাতায়াতের রাস্তা!

রাস্তার আবহাওয়াটাই কেমন রহস্যময়। অমলের গা ছমছম করে। নানান জাতের লোক রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে, তাদের মধ্যে অনেকেই অপ্রকৃতিস্থ! একটা গ্যাসের তলায় অনেকগুলি মেয়ে সেজেগুজে গোল হয়ে বসে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিগারেট টানছে! এদের পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চলেছে।

কিছুদূর গিয়ে ওরা একটা দরজীর দোকানে ঢুকল। রসিদ হাত বাড়িয়ে প্যান্টদুটো দিতেই দরজী কল থামিয়ে উঠে এসে অমলের মাপ নিতে সুরু করল। রসিদ চাটাইটার ওপর চেপে বসে আর একজনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মাপ দেওয়া হয়ে যেতেই অমল রসিদকে বলল, চলুন, আবার বসলেন কেন! হয়তো খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে যাবে!

রসিদ বলল, একটু চা খাবেন না?

নাঃ, ফিরেইতো আবার ভাত খেতে হবে।

রসিদ উঠে দাঁড়িয়ে দরজীকে বলল, আজ তাহলে থাক ওস্তাগর সাহেব, আর একদিন না হয় আসা যাবেখন!

দরজী বলল, তা কেমন করে হয় মিয়াঁ! তোমার কথায় সে এতক্ষণ কোন বাবু বসায়নি! তারতো তবে লোকসান হয়ে গেল!

একটা টাকা দরজীর হাতে দিয়ে রসিদ অমলকে বলল, চলুন—

ক্যাম্পের দিকে তারা ফিরছে। রসিদ চুপ করে আছে, অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে! আবছায়া অন্ধকার রাস্তায় পাশের লোকের মুখটাও পরিষ্কার দেখা যায় না। কিছুদূর চলার পর হঠাৎ রসিদ বলল, আমি মাঝে মাঝে আসি!

রসিদের দিকে চকিতে একবার চেয়ে অমল ভাবল, এ কথার পিঠে সে কিইবা বলবে! কোথায় আসে, কেন আসে, রসিদ সে সম্বন্ধে কিছু না বললেও সমস্ত ব্যাপারটা সে জলের মত বুঝতে পারছে।

আবার রসিদ তেমনি হঠাৎ প্রশ্ন করল, আপনি পছন্দ করেন না, না?

অমল বলল, না।

সে আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আজ গেলাম না।

অমল বিস্মিত হয়ে ভাবছিল, রজতও একদিন তার কাছে এই একই প্রস্তাব করেছিল! কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে কি দুস্তর প্রভেদ!

ক্যাম্পে ফিরে খাওয়া শেষ করে অমল আর রসিদ তাদের তাবুর সামনে বসেছে। রোল-কলের তখনও কিছুটা দেরী। সারা মাঠময় লোক রয়েছে ছড়িয়ে, অন্ধকারে তাদের দেখা যায় না কেবল চোখে পড়ে সিগারেট-বিড়ির আগুন।

রসিদ বলল, এই সময়টায় টিকটিকিগুলোর ভারী সুবিধে!

অমল বলল, থাক তবে, ওসব আলাপ আর করে দরকার নেই!

রোল-কলের হুইসিল্ পড়ল। সিগারেট-বিড়ির আগুনগুলো ধীরে ধীরে মাঠের মাঝে জমা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অন্ধকার। সুরু হল রোল-কল। সমস্ত কোম্পানিটা দাঁড়িয়েছে দুভাগে ভাগ হয়ে—লোকো আর ট্রাফিক্। হাবিলদার-মেজর নিচ্ছেন রোল-কল। বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হল! হুকুম মানার উপদেশ আর ভাই-বন্দির কিসসার উপদ্রব নেই! পরদিনের প্রোগ্রাম—রুট-মার্চ, তারই টাইম-

টেবল্ আর পোষাকের বিবরণ।

রোল-কল শেষ হতে রসিদ অমলের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে থেকে তাঁবুর মধ্যে চলে গেল। অমল উঠি উঠি করেও যেন উঠতে পারে না। ফাঁকা মাঠ, নিকষ কালো অন্ধকার, তার মাঝে বিড়ি-সিগারেটগুলো জোনাকির মত জ্বলছে আর নিভছে। হাওয়া দিচ্ছে মৃদুমৃদু। শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। অমল ভাবছে তার ফেলে-আসা জীবনের কথা! একটা অবলম্বন সে খুঁজছে যাকে সে তার সৈনিক-জীবনের অবসর মুহূর্তগুলোতে আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু কিছুইতো তার নেই! যা আছে তা কেবল সম্ভাবনা! সুযোগ পেলে সে কি হতে পারত! পয়সা থাকলে সে কি করতে পারত!

তাঁবুর মধ্যে থেকে হাসির হর্‌রা ভেসে আসে। অমলের চিন্তার জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সে সৈনিক, এই রূঢ় বাস্তব তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পরদিন সকালে রুট-মার্চ, সকাল সকাল উঠতে হবে!

তাঁবুর পর্দা সরিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিতেই এ্যালকোহলের তীব্র গন্ধে অমলের মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। বারেক মাথাটা টেনে নিয়েই আবার সে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। সীটে পেঁাছতে পেঁাছতে মাথাটা তার ভারী হয়ে আসে। হামাগুড়ি দিয়ে সে বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একটী ছেলে বলল, একটা রসাল গল্প ছাড় দাদা।

দাদা বললেন, দূর এমন মৌজের সময় কি বকবক করে!

না দাদা, তোমার মুখে একটা গল্প না শুনলে যে ঘুমই আসবে না।

দাদার গল্প সুরু হল। সে এক রূপকথা! বিকৃত মনের কামনা-বাসনার বিকারগ্রস্ত অভিব্যক্তি! ইনিয়ে-বিনিয়ে চলল নারীদেহের পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা, রতিক্রীয়ার মানস-মৈথুন!

শুনতে শুনতে অমলের শরীর কুঁকড়ে উঠছে, অস্বস্তিতে সে পাশ ফিরে শুল! গল্প চলেছে চোঁয়া-ঢেঁকুরের মত জ্বালাময়! তার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে গেছে, চামড়ার তলে তলে আগুন উঠেছে জ্বলে! থাবা মেলে অমল কম্বলটা চেপে ধরল।

জোর গুজব কোম্পানি শিগগীরই মুভ করছে!

কিন্তু কোথায়! জল্পনাকল্পনার অন্ত নেই। ইরাক, ইরাণ, চীন, উত্তর-আফ্রিকা, এমন কি রাশিয়ার নামটাও বাদ পড়েনি!

খবরের সন্ধানে অমলও ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু খবরগুলো এতই সচল যে কোনটা সবচেয়ে তাজা তার হদিসই পাওয়া যায় না! অমল ভাবে লেনিনগ্রাড বা মস্কো কোনটাইতো ফল করল না! তবে আর কবে জার্মানী আসবে ভারতবর্ষে! জার্মানী না এলে কি বৃটীশের হাত থেকে কোনদিন মুক্তি পাওয়া যাবে।

ছোট একটা দল এক জায়গায় গোল হয়ে আড্ডা জমিয়েছে। অমল ধীরে ধীরে সেইদিকেই চলেছে। মুভের খবরটা সকলকেই যেন বেশ চাংগা করে তুলেছে। কিন্তু যেখানেই তারা যাক না কেন সেটাতো লড়াইয়ের মাঠ! তার মানে মৃত্যুর দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া! তবুওতো মনটা খুশী হয়ে উঠছে এই ভেবে যে, একঘেঁয়ে এই জীবনের মধ্যে আসবে একটা পরিবর্তন!

আড্ডাটার কাছাকাছি এসে শুনল খগেনের কথা, কিন্তু যাই বল ভাই, ফ্রন্টে যাওয়া মোটেই সুখের খবর নয়! শেষ পর্যন্ত বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবেতো!

মৃগাঙ্ক বলল, দূর ক্যাবলা, আমরা প্রাণ দিতে যাব কেন! আমরাতো আর রেগুলার-ফোর্স নই যে রাইফেল ঘাড়ে করে ট্রেঞ্চে নেমে লড়াই করব! আমরা চালাব রেল, থাকব ফ্রন্ট-লাইন থেকে বহু দূরে।

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে উঠল, তোমায় বলেছে! রোজ যদি অন্তত খবর-কাগজটাও পড়তে৷ আরে বাবা রেলওয়ে হল আসল রাস্তা! ওই পথ দিয়েইতো লড়াইয়ের সমস্ত রসদ যাতায়াত করে। দেখনা, রাশিয়াতে রোজই একটা-না-একটা রেল-জংশন বারকয়েক হাতবদল হচ্ছেই!

হঠাৎ নজরটা ঘুরে যায়। কোম্পানি-অফিসের অর্ডারলি সোহরাব ওইদিকেই আসছে। মৃগাঙ্ক বলল, সোহরাবকে চেপে ধরলে হয়তো একটা হদিস পাওয়া যেতে পারে!

মৃগাঙ্কর পেছন পেছন সকলেই গিয়ে সোহরাবকে ঘিরে ধরল। মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, কোম্পানি নাকি শিগগীরই মুভ করছে?

সোহরাব নিতান্ত নিস্পৃহভাবে বলল, শুনছিতো রোজই।

সুধেন্দু একেবারে সামনে এগিয়ে গেল, কি শুনেছিস রে?

বলে কি আমি কোয়ার্টার-গার্ডে যাব নাকি?

পাঁচকড়ি আশ্বাস দেয়, আমাদের কাছে বলতে ভয়টা কিসের? আমরাতো আর জমাদার সাহেবের কাছে গিয়ে চুক্‌লি করব না।

সোহরাব যেন একটু নরম হল, বলল, সব কথা কি আর বুঝতে পারি ছাই! ইংরেজিতে কত কথাই বলে! এইতো আজও হেডক্লার্ককে বলছিল। হেডক্লার্ক আমাকে পাঠিয়েছে কোয়ার্টার-মাষ্টারের কাছে প্যাকিং-বক্সের স্টক জানতে। এইতো এই কাগজটায় লিখে দিয়েছে।

মৃগাঙ্ক ছোঁ মেরে সোহরাবের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল! সঙ্গে সঙ্গে সোহরাব মৃগাঙ্কর হাত চেপে ধরে বলল, ও কাগজ পড়লেই আমি এ্যাডজুটান্ট সাহেবকে বলে দেব! ভাল চানতো ফিরিয়ে দিন বলছি!

অনেক কাকুতি মিনতি মৃগাঙ্ক করল কিন্তু সোহরাব কোন কথা শুনল না। কাগজটা নিয়ে সে স্টোরের দিকে চলে গেল।

মৃগাঙ্ক আপন মনেই গর্জে উঠল, করেতো অর্ডারলির কাজ, তার ডাঁট দেখনা! যেন ও নিজেই একটা এ্যাডজুটান্ট!

ভীড়টা পাতলা হয়ে যায়। ছোট ছোট দলে কিছু কিছু এদিক-সেদিক চলে গেল। প্যাকিং-বক্সের হিসেব! এইটাইতো বিরাট খবর!

খগেন বলল, আরে বাবা যেখানেই যাও না কেন, মরতেতো হবেই!

মৃগাঙ্ক বলল, আমিতো জানি, কেবল একবার মিলিয়ে দেখছিলুম।

সুধেন্দু বলে উঠল, তবে বাছাধন ন্যাজে খেলাচ্ছ কেন? বলেই ফেলনা!

বলতে আর আমার কি আপত্তি কিন্তু একজন যে মারা পড়বে!

কেন? একদিনতো আমরা সেখানে যাবই। আর দুদিন আগে জানলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

মৃগাঙ্ক খেঁকিয়ে উঠল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়রে! জানিস সিকিউরিটী কাকে বলে?

পাঁচকড়ি বলল, কেন শুধু শুধু গুল্‌ মারছিস মাইরী। ওসব বুকনি ছেড়ে দিয়ে যা জানিস তাই বল! না-হয় একপ্যাকেট উড্‌বাইন খাওয়াবখন।

নাঃ, তোরা একেবারে গে'য়ো ভূত, কিচ্ছু জানিস না। সিকিউরিটী হচ্ছে মিলিটারীর সব চেয়ে বড় অস্ত্র! জান্ যাবে তবু মুখ খুলবে না! তুমি যদি কোন খবর জানতে পার তাহলে সে খবর দ্বিতীয় কাকেও জানাবে না। যদি জানাও তাহলেই শত্রুপক্ষ জানতে পারবে আর আমাদের সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দেবে।

শ্রোতার দল বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেছে। তাদের বুদ্ধির পরিধির মধ্যে মৃগাঙ্কর অকাট্য যুক্তিকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মিলিটারীতে কি সবই আজব! তবুও খগেন বলল, যে জায়গায় আর দুদিন বাদে আমরা সশরীরে হাজির হব সেই জায়গাটার নাম জানাতে এদের এতই ভয়! আমাদের এতই অবিশ্বাস! কেন, আমরা জানতে পারলে বুঝি জার্মানদের কানে কানে বলে আসব?

মৃগাঙ্ক বলল, জার্মানদের চেয়ে জাপানীরাই এখন অনেক কাছে এসে পড়েছে আর ভয় এখন তাদেরই বেশী! তুই-ই যে জাপানীদের কাছে বলবি সে কথা আমি বলছি না; কিন্তু আমাদেরই মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা একাজ করছে! বলতে পাবিস জি-পি-ও'র রং বদলানর সংগে সংগে সেই দিনই টোকিও-রেডিয়ো থেকে সে খবর দেয় কি করে?

দলটার মধ্যে থমথমে একটা ভাব ঘনিয়ে আসে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে কেমন যেন সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সত্যিইতো এ সব খবর দেয় কে!

পাঁচকড়ি বলে উঠল, যা যা, তোকে আর বলতে হবে না। ঢের কেরামতি হয়েছে!

মৃগাঙ্ক বলল, বললে আর আমার কি ক্ষতি! কিন্তু বেচারা মজুমদার মশাই যে কোর্ট-মার্শালে চড়বে!

কোর্ট-মার্শাল!

হ্যাঁরে হ্যাঁ। এ খবর যদি ক্যাম্পময় জানাজানি হয়ে যায় তাহলে মজুমদার মশায়ের নির্ঘাত কোর্ট-মার্শাল। জানিস, অফিসের প্রত্যেকটী স্টাফকে অফিসিয়াল-সিক্রেটস-এ্যাক্ট অনুযায়ী বণ্ড দিতে হয়েছে! কোম্পানির কোন গুপ্ত খবর যদি বেরিয়ে পড়ে তাহলে তিনবছর থেকে

চোদ্দবছর পর্যন্ত জেল দিতে পারে, ফাঁসিতে লটকাতে পারে, গুলি করে মারতে পারে!

ধৈর্যের বাঁধ খানখান হয়ে গেছে! গজগজ করতে করতে অনেকেই এদিকওদিক চলে গেল। যে চার-পাঁচজন রইল তাদের আরও কাছে ডেকে মৃগাঙ্ক ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, আমরা যাচ্ছি নর্থ-আফ্রিকায়! এই সপ্তাহেই আমরা মুভ করছি। এখান থেকে রওনা হয়ে বম্বে, বম্বে থেকে জাহাজে বেন্‌গাজি।

সেদিন রাতে রোল-কলের পর রসিদ অমলকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বেনগাজি কোথায় অমলবাবু?

অমল বিস্মিত হয়ে বলল, কেন!

আমরা নাকি কালই সেখানে যাচ্ছি! সত্যি নাকি অমলবাবু?

তা আমি কেমন করে জানব বল।

আপনি কিছু শোনেননি?

হ্যাঁ, শুনেছিতো অনেক কিছুই। তা মিলিটারীতে যখন ঢুকেছি তখন যেখানেই এদের দরকার সেখানে নিয়ে যাবে।

রসিদ কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে! কি যেন সে ভাবছে! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, আপনার বাপ-মা এ-খবর শুনলে কি করবেন একবার ভাবুনতো!

কিন্তু সেকথাতো আর চলেনা রসিদ! আমরা যে বণ্ডে সই করেছি!

রসিদ কিছুক্ষণ অমলের মুখেব দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন সে অমলেব মুখের মধ্যে খুঁজতে থাকে। বন্ডে সই করার তাৎপর্য সে বোঝে না, আইনের বাঁধন তার সরল মনের টুঁটি চেপে ধরতে পারে না। সোজাসুজি সে অমলকে প্রশ্ন করে, আপনি তাহলে যাবেন?

দিশেহারা হয়ে অমল বলল, না গিয়ে যে উপায় নেই রসিদ!

রসিদ আর কোন কথা না বলে হনহন করে তাঁবুর মধ্যে চলে যায়। অমলের মনে হল, রসিদের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক যেন শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রসিদের তুলনায় নিজেকে যেন তার বড়ই দুর্বল মনে হয়। একবার ইচ্ছে হয় রসিদকে জিজ্ঞেস করে, সে কি করবে ঠিক করেছে!

তাঁবুগুলোর ধার ঘেঁষে অমল ছোট ছোট ধাপ ফেলে এগিয়ে চলেছে, মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। প্রত্যেক তাঁবুর আশেপাশে ছোট ছোট দলে জটলা চলেছে। সেই বেনগাজি! তার মানে স্লটার-হাউস্! যেখানে তাদের একটি মাত্র কাজ হচ্ছে চোখকান বুজে মরা!

তাঁবুতে ফেরার পথে অমল শুনতে পেল, আরে, জার্মানরা ইণ্ডিয়ানদের কিচ্ছু বলবে না! আর বেগতিক দেখলে হাত তুলে দাঁড়িয়ে যাব!

অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাত তুলে দাঁড়ালেই বাঁচতে পারবে! জার্মানরা ভারতীয়দের কিচ্ছু বলবে না! অথচ পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে তবে এমন বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছে কেন?

পা চালিয়ে এসে অমল তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। রসিদ শুয়ে পড়েছে। সত্যিই যেন রসিদ বড্ড বেশী ভয় পেয়েছে! একেবারে মুষড়ে পড়েছে! জামাকাপড় বদলে অমল মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। বেনগাজি অভিযানের ওপর মনটাকে নিবন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁবুটার আবহাওয়াই অন্যরকম! রসিদ যে ঘুমোচ্ছে না একথা সহজেই বোঝা যায়! তবুও তাকে ডাকতে কেমন যেন সংকোচ লাগে!

দাদার মদগেলা বোধহয় শেষ হল। নবীন আর সুরেশও শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ অমল সজাগ হয়ে উঠল, এইবার দাদার গল্প সুরু হবে!

সুরেশ বলল, হ্যাঁ দাদা, বেনগাজি গেলে তোমার কি উপায় হবে?

উপায় একটা হবেই! বুঝলি না, যে খায় চিনি যোগান চিন্তামণি!

নবীন বলল, সে না হয় হল। কিন্তু বৌদির কি বন্দোবস্ত করছ?

কেন ভাই, তোমার বৌদিকেতো বলে দিয়েছি যে-ক'দিন আমি মিলিটারীতে আছি সে-ক'দিনের জন্য যেন একটা জোগাড় করে নেয়।

বল কি দাদা! তুমি যে দেখছি একেবারে মহারাজ পাণ্ডু!

কেন, তোমার বৌদি বুঝি একটা মানুষ নয়! তার বুঝি আর রক্তমাংসের শরীর নয়! এখানেতো আমি বেপরোয়া মজা লুটছি! আর তোমার বৌদি বুঝি বছরের-পর-বছর সংযম-সাধনা করবে! অত স্বার্থপর আমি নই ভাই!

বাইরে থেকে নাইট-পিকেট হাঁক পাড়ল, এই, বাত্ত বন্দ! লাইট-আউট হো গয়া!

পরদিন পি-টি'তে পাঁচজন গর্‌হাজির। সেক্‌সন্‌-কমান্ডাররা প্রচুর হাঁকডাক করল, লোক পাঠিয়ে তাঁবু পায়খানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু কাকেও পাওয়া গেল না! প্যারেড ফল-ইনের সময় সকলেই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত! পাঁচ-পাঁচজন লোক পালিয়েছে, ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়!

প্যারেড সুরু হওয়ার আগেই সুবেদার সাহেব তেড়েফুঁড়ে এসে বললেন, যে যে তাঁবু থেকে লোক পালিয়েছে তারা আলাদা ফল-ইন।

জড়সড় অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে তিনটী তাঁবুর লোকেরা বেরিয়ে এল। প্রথমদলের সামনে গিয়ে সুবেদার সাহেব হেঁকে উঠলেন, তোমাদের কতজন?

ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। কে জবাব দেবে! তাদের মধ্যে একজন ল্যান্স-নায়েকও নেই! সকলেই এ্যাটেনশন অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুবেদার সাহেব এক কদম এগিয়ে এসে পা ঠুকে একজনের নাকের ডগায় আঙুল নেড়ে চিৎকার করে উঠলেন, বাতাও, কেত্‌না আদমী?

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটী বলে উঠল, একজন স্যার।

কিধর্‌ গয়া?

জানিনা স্যার।

ব্লাডি তুম ক্যোঁ নহি জান্‌তা?

ছেলেটীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, গলাটা দপদপ করছে, কপাল ঘেমে উঠেছে! বারকয়েক ঢোঁক গিলে বলল, আজ্ঞে স্যার! আমিতো স্যার! ঘুমোচ্ছিলাম স্যার!

তবে আর কি আমার মাথা রক্ষে করেছ! খেঁকিয়ে উঠে সুবেদার সাহেব দ্বিতীয়দলের সামনে গিয়ে বললেন, তোমাদের কজন?

একসঙ্গে তিন-চারজন বলে উঠল, তিনজন স্যার।

সুবেদার সাহেব বোমার মত ফেটে পড়লেন, হোয়াট! চোখদুটো কপালে তুলে বললেন, ব্লাডি, তুমলোগ মর্‌ গয়া থা?

এদিকওদিক দেখে নিয়ে একজন উত্তর দিল, না স্যার!

না স্যার! দেন্‌ হোয়াট দি ব্লাডি হেল ইউ ওয়্যার ডুইঙ?

আজ্ঞে স্যার, ঘুমোবার আগে পর্যন্ত দেখেছি সকলেই বিছানায় ছিল স্যার! ওদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল স্যার!

সুবেদার সাহেব আঙুল নেড়ে ছেলেটীকে ডাকলেন, তুমি শোন—একটু তফাতে ডেকে বললেন, বল কি কথাবার্তা হচ্ছিল?

কথাবার্তা স্যার?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে বললে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল।

না স্যার্, আমিতো ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিনি স্যার্। ওরা সকলে স্যার, খারাপ গল্প বলাবলি করছিল!

কটমট করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, ফল-ইন—

তৃতীয়দলের সামনে সুবেদার সাহেব এসে দাঁড়াতেই অমলের মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে উঠেছে। রসিদ পালিয়েছে! কিন্তু রসিদ যে তার সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা করত।

সুবেদার সাহেবের স্বর কিন্তু মোলায়েম হয়ে গেছে! সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের তাঁবু থেকে কেবল রসিদ বুঝি?

দাদা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

আর কিছু না বলে সুবেদার সাহেব চলে গেলেন অফিসের দিকে।

যথারীতি প্যারেড সুরু হল। কোন সেকসনে রাইফেল, কোন সেকসনে ব্রেনগান, আর বাকী সকলের স্কোয়াড-ড্রিল। সেকসন-কমান্ডাররা তটস্থ হয়ে উঠেছে। স্কোয়াড-ড্রিলের হাবিলদার একটানা চেঁচিয়ে চলেছে, লেফট—রাইট—লেফট। ব্রেন-গান-ইন্সট্রাক্টর ছেলেদের বসতে না দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। যদিও অন্যদিন ছেলেরা ব্রেন-গানটাকে ঘিরে বসে। কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। রাইফেল-ইন্সট্রাক্টর ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখেও মনে যথেষ্ট ভরসা পাচ্ছে না। অকারণে প্রত্যেককে রাইফেল দুহাতে মাথার ওপর তুলে খানিকটা দৌড় করাচ্ছে।

ছেলেরা বুঝতে পারছে তাদের ওপর অহেতুক অত্যাচার হচ্ছে! রামের অপরাধে শ্যামের মাথায় লাঠি পড়ছে। তবুও তারা প্রতিবাদ করছে না। অনাগত এক দুর্দৈবের আতঙ্কে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

গভীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে কখন মেজর সাহেব প্যারেড-গ্রাউণ্ডে আসবেন! তারপর যা হবার তা হয়ে যাক্!

কিন্তু প্যারেডের সময়টা নির্বিঘ্নে কেটে গেল। মেজর সাহেব অবশ্য আসেননি কিন্তু অন্যান্য অফিসাররা যথারীতি এসে প্যারেড-পরিদর্শন করে গেছেন। অভাবনীয় কিছুই ঘটেনি!

বিকেলের দিকে ক্যাম্পের চেহারা গেল বদলে। দুজনের জায়গায় ছ'জন রাইফেল-সেন্ট্রী বেয়নেট লাগিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পের চারকোণে আর দুইগেটে! ছ'জন ডাণ্ডা-সেন্ট্রী মোতায়েন হয়ে গেছে পায়খানায়, প্রস্রাবখানায়, বাথরুমে, লঙ্গরখানার পেছনে আর ভাঙ্গা বেড়ার সামনে! লাইন-সেন্ট্রীর ডিউটী সুরু হবে সন্ধে থেকে! তারা সমস্ত ক্যাম্পটা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবে। নাইট-পিকেটের ডিউটী সুরু হবে লাইট-আউটের সময় থেকে। আর সবার অলক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জমাদার দাসগুপ্তর ইন্টেলিজেন্স-স্কোয়াড! তাঁবুর আড়ালে-আবডালে তারা ওৎ পেতে আছে! যেখানেই গুটীকয়েক ছেলে বসে গল্পগুজব করছে সেখানেই তারা নিঃসাড়ে ভীড়ে পড়েছে!

ক্যাম্প-চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। বিড়িসিগারেটের অভাবে ধুমপানকারীদের পেট ফেঁপে উঠছে, তবুও তারা ছুটি চাইতে সাহস পাচ্ছে না! হয়তো তাকেই চেপে ধরবে পালানর ফিকির মনে করে! বেড়ার দশহাতের মধ্যে যাওয়ার উপায় নেই তাহলেই কোন-না-কোন সেন্ট্রী হাঁক পাড়বে। পায়খানায় যাওয়ার সময় একজন ডাণ্ডা-সেন্ট্রী ডাণ্ডা উঁচিয়ে পেছন পেছন যাবে, কর্মসমাপনান্তে ডাণ্ডার ডগায় তাকে আবার ক্যাম্প-চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। গার্ডরুমের খাতায় প্রত্যেকের বাইরে যাওয়া ও ফিরে আসার সময় নোট করা হচ্ছে।

রোল-কলের হুকুম শুনে ছেলেরা বুঝল আশঙ্কা তাদের অমূলক নয়! পরদিন সমস্ত কোম্পানির ফেটীগ!

কিছুক্ষণ পরে মেজর সাহেব স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন রোল-কলে। তাঁর আবির্ভাবে ছেলেদের হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যায়! নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাষ্ঠবৎ তারা দাঁড়িয়ে থাকে। মেজর সাহেব বললেন, তোমরা বসে পড়। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে?

মেজর সাহেবের স্বর কোম্পানির প্রত্যেকটী ছেলেই চেনে কিন্তু এমন মোলায়েম স্বরতো কখনো শোনেনি! সত্যিই ইনি মেজর রায়তো! চোখ পিটপিট করে তারা মেজর সাহেবের মুখখানা দেখবার চেষ্টা করে।

মেজর সাহেব উপবিষ্ট ছেলেদের আরও কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করলেন, তোমাদের কাছে আজ এমন একটা খবর এনেছি যা শুনলে তোমরা সকলেই খুশী হবে। আমরা কাল এখান থেকে মুভ করছি! তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কোথায় আমরা যাচ্ছি? কিন্তু আমিও তোমাদের মতই এর বেশী আর কিছু জানি না। মিলিটারীতে সৈন্য চলাচল হচ্ছে সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপার!

একটু থেমে পাইপটাকে ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে সুরু করলেন, কাল সকাল থেকেই আমাদের কাজ সুরু করতে হবে। অনেক কাজ আমাদের। এই ক্যাম্পের প্রতিটী জিনিষ আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আমি দেখতে চাই, তোমরা প্রত্যেকে হাসি মুখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তোমাদের কাজ হাসিল করেছ।

মেজর সাহেব থামলেন। সুবেদার সাহেব মেজর সাহেবের কানে কানে কি যেন বললেন। মেজর সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলে চললেন, তোমরা সকলেই আমার ছেলে। তোমাদের মত আমারও একটী ছেলে মিলিটারীতে রয়েছে। ভর্তি হওয়ার পর থেকে কোথায় যে সে আছে তা আজও আমি জানি না। তাই তোমাদের মধ্যেই আমি তাকে দেখতে পাই। তোমাদের কোন কষ্ট হলে সে কষ্ট আমাকেই বেশী বাজে। কিন্তু সৈনিকের জীবনই হল কষ্টের জীবন। আর কষ্টকে যে ভয় পায় না সে-ই হল প্রকৃত সৈনিক। আমার কোম্পানির পাঁচটি ছেলে পালিয়ে গেছে! তারা যে আমার মনে কত কষ্ট দিয়ে গেছে সে-কথা তোমরা বুঝতে পারবে না। তোমাদের সকলকেই আমি বলছি, তোমাদের যদি কোন কষ্ট হয় আমাকে জানাও, আমি সে কষ্ট দূর করব। আর তা যদি না পারি আমি নিজেই তোমাদের ছেড়ে দেব। কিন্তু এভাবে তোমরা পালিও না! পালিয়ে তোমরা বাঁচতে পারবে না। পুলিশে তোমাদের খুঁজে বার করবেই! মিলিটারী আইনে পলাতকের জন্য যে শাস্তি তা অমানুষিক! সে শাস্তি আমি কাকেও দিতে চাইনা।

ছেলেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছে, যা'ক বাবা, সারাদিন যে একপায়ে দাঁড় করিয়ে রাখেনি, সে-ই তাদের জোরবরাৎ!

মেজর সাহেবের লেকচারের পর মন সকলের হাল্কা হয়ে গেছে। ছেলেরা আবার ছোট ছোট দলে আড্ডা জমিয়েছে। সারাদিনের চাপা-পড়া সমস্ত কথা যেন তুবড়ির মত ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

অমল অস্থির ভাবে মাঠময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। অনেক কথা ঝাঁকবেঁধে তার মনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তাহলে সত্যিই মুভ করতে হবে? সে যেন কিছুতেই খুশী হতে পারছে না। এ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চকতার আকাঙ্খা এই একমাসের সৈনিকজীবনে তার মধ্যে থেকে উবে গেছে!

এই যাওয়াকে কি কোন ভাবেই এড়ান যায় না! মনে পড়ল রসিদের কথা। রসিদতো নিজেই নিজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে! মেজর সাহেবের করুণা আর মিলিটারী আইনের ফাঁকের জন্য অপেক্ষা করেনি! কিন্তু রসিদ পালাল কেন? নিছক মরণের ভয়! না না রসিদ কাপুরুষ নয়। সে মার খেতে পারে আবার লাগাতেও পারে! তবুওতো রসিদ পালাল!

রসিদের অভাবে অমলের কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে! রোল-কলের পর রোজই তারা খানিকটা গল্পগুজব করত। রসিদ বলত তার কৃষক-জীবনের কথা, তার পারিবারিক আচারব্যবহারের কথা, তাদের গ্রাম্য-সমাজের কথা, জমিদার-মহাজনের জুলুম-অত্যাচারের কথা। সে অবাক হয়ে শুনেছে আর ভেবেছে এতবড় একটা জগৎ তার কাছে এমন ভাবে অজানা ছিল কেমন করে!

রসিদ তার পারিবারিক জীবনের কথা কত নিঃসঙ্কোচে বলে গেছে! কয়েকদিন আগে বলেছিল এক আকাল-বছরের কথা। সে বছরে মরেছিল বহুলোক কেবল খেতে না পেয়ে। রসিদ তখন ছোট। কত আবেগ ঢেলে আর গর্বভরে রসিদ বলেছে, কেমন করে তার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে গঞ্জে গিয়ে মোট বহে, লোকের বাড়ী-বাড়ী জন-খেটে কোন রকমে দুমুঠো খেয়ে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল!

অমল ভাবতে চেষ্টা করেছে, এমন অবস্থায় তার বাড়ীর লোকেরা কি করত! তার বাবা, মা, ভাই, বোন, রাস্তায় বার হয়ে গতরে খেটে

অন্নসংস্থান করবে-এ কথা ভাবতেই তার মন কুঁকড়ে উঠেছে! কিন্তু রসিদের সমাজের মত সহজ সমাধানও সে খুঁজে পায়নি।

রসিদের কাছে অমল তার পারিবারিক জীবনের কথা বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করেছে। তাদের বাড়ীর মেয়েরা যে কতখানি অসহায় সে তুলনা তাকে ব্যথিত করেছে। তাদের সমাজের এই পঙ্গুত্ব তাকে রসিদের কাছে অনেক ছোট করে ফেলেছে! তাই সে রসিদের কাছে ঘরের কথা এড়িয়ে গিয়ে বলেছে দেশবিদেশের কথা, তার বইয়ে-পড়া মুখস্থ-করা পরীক্ষার-খাতায়-উগরে-দেওয়া বড় বড় গালভরা কথা!

হঠাৎ অমলের মনে হল সে-ওতো পারে রসিদের মত পালিয়ে যেতে! থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, তা সে কিছুতেই পারবে না। পলাতক হয়ে কাপুরুষের মত মাথা নীচু করে তার বাড়ীতে, তার বন্ধুবান্ধবদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তারা তার সামর্থের, তার ব্যক্তিত্বের মাপে তাকে বিচার করে না। তারা তাকে বিচার করে তাদের প্রত্যাশার মাপকাঠিতে! সেই প্রত্যাশার একতিল এদিকওদিক হলে তারা তাকে তাচ্ছিল্য করবে, নস্যাৎ করে দেবে!

আধ-অন্ধকারে তাঁবুর আশপাশ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অমল যেন আর নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার অজান্তেই সে কখন লক্ষ্য করতে সুরু করেছে কোনখানটায় ডান্ডা-সেন্ট্রী নেই, কোনখানটায় বেড়া ভাঙা, কোনখান দিয়ে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় পেঁছান যায়।

তাড়াতাড়ি অমল মাঠের মধ্যে চলে এল। এক জায়গায় জনকয়েক তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ল।

পাঁচকড়ি বলছে, আল্‌বৎ দেবতা, যে কথা আজ রোল-কলে বলেছেন সে কথা নিজের বাপেও বলে না!

অমল দলটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। একের পর এক প্রত্যেককে লক্ষ্য করতে গিয়ে তার চোখদুটো আটকে গেল শিবদাসের ওপর। কয়েক-পা অমল এগিয়ে গেল। ওদের সাবধান করে দেওয়া দরকার!

অনন্ত বলল, দেবতা কি ভূত তাতে আমাদের লাভ-কি পাঁচকড়ি! আমরা হচ্ছি স্যাপারমানুষ, ওসব হোম্‌রাচোমরা নিয়ে মাথা ঘামানর দরকার কি বাপু।

খগেন বলল, তাবলে একটা মানুষ ভাল হলে তাকে ভাল বলব না?

জয়ন্ত বলল, এখানেতো মানুষের কথা হচ্ছে না! হচ্ছে অফিসারের কথা। তোমার কি আরও অনেক অফিসার দেখা আছে নাকি?

অমলের মনে হল, আলোচনার ধারাটা যেন ঘুরে যাচ্ছে! সে অস্থির হয়ে ওঠে! শিবদাস যে ওদের মধ্যে পরম নির্বিকারভাবে বসে রয়েছে!

খগেন বলল, আমার এক মামাতোভাইয়ের মুখে শুনেছি, তাদের কোম্পানির অফিসাররা 'ব্লাডি বাষ্টার্ড' ছাড়া কথাই বলে না!

পাঁচকড়ি বলে উঠল, আরে বাবা, শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। হাজার হোক মেজর রায় হচ্ছেন একজন বাঙালী, তার শিক্ষাদীক্ষাই আলাদা!

খগেন বলল, শুধু তাই নয়, তার ওপর বিরাট জমিদার, একটা বনেদী বংশের ছেলে! বিলেতেই নাকি ছিলেন বারবছর!

অনন্ত বলল, তোমরা যা যা বললে তা না-ও হতে পারে। জানইতো, অফিসারদের একদল মোসাহেব থাকে তাঁদের গুণকীর্তন করার জন্য।

খগেন রুখে উঠল, মোসাহেবের গুণকীর্তন মানে! এ কথাতো সত্যি, তাঁর মত দিল্‌দরিয়া মেজাজের লোক কোম্পানিতে আর একটীও নেই, বিপদেআপদে তাঁর কাছে গেলে কখনো খালি হাতে ফিরতে হয় না!

জয়ন্ত হঠাৎ ফেটে পড়ল, তোমাদের মনটা সত্যিই কুকুরের মতন! মেজর সাহেব মোলায়েম সুরে দুটোকথা বলেছে আর তোমরাও কুত্তার মতন তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ল্যাজ নাড়তে সুরু করেছ! আশ্চর্য! রসিদের কোয়ার্টার-গার্ডের কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

অমল আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে! শিবদাস কই! শিবদাস উঠে চুপিচুপি যেন কোথায় যাচ্ছে!

খগেন জের টেনে চলেছে, আমার মনে হয় মেজর সাহেব সমস্ত খবর ঠিকভাবে পান না। সেই জন্যইতো বললেন, তাঁকে সমস্ত জানাতে। দেখনা, এইবার সব মিয়া ঠাণ্ডা!

জয়ন্ত বলল, আর একটু সজাগ হতে শেখ খগেন। একদল লোক আছে যারা চোরকে বলে চুরি করতে আবার গেরস্তকে বলে সজাগ থাকতে! মেজর সাহেবের চালটা হচ্ছে ঠিক ওই জাতের!

অমলের চোখ রয়েছে শিবদাসের ওপর। কয়েকটা তাঁবু পর্যন্ত শিবদাস পা টিপেটিপে গিয়ে তারপর দৌড়তে সুরু করেছে! এঁদেরতো কোন খেয়ালই নেই! নিজেদের কথায় সব মশগুল্! কিন্তু শিবদাসতো এতক্ষণে জমাদার সাহেবের কাছে পেঁাছে গেছে। তাহলে উপায়! জয়ন্তকে সমস্ত কথা বলে ওখান থেকে সরে পড়তে বলবে? তাতেই বা কি লাভ হবে! শিবদাসতো সবই নিজের কানে শুনে গেছে। আর শিবদাস যা বলবে তার ওপরতো আর যাচাই চলবে না!

দলটার দিকে কয়েক-পা এগিয়ে গিযে অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর মধ্যে গিয়ে আর লাভ কি! জয়ন্তকেতো আর সে বাঁচাতে পারবে না, মাঝখান থেকে নিজেও হয়তো জড়িয়ে পড়বে। মনে পড়ল ট্রেণিং-ক্যাম্পের কথা। ওঃ, সেদিন সে ভুল না করলে, আজ তার সেকেণ্ড-গ্রেড্ মবে কে! আজ তার মাইনে হত একশ'টাকা!

তখনও ওদের মধ্যে সেই কথারই জের চলেছে। পাঁচকড়ি বলছে, মদ খেলেই মানুষ বদ হয়ে যায় না!

অমল পেছিয়ে যাচ্ছে। আপন মনেই সে বলে ওঠে, নাঃ, ওসব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই!

আরও কয়েক-পা পেছিযে গিয়ে মুখ ফেরাতেই সে স্তম্ভিত হযে গেল। একেবারে মেজর সাহেব স্বয়ং! ব্যাপবটা কি এতই গুরুতর! মেজর সাহেব এত জোবে হেঁটে আসছেন যে জমাদাব দাসগুপ্ত মাঝে-মাঝে দৌড়েও তাল রাখতে পারছে না! দলটাব সামনে এসে মেজর সাহেব দাঁড়িযে পড়লেন।

জমাদার সাহেব এগিয়ে এসে জয়ন্তকে দেখিযে দিলেন। বিস্ময-বিমূঢ দলটার বিস্ফারিত চোখের ওপর জয়ন্তকে সার্টের কলার্ ধরে এক হেঁচকায় টেনে তুললেন মেজর সাহেব। বিবর্ণমুখে জয়ন্ত তাঁর মুখেব দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। দূরে দাঁড়িযে অমল অনুভব কবতে পারেছ, পাদুটো তাব ঠকঠক করে কাঁপছে!

জয়ন্তকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মেজর সাহেব বললেন, কি হে জাপানী স্পাই! জাপানের কাছ থেকে কত মাইনে পাচ্ছ?

জয়ন্ত নীরব। বাকী ছেলেরা পেছন দিকে হেলে পড়েছে!

মেজর সাহেব বললেন, ফিফ্‌থ্‌-কলাম্‌নিষ্টদের জন্য কি ব্যবস্থা জান ?

চোখ তুলে জয়ন্ত মেজর সাহেবের লাল লাল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই উদ্যত মুখের ওপর মেজর সাহেব একটী ঘুঁষি জমিয়ে দিলেন !

জয়ন্তর মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত গড়িয়ে পড়ল গালের কষ বেয়ে, সঙেগ সঙেগ তার মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর।

বাকী ছেলেদের দিকে চোখ রাঙিয়ে মেজর সাহেব বললেন, আমার কোম্পানিতে কোন জাপানী-চর আমি বরদাস্ত করব না।

জয়ন্তর সার্টের কলারটা তিনি ছেড়ে দিলেন। তার শরীরটা ঘাড়-মাথা গুঁজে মাটীর ওপর ধপ করে পড়ে গেল। মেজর সাহেব হাঁকলেন, দাসগুপ্ত ?

ইয়েস স্যার।

ফার্ষ্ট-এইড দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

চার

অমলেব ঘুম ভেঙে গেল দাদার গলাফাটা চিৎকারে! ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসে চোখ রগড়ে চাইল দাদার খাটিয়ার দিকে। গলা সপ্তমে চড়িয়ে দাদা বলছেন, কি ? মনে করেছ কি তোমরা ? আমাদের কি কয়েদী পেয়েছ নাকি ?

লান্স-নায়েক দত্ত বলল, কি করব দাদা, ওপরওয়ালার হুকুম।

দাদা আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, ওপরওয়ালার হুকুম! এইতো রাত বারটার সময় বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠে দাঁড় করালে। কি ? না, রোলকল! বেশ বাবা তাই! আবার এসেছ এই মাঝরাত্তিরে !

লান্স-নায়েক দত্ত বুঝাবার চেষ্টা করল, বুঝলেন না দাদা, যেমন হুকুম তেমন কাজ! চারঘন্টা অন্তর অন্তর রোলকল করতে হবে। আমি কি আর সাধ করে আপনার ঘুম ভাঙাতে এসেছি।

দাদা খেঁকিয়ে উঠলেন, বলে দাওগে তোমার হুকুমওয়ালাদের, ওসব

হুকুম চলবে না আমাদের ওপর। যারা পালিয়েছে তাদের ধরে আনবার মুরোদ নেই, যত জুলুম আমাদের ওপর! কেন রে বাবা!

কিন্তু না গেলে যে জুলুম আরও বাড়বে দাদা! জানেনতো সবই।

আমি যাব না। সাফ কথা বলে দিচ্ছি, কিছুতেই যাব না। তোমরা আমায় ফাঁসি দাও, গুলি করে মেরে ফেল, সেওবি আচ্ছা! আমি যাব না! কক্ষনো না!

হঠাৎ টর্চের আলোয় তাঁবুশুদ্ধ লোক চমকে উঠল! দাদা ছাড়া আর সকলেই তৈরী হয়ে নিয়েছে। সকলের মুখেব ওপর ঘুরে ঘুরে টর্চের আলোটা থেমে গেল লান্স-নায়েক দত্তর মুখের ওপর।

আমি ঠিকই আন্দাজ কর্বেছিলুম—তাঁবুর ভেতবে ঢুকতে ঢুকতে জমাদার দাসগুপ্ত বললেন, লান্স-নায়েক দত্ত ছাড়া এমন প্রেমের ঠাকুরটী আর কে! দেখ দত্ত, এটা দাদা-ভাই করবার জায়গা নয়! মিলিটারীতে কেউ কারও দাদাও নয় ভাইও নয়! তুমি এন-সি-ও, তুমি হুকুম করবে আর ওরা স্যাপাব, ওরা হুকুম তামিল করবে। যদি ওই হাতের ফিতেটা বজায় রাখতে চাও, তাহলে প্রেম না বিলিয়ে বুটের ঠোক্কর দিয়ে কাজ আদায় করতে শেখ, বুঝলে ?

লান্স-নায়েক দত্ত মাথা নীচু করল। সুবেশ আর নবীন ঠকঠক কবে কাঁপছে। অমলের মনে পড়ছে, গতরাত্রে জয়ন্তর অবস্থাব কথা! আর ভাবছে, দাদা কি এখনও নেশার ঝোঁকে আছে!

জমাদার সাহেব বললেন, কে ওটা চেঁচাচ্ছিল। মাতাল বাঁড়ুয্যেটা না।

লান্স-নায়েক দত্ত বলল, হ্যাঁ স্যাব।

এই দেখ, এইসব কুকুরদের কেমন করে সায়েস্তা করতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একলাফে দাদার খাটিয়াব সামনে গিয়ে মশারীটা তাল-গোল পাকিয়ে টেনেহিঁচড়ে খুলে ফেললেন। দাদার চুলেব মুঠি ধরে হিড়হিড় কবে টেনে মাটিতে নামালেন। গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, তোমার মত কুকুরকে ফাঁসিও দিতে হয় না আর গুলিও করতে হয় না! কেবল একটা লাথিই যথেষ্ট!

দাদার পাছায় বুটশুদ্ধ এক লাথি মেরে বললেন, যাও—সোজা রোল-কলে নাহয় কোয়ার্টার-গার্ডে।

হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে দাদা অমলকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। অমল দাদাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কোমরটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। দাদা মাতাল, লম্পট, সবই অমলের মনে পড়ে! তবুও সে দাদাকে গভীর আবেগে নিজের দেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। বারবার তার মনে হয়, দাদাতে আর তাতে কোন প্রভেদ নেই! তারা দুজনেই স্যাপার!

সুবেদার সাহেব রোল-কল নিচ্ছেন। অন্ধকার আকাশের তলায় মাঠের ওপর পাঁচশ লোকের বিরক্তির গুঞ্জন ভনভন করছে। সুবেদার সাহেব হাঁকলেন, রোল-কল, এ্যাটেন—শান—

সমস্ত গুঞ্জন মুহূর্তে মরে গেল। সেকসন-হাবিলদাররা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে নমিন্যাল-রোল দেখে নাম ডেকে চলেছে। ছেলেরা হাজিরা হেঁকে চলেছে।

নামডাকা শেষ হলে সুবেদার সাহেব বললেন, আমি জানি, তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি কি করতে পারি বল! তোমরাই তোমাদের কষ্ট ডেকে এনেছ। তোমাদের মধ্যে থেকে কয়েকটা শয়তান পালিয়ে গিয়ে তোমাদের ওপর এই তকলিফ চাপিয়ে দিয়ে গেছে! এখন থেকে তোমাদেরই নজর রাখতে হবে কে পালাবার মতলব করছে। যাকেই সন্দেহ হবে, সোজা তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে।

রোল-কল ডিসমিস হলে খগেন অমলকে বলল, চলুন আপনার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক। আরতো শোয়া চলবে না, ভোরতো হয়ে এল!

অমল সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গল্প করা মানেই একটা বিপদ ডেকে আনা! তাঁবুতে ঢুকে অমল মশারী খুলে ফেলল। খাটিয়ার ওপর বসে মাথাটা দু' হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরল, মাথার মধ্যে এখনও দপদপ করছে!

খগেন একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, জানেন অমলবাবু, কাল আমার চোখ ফুটেছে। এইবার আমি বুঝতে পেরেছি—

কথা শেষ করতে না দিয়েই অমল খগেনের হাতটা চেপে ধরে বলল, থাক খগেনবাবু, আর ওসব কথায় কাজ নেই!

খগেন বলল, ঠিক বলেছেন অমলবাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন!

চোখদুটো তার স্থির হয়ে গেছে, মাথাটা ঈষৎ দুলছে, অমলের মুখের পানে শূন্যদৃষ্টি মেলে ধরে তখনো বলছে, তাই ঠিক!

হঠাৎ যেন সে চমক ভেঙে বলে ওঠে, তবে কি আমরা বোবা হয়ে যাব! তাহলে বোধহয় আদর্শ সৈনিক হতে পারতাম!

হঠাৎ ফোঁপানির শব্দ শুনে ওরা চমকে ওঠে। দাদা কাঁদছেন!

অমল আর খগেন দাদার মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। দাদা শুয়ে আছেন উপুড় হয়ে বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে। চাপাকান্নায় সমস্ত শরীরটা তাঁর থেকে থেকে ঝাঁকানি দিয়ে উঠছে। দাদা কাঁদছেন! প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ় ছোট্ট একটি ছেলের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! যে পুরুষমানুষ বালকত্বের সীমানা পার হয়ে কান্নাকে মেয়েলি-পণা বলে ভ্রূকুটী করে, সেই কঠিন পুরুষ আজ কান্নায় ফেটে পড়ছে!

খগেন দাদার গায়ে হাত রেখে বলল, ছিঃ দাদা, কাঁদবেন না!

দাদা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, আমার যদি ছেলে থাকত, সে আজ ওই জমাদারের মতই বড় হত। যে আমার ছেলের মতন সে কিনা আমায় লাথি মারল! এ কোথায় আমরা এসেছি! এখানে মানুষ বলে কি কিছুই নেই!

অমল ধীরে ধীরে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। সে অনুভব করতে পারছে, রক্ত তার গরম হয়ে উঠছে। সংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য হাতদুটো মুঠি বেঁধে উঠছে। দাঁতের ওপর দাঁত বসছে চেপে!

বাইরে আকাশের তলায় এসে অমল ধীরে অতি ধীরে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল। পুবের আকাশ থেকে আলোর জোয়ার পশ্চিমের দিকে গাড়িয়ে চলেছে। হাল্কা বাতাস ঝিরঝির করে বইছে। অমল তার দুটী-হাত মাথার ওপর রাখল! ধীরে ধীরে চুলগুলো ধরল মুঠো করে চেপে!

সকাল সাতটা থেকে ফেটীগ।

ষ্টোরের মধ্যে রাজ্যের লোহালক্কড় বোঝাই, সেগুলোকে প্যাকিং-বক্সে বোঝাই করে ওয়াগনে তুলতে হবে। সমস্ত তাঁবু খুলে, পাকিয়ে, বেঁধে, সমস্ত কোম্পানিটাকে গুটিয়ে নিয়ে রেলে চালান দেওয়া—এই হল মুভের

ফেটীগ! এইসব কাজের জন্য দশজন করে লোক আর একজন করে এন-সি-ও নিয়ে এক একটা স্কোয়াড।

জনছয়েক ছেলে আড়াইমণি একটা র‍্যাম্প দড়িতে বেঁধে, বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে; তাদের পেছন পেছন চলেছে ছড়ি-হাতে এন-সি-ও! বেচারীদের কাঁধ যখন জ্বালা করতে শুরু করেছে তখন তারা বোঝাটিকে মাটিতে নামিয়েছে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। পেছন থেকে ছড়ি-হাতে এন-সি-ও টিটকিরি দিয়ে উঠল, ব্যাস এতনাহি! দো কদম যাকেই খতম! সরকার ক্যা ফালতু তুমলোগোঁকো খিলাতা-পিলাতা!

এ সব মন্তব্য গা-সহা হয়ে গেছে! কিন্তু মন যাদের এখনো নরম তারা চট করে গরম হয়ে ওঠে। রাগের মাথায় উত্তর দিয়ে বসে, কুলিকা কাম করনেকে লিয়ে সরকার মুঝকো শ'রুপেয়া তলব নহি দেতা!

এন-সি-ও ক্ষেপে ওঠে, ক্যা, মুহ পর বাত! করো ডবল—

মিনিটদশেক ডবলমার্চ করার পর সেকেণ্ড-গ্রেড স্যাপার-গার্ডের যখন জিভ বেরিয়ে আসে তখন সে বুঝতে পারে মিলিটারী ডিসিপ্লিনের প্রাথমিক শিক্ষা, 'আঁখ খুলো, কান খুলো, মুহ মত খুলো' নিছক কথার কথা নয়! এরই ওপর ভিত্তি করে মিলিটারী ডিসিপ্লিনের বুনিয়াদ মজবুত রাখা হয়েছে!

সেকেণ্ড-গ্রেড গার্ড যখন হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বাঁশটী কাঁধে তুলে নেয় তখন একত্রিশটাকা মাইনের পয়েন্টসম্যান এন-সি-ও খুশীতে ফেটে পড়ে। রেলের আইন অনুযায়ী গার্ডের সে অধস্তন। কিন্তু যখন তারা সৈনিক তখন তফাৎ কেবল র‍্যাঙ্কের। মাইনের দিন সে পায় তিনখানা নোট, আর তার চোখের ওপর দিয়ে স্যাপার-গার্ড দশখানা নোট গুণতে গুণতে চলে যায়! পদমর্যাদার উচ্চতা আর অর্থনৈতিক দীনতা, এই দুয়ে মিলে পয়েন্টসম্যান এন-সি-ও'কে করে তোলে একটি হিংস্র জীব! মেজর রায় এই বৈষম্যের কথা ভালভাবেই জানেন।

সমস্ত দিন ধরে চলে ফেটীগ। স্যাপারের দল বোঝা বহেছে, তাঁবু খুলেছে, ওয়াগন বোঝাই করেছে! ধুলোয় আর ঘামে মিশে গিয়ে চেহারাগুলো তাদের কদাকার হয়ে উঠেছে! এন-সি-ও'রা যথাসম্ভব ধুলো এড়িয়ে, প্যাণ্টের ক্রীজ বাঁচিয়ে, সন্তর্পণে ঘুরেফিরে লোক-

খাটিয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পর বাহবা পেয়েছে তারাই! পদোন্নতির প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে জনকয়েকে!

অফিসারদের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়নি। তাঁরা অফিসার্স-মেসে বসে 'কলকাতায় শেষ দিন' যাপন করেছেন। মেজর রায়ের মেম-মার্কা বাঙালী স্ত্রী এসেছেন, অন্যান্য অফিসাররাও সঙ্গিনী ভাড়া করে এনেছেন! গ্রামোফোনে দম দিচ্ছে আর রেকর্ড চাপাচ্ছে মেস-হাবিলদার চক্রবর্তী। মদের গ্লাসের ঠুংঠুং শব্দে, কাঁটা-চামচের খুটখাট আওয়াজে আর সশব্দ চুম্বনের মাত্রাধিক্যে অফিসার্স-মেস সরগরম। যে ছেলেদের ওপর অফিসার্স-মেসের তাঁবু খুলে প্যাক করার ভার পড়েছে তারা বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অফিসারদের নির্লজ্জ কামোন্মত্ততার পানে!

বেলা তিনটের সময় ফেটীগ শেষ হল। বেলা চারটের সময় আবার রোল-কল। রোল-কলের শেষে সুবেদার সাহেব ভারী গলায় বললেন, আমাদের মিলিটারী জীবন সার্থক হতে চলেছে! আমরা চলেছি লড়াইয়ের মাঠে। আমি চাই, প্রত্যেকটি ছেলে ডিসিপ্লিন মেনে চলবে আর ফুর্তিতে থাকবে।

রোল-কল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল মারার মত গুঞ্জন ধীরে ধীরে কলরবে পরিণত হল। খগেন অমলের মুখের সামনে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, ফুর্তিতে থাকতে হবে! এটাও কি হুকুম নাকি?

অমল খগেনের উত্তেজিত মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, হয়তো তাই! মন খারাপ হলে হয়তো কোয়ার্টার-গার্ডও হতে পারে!

খগেন ক্ষিপ্তের মত ফেটে পড়ল, ফুর্তিও কি এদের স্যাপার নাকি?

অমল খগেনের কাঁধে হাত রেখে বলল, আঃ খগেনবাবু, কি ছেলে-মানষি করছেন!

পলকের মধ্যে খগেন শান্ত হয়ে গেল, সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে আশপাশ দেখে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অমলের দিকে চেয়ে সারা মাঠটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সমস্ত মাঠটা ফাঁকা, কেবল জায়গায় জায়গায় ছেলেরা বিস্তারা-বোঁচি নিয়ে গোল হয়ে বসে জটলা করছে। তারা এই মাঠ ছেড়ে গেলে তাদের কোন চিহ্নও থাকবে না! সমস্ত মাঠ থেকে প্রতিটি জঞ্জাল কুড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

রোল-কল ভাঙার দশমিনিটের মধ্যে আবার হুইশিল পড়ল, তখনও পাঁচটা বাজতে সাতমিনিট বাকী। ছেলেরা কোনরকমে ওয়েব্-ইকুইপ-মেণ্ট দুহাতের মধ্যে গলিয়ে, বেল্ট এ'টে, বিছানা টানতে টানতে ফল-ইন হতে চলল। পাঁচকড়ি আর কিছুতেই ওয়েব-ইকুইপমেণ্টটা বাগে আনতে পারছিল না। একটি ছেলেকে বলল, দাওতো ভাই লাগামটা চড়িয়ে!

পরিয়ে দিতে দিতে ছেলেটি বলল, তা যা বলেছেন! ঘোড়ার মতইতো সারাদিন আমাদের দুঠ্যাঙে দাঁড় করিয়ে রেখেছে!

ধড়াচূড়া পরে ছেলের দল বিছানা কাঁধে গজগজ করতে করতে ফল-ইন করছে। লাইনের মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, শালারা কি আমাদের ঘোড়া পেয়েছে নাকি?

কলরব আর থামতে চায় না। সারাদিনের চাপা রাগ বুঝিবা তখনই বেরিয়ে পড়তে চায়! ছেলেরা যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে! তারা যে এরকম ব্যবস্থা পছন্দ করছে না সেটা তখনই জানিয়ে দিতে চায়। এক-জন চেঁচিয়ে উঠল, আমরা মানুষ না কি!

কে একজন পাশ থেকে বলে উঠল, মানুষ হলে কি আর সারাদিন ঘোড়ার মত দাঁড় করিয়ে রাখে! মানুষ ছিলে মিলিটারীতে ঢোকার আগে!

সেকসন-কমাণ্ডাররা হাঁকডাক সুরু করে দিয়েছে, ডবল-আপ'এর ভয় দেখাচ্ছে, তবুও তারা থামতে চায় না। সুবেদার সাহেব দৌড়ে এসে চিৎকার করে উঠলেন, ক্যা হুয়া ক্যা? কাম্ অন্, পুরা কোম্পানি ডবল-আপ! করো ডবল!

ছেলেরা ভাবে, এটা বোধহয় নিছক ভর্ৎসনা! তাই তারা চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে। সুবেদার সাহেব তেড়ে গিয়ে লাইনের সামনের ছেলেটির হাঁটুতে ষ্টাফ দিয়ে এক-ঘা বসিয়ে দিলেন। ছেলেটি আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। বাকী ছেলেরা দৌড়তে সুরু করল। খানিকটা দৌড়ের পর সকলে যখন আবার যথাস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন জমাদার সাহেব ধবধবে সাদা দাঁতগুলো বার করে বললেন, এই হচ্ছে তোমাদের ঠিক দাওয়াই! কথায় বলে না, যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর!

সমস্ত কোম্পানিটা দাঁড়িয়েছে পাঁচভাগে ভাগ হয়ে।

প্রথমভাগে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দল। মিলিটারীতে ঢুকে এরা হয়েছে বি-ও-আর অর্থাৎ বৃটীশ-আদার-র‍্যাংকস! আইনগতভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে এদের কোন পার্থক্য নেই। তবুও এদের 'বৃটীশ' আখ্যা দেওয়ায় এরাও ভারতীয়দের 'বাষ্টার্ড ইণ্ডিয়ান' বলে থাকে। এদের বেলায় র‍্যাঙ্কের প্রশ্ন ওঠে না, বি-ও-আর মানেই উচ্চতর শ্রেণী! ফেটীগ এদের খাটতে হয় না, বাইরে থেকে কুলি এনে মোট বহায়! সুবেদার, জমাদার ভারতীয় হওয়ায় এদের ওপর তাঁদের হুকুম খাটে না!

দ্বিতীয়ভাগে হেড-কোয়ার্টার-ষ্টাফ অর্থাৎ অফিস বা ষ্টোরের কেরাণী থেকে অর্ডারলি পর্যন্ত। কোম্পানির সাধারণ ছেলেরা এদের পদবীর সঙ্গে একটা 'সাহেব' যোগ করে ডেকে থাকে। অফিসারদের সঙ্গে কাজ করতে করতে এরা অফিসারী চালচলন নকল করতে শিখেছে! গালি-গালাজ হজম করতে করতে সেগুলো প্রয়োগও করতে শিখেছে! অফিসের কাজে উঠতে-বসতে যদিও এরা অফিসারদের কাছে কেবল ঠোকরই খেয়ে থাকে, তবুও সাধারণ ছেলেদের কাছে অফিসারদের সুবিচার, সুযুক্তি আর সুমতির উপাখ্যানই আওড়ে চলে। মাইনে বেচারীদের বড়ই কম, তাই কর্তারা হাবিলদার র‍্যাংক দিয়ে এদের ক্ষেদ মিটিয়ে দিয়েছেন।

তৃতীয়ভাগে ট্রাফিক-ষ্টাফ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই শিক্ষিত, যেহেতু এদের মধ্যে রয়েছে গার্ড, ষ্টেশন-মাষ্টার, সিগন্যালার, টালি-ক্লার্ক ইত্যাদি। সেই জন্যই এরা আলাদা একটা স্তর আদায় করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বারম্বার আঘাত খেয়ে অন্য সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে! মাইনে এদের বেশী, তার ওপর আবার লেখাপড়া জানা! মেজর সাহেব থেকে লঙ্গর-কমাণ্ডার সকলেরই রোখ্ এদের ওপর!

চতুর্থভাগে লোকো-ষ্টাফ। এরা সাধারণত মেহনতকারী মানুষ। শিক্ষার দৌড় এদের খুবই কম। ড্রাইভার, ফায়ারম্যান থেকে আনস্কিলড-স্যাপার পর্যন্ত এই দলভুক্ত। এরা গতরে খাটে, আগুন তাতে পোড়ে, তাই বিশ্রামের সময় একটুআধটু নেশাভাঙ করে শরীর ঝালিয়ে নেয়।

পঞ্চমভাগে ফলোয়াররা। রসুই, জলবাহক, মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি। এরা সাধারণত স্ব স্ব জাতব্যবসাতেই বহাল আছে বলে যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে।

অফিসার মোট পাঁচজন। তাঁদের প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ কাজ আছে। মেজর রায় হলেন অফিসার-কমান্ডিং। ক্যাপ্টেন সাহেব সেকেণ্ড-ইন-কমান্ড। তিনজন লেফটেনান্টের মধ্যে একজন এ্যাডজুটান্ট, একজন ট্রাফিক-ইন-চার্জ আর একজন লোকো-ইন-চার্জ। অফিসারেরা এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হাসিখুশী মুখে গল্পগুজব করছেন।

হাবিলদার-মেজর এ্যাটেনশান হয়ে ষ্টাফটা বাঁ-বগলে চেপে ধরে হাঁকলেন, কোম্পানি, এ্যাটেন—শান—

নিশ্চুপ নিশ্চল পাঁচশ মানুষের পা একটিমাত্র আওয়াজ করে গোড়ালিতে গোড়ালিতে জুড়ে গেল।

হাবিলদার-মেজর কাষ্ঠমূর্তির মত অনড় অটল থেকে কেবলমাত্র চোখটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করে হঠাৎ ধমকের সুরে হেঁকে উঠলেন, সামনে দেখ্—মত হিল্!

আরও কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় অপেক্ষা করে ডানহাতে ষ্টাফটা নিয়ে এ্যাবাউট-টার্ন করে চলতে সুরু করলেন। জমাদার সাহেবের সামনে গিয়ে ডান-পা ঠুকে হল্ট করে, বাঁ-বগলে ষ্টাফটা চেপে ধরে সেলাম করলেন। জমাদার সাহেবও এ্যাটেনশান হয়ে বাঁ-বগলে ষ্টাফটা নিয়ে প্রত্যাভিবাদন জানালেন। হাবিলদার-মেজর রিপোর্ট দিলেন, জমাদার সাহেব শুনলেন। তারপর হাবিলদার-মেজর আবার সেলাম করে, ডান-হাতে ষ্টাফ নিয়ে, লম্বা হাত দুলিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে এ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়ালেন।

পাঁচশ ছেলে আড়ষ্ট হয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে, পাছা শক্ত করে, বুক চিতিয়ে, দুশ'গজ দূরে চোখ রেখে, দেহের দু'পাশে হাত দুটোকে চেপে ধরে। গোড়ালি থেকে মাথার তালু টনটন করছে!

জমাদার সাহেব হাঁকলেন, কো-ম্পা-নি, ষ্ট্যান্ড-এ্যাট-ইজ—

ঝপ করে এক শব্দে ডানপায়ের গোড়ালিগুলো একফুট ফাঁক হয়ে গেল, হাতদুটো চলে গেল পেছনে। একটু অপেক্ষা করে জমাদার সাহেব আবার হাঁকলেন, কো-ম্পা-নি, এ্যাটেন—শান—

তারপর জমাদার সাহেব সেই একই যান্ত্রিক রীতিতে রিপোর্টিং করলেন সুবেদার সাহেবের কাছে। সুবেদার সাহেব রিপোর্ট দিলেন

এ্যাডজন্টান্টের কাছে, এ্যাডজন্টান্ট সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের কাছে আর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অফিসার-কমান্ডিঙের কাছে। একই ছকে-ঢালা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রত্যেকে করে চললেন একের-পর-এক!

পাঁচশ' ছেলের শরীর দিয়ে অঝোরে ঘাম ঝরছে, সমস্ত শরীর টনটন করছে, মাথা ঝিমঝিম করছে!

মেজর সাহেব হাঁকলেন, বি-ও'জ, ফল-ইন—

ট্রাফিক আর লোকো-অফিসার আপন আপন সেকসনের সামনে সুবেদার সাহেবকে পেছনে রেখে দুদিকে দুজন দাঁড়ালেন।

মেজর সাহেব হাঁকলেন, কো-ম্পা-নি, ষ্ট্যান্ড-এ্যাট-ইজ—

তারপর তিনি সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন, সৈনিকদের জীবন একটা আদর্শ মানুষের জীবন। সে তার দেশের মঙ্গলের জন্য দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য, অত্যাচারীকে দমন করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। সে ভাবেনা নিজের কথা! সে ভাবে মাত্র দুটি কথা, শত্রুকে হঠাতেই হবে আর দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতেই হবে। কষ্ট! সৈনিকের জীবনে কষ্ট বলে কিছু নেই! যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, যে মৃত্যুর মুখে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেছে, তার কাছে কষ্ট বলে কিছু থাকতে পারে না!

অমলের মাথা ঝিমঝিম করছে, সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হযে আসছে। মেজর সাহেবের কথাগুলো যেন তার কানের বাইরে ভনভন করছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে খগেন আপন মনে বিড়বিড় করছে, এরা মানুষ না কি! সারাদিন ধরে গাধার খাটুনি খাটিয়ে এখন চালাচ্ছে পাঁয়তারা! একবার কি এদের মনেও হয় না, আমরা মানুষ! আমরা যন্ত্র নই! ওঃ, মা—

অমল শুনতে পেল তার পাশেই ঝপ করে একটা শব্দ! অতি সাবধানে ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখে খগেন ঘাড়-মাথা গুঁজে মাটিতে পড়ে রয়েছে! তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সে খগেনের মাথাটা তুলে ধরতে যায়!

মেজর সাহেব হাঁক পাড়লেন, ইউ ব্লাডি ফুল, ডোণ্ট মুভ!

অমল উঠে দাঁড়াল। অন্য ছেলেরা একটুআধটু ঘাড় বেঁকিয়ে

দেখবার চেষ্টা করে। মেজর সাহেব আবার তাড়া দেন, ষ্ট্যাণ্ড ষ্টিল—

ছেলেরা আবার আড়ষ্ট হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। অব্যক্ত একটা অভিসম্পাত তাদের বুকের মধ্যে গর্জে ওঠে।

মেজর সাহেব হাঁকলেন, কোম্পানি উইল মুভ ইন কলাম অফ রুট —বি-ও-আরস লিডিং—কো-ম্পা-নি, রাইট টার্ণ—

পাঁচশ' ছেলে একই সংগে ডাইনে ঘুরে দাঁড়াল। অফিসাররা মার্চ করে গিয়ে নিজেদের সেকসনের সামনে দাঁড়িয়ে একের-পর-এক হেঁকে চললেন, বাই-দি-রাইট, কুইক—মার্চ—

ঝপঝপ করে একই তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে পাঁচশ' ছেলে। এতক্ষণের অনড় স্তব্ধতা গলে গলে চুঁইয়ে পড়ে! ধারা হয়ে বহে চলে ঝপঝপ শব্দের স্রোতে! জ্ঞানহারা খগেনের বুকের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়ার সময় বারেক ফিরে চায় তার দিকে! যান্ত্রিক গতির তাল পলকের তরে কেটে যায় তবুও উপায় নেই! তাদেরই একজনের জন্য ক্ষণিক বিরতির! দানবীয় এক শক্তির তাড়নায় তারা এগিয়ে চলে, কাটা-তালকে মিলিয়ে নিয়ে, একই তালে পা ফেলে, ঝপ—ঝপ—ঝপ—

ক্যাম্প থেকে ষ্টেশন কোম্পানি মার্চ করে চলেছে।

অমলের মনে পড়ে সিনেমায় দেখা একটা দৃশ্য! সোভিয়েট রাশিয়ার লাল-ফৌজ মার্চ করে চলেছে সহরের সদর রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দুধারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভীড় করে ভেঙে পড়েছে। হাজারে হাজারে রুমাল উড়ছে পতপত করে! তরুণীরা ফুলের গুচ্ছ গুঁজে দিচ্ছে সৈনিকদের বুকে। কত রকমের খাবার এনে দিচ্ছে মায়ের দল! পুরুষেরা করমর্দন করে জানাচ্ছে অভিনন্দন! বাড়ীগুলোর ছাদ-বারান্দা থেকে অঝোরে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে সৈনিকদের মাথার ওপর!

অমল ভাবে, কিন্তু তাদের বেলায় কি দুস্তর প্রভেদ! তারাওতো মার্চ করে চলেছে ফ্রন্ট-লাইনের দিকে! কই কারও মুখে বেদনার কোন চিহ্নতো ফুটে ওঠেনি! অভিনন্দন জানানর কথা বোধহয় কেউ কল্পনাও করেনি! আশপাশের বাড়ীগুলোর বারান্দায় বা জানলায় একটি মেয়ের-ওতো মুখ দেখা যাচ্ছে না! লাল-ফৌজ যদি রাশিয়ার লোকের প্রাণের

পুতুলি হতে পারে তবে বাঙালী-সৈনিক হিসাবে বাঙলা দেশের লোকের কাছে তারা কি?

পাশের ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমরা কি এদের কেউ নই! আমরা চলেছি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, সেতো এদেরই বাঁচাতে!

অমল বলল, সে ভরসা এরা আমাদের ওপর রাখে না। এরা জানে বৃটীশের রাজত্ব বাঁচাতেই আমরা সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছি।

তা না-হয় হল। কিন্তু জাপান যখন দেশ আক্রমণ করবে তখনতো আমরাই তাদের রুখব?

জাপানকে রুখে আমাদের লাভ?

তা বলে জাপানকেও ঘরে ডেকে আনব নাকি!

সামনে একটা বাঁক! হাবিলদার-মেজর ষ্টেপিং দিয়ে চলেছেন, লেফট—রাইট—লেফট—

ষ্টেশনের বাইরে সাইডিং-লাইনে কোম্পানির জন্য স্পেশ্যাল-ট্রেণ প্লেস হয়েছে। সৈন্য-চলাচল নাকি লোকচক্ষুর অন্তরালেই সারতে হয়! সিকিউরিটীর রীতিতে প্রতিটী মানুষই অবিশ্বাস্য।

কোম্পানি মার্চ করে এসে ট্রেণটার পাশে হল্ট করল। এইবার গাড়ীতে ওঠার পালা। প্রতি কামরার গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা কোন গাড়ীতে কোন ক্যাটেগরী আর কতজন। অফিসারদের জন্য ফার্ষ্ট-ক্লাস, বি-ও-আর আর ভি-সি-ও'দের জন্য সেকেন্ড-ক্লাস, হেড-কোয়ার্টার-ষ্টাফের জন্য ইণ্টার-ক্লাস আর বাকী সকলের থার্ড-ক্লাস। ব্রেকভ্যানের সঙ্গে ইণ্টার-ক্লাস কামরায় হয়েছে কোয়ার্টার-গার্ড। তার সামনে খান-পাঁচেক ওয়াগন, চারখানায় মালপত্তর আর একটাতে লঙ্গর।

ছেলেরা বোঁচকাবুঁচকি ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে। বি-ও-আর'রা রাজার জাত, তারা আগেভাগে গাড়ীতে উঠে বসেছে। মেজর সাহেব তাদের কামরার একটা জানলায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছেন। কিন্তু যত বিপদ ভারতীয়দের নিয়ে; তাদের বসবার হুকুম দিলে সিভিলিয়ানদের মনে সৈনিক সম্বন্ধে ভীতি ও শ্রদ্ধা কমে যেতে পারে! সৈনিক ক্লান্ত হয় না, সব অবস্থায় তেজি-ঘোড়ার মত ছুটে চলে, এইটাই প্রামাণ্য বিষয়!

হিসেবপত্র গোণাগিনতি আবার সুরু হল। বি-ও-আর'রা পেয়েছে

মাথাপিছু একটা বার্থ! হেড-কোয়ার্টার-ষ্টাফ বত্রিশজনের কামরায় কুড়িজন! আর স্যাপারদের জন্য যত সীটের কামরা লটবহর-শুদ্ধ তত-জন করে লোক!

গাড়ীতে ওঠার পালা শেষ হল। কামরার মধ্যে কোনমতে জায়গা করে নিয়ে পাঁচকড়ি বুট খুলতে সুরু করেছে। অমল বলল, বুট খুলে কি আবার বিপদে পড়বেন পাঁচকড়িবাবু! হয়তো এখনই রোল-কলের হুইসিল পড়বে!

পাঁচকড়ি থেমে পড়ে বলল, আর পারছি না মশাই, প্রাণ আমার বেরিয়ে যাচ্ছে! খগেনটা দেখছি অজ্ঞান হয়ে তবু খানিকক্ষণ রেষ্ট পেল কিন্তু আমরা কি না মরলে আর রেষ্ট পাব না!

খগেন ফিরে এসেছে। সে সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু এখনও বড় কাহিল। পাঁচকড়ি তার বিছানা পেতে দিল জানলার ধারে অমলের ঠিক পাশেই। অমল নিজের জায়গাটা কমিয়ে নিয়ে খগেনের বিছানাটা বড় করে দিল। খগেন শুয়ে পড়ল। অমলের ইচ্ছে হল খগেনের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেয়।

ছ'টায় চা দেওয়ার কথা, আটটার সময় খানা, ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে ট্রেণ ছাড়বে। অনন্ত মগ হাতে করে ছোঁকছোঁক করে বেড়াচ্ছে, দরজায় দাঁড়িয়ে হা-পিত্যেশে প্ল্যাটফরমের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে, মেজর সাহেবের বোধহয় মতিগতি ফিরেছে রে! তা না-হলে কামরায় কামরায় চা দেওয়ার বন্দোবস্ত!

শিবেন বলল, ও কি আর আমাদের সুবিধের জন্য! পাছে কেউ চা নেওয়ার ফাঁকে কেটে পড়ে সেই ভয়ে!

ক্যাম্প-কেটল্ করে কামরায় কামরায় চা দিয়ে গেল। চায়ের মগে চুমুক দিয়ে আবার যেন সকলে তাজা হয়ে উঠছে। খগেন উঠে বসেছে, অনন্ত তাকে একমগ চা এনে দিয়েছে। পাঁচকড়ি জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে আছে। শিবেন সিগারেটের টিন কাটছে। মনু হ্যাভার-স্যাক থেকে সযত্নরক্ষিত একখানা শুকনো রুটী বার করছে! আর সকলে সেই-দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে!

চায়ের সঙ্গে সিগারেট-বিড়ির ধোঁয়ায় কামরার আবহাওয়াটা ধীরে

ধীরে হাল্কা হয়ে উঠছে। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা স্বরু করেছে। অমল চুপচাপ কোণে ঠেস দিয়ে বসে আছে। চায়ের মগটা উরুর ওপর রেখে সে ভাবছে। মনটা তার উতলা হয়ে উঠেছে বাড়ীর জন্য। লুকিয়ে সে বাড়ীতে একখানা পোষ্টকার্ড লিখেছে তার নিরুদ্দেশ-যাত্রার কথা জানিয়ে। এতক্ষণে বোধহয় সে চিঠি পেঁাছে গেছে! আচ্ছা, ঠাকমা কি করছে? বাবা কি ভাবছেন! মিনি আর রিণিটা কি কাঁদছে!

পাঁচকড়ি প্রশ্ন করল, আচ্ছা, আমরা কোথায় যাচ্ছি বলুনতো?

অমল কাঁধ কুঁচকে অসহায়-ভঙ্গী করল। খগেন বলে উঠল, কোথায় আবার! যমের দক্ষিণ দোরে—আপন মনেই সে গজগজ করে চলল, বাড়ীতে লিখে দিলুম, আজ আমরা যাচ্ছি। তা একজনও এসে দেখা করতে পারলেন না! আর কি কোনদিন দেখা হবে!

পাঁচকড়ি বলল, এসেই বা তাঁরা করবেন কি! তোমার সঙ্গে কি আর দেখা করতে দেবে?

হঠাৎ স্বরাজ চিৎকার করে উঠল, ওরে শিবে, দেখবিতো আয়! চোখ সার্থক হবে মাইরী!

অনন্ত এগিয়ে যায়, কিরে, কি মাইরী!

হুড়মুড় করে কামরাশুদ্ধ ছেলে জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

অনন্ত আক্ষেপ করে, অভাগা, দুনিয়ায় কি কেবল আমরাই বাবা!

পাঁচকড়ি তারিফ করে, খাসা মাল মাইরী!

খগেন বলল, ডেকে জিজ্ঞেস করব নাকি, কাকে খুঁজছে?

স্বরাজ খেঁকিয়ে ওঠে, তাতে আর লাভটা কি! আর যাকেই খুঁজুক আমাদের নিশ্চয়ই নয়!

শিবেন মন্তব্য করল, হ্যাঃ, আমরা হচ্ছি গ্যালারীর লোক, আমাদের ওই দেখাটুকুই লাভ! দেখ, হয়তো মেজর সাহেবের ইয়ে—

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, দূর, এ যে অনেক ছেলেমানুষ! ওই বুড়ো-মড়ার সঙ্গে পট খাবে কেন!

শিবেন জোর দিয়ে বলে, হ্যাঃ, মেয়েদের আবার পট খাওয়া! পয়সা থাকলে আশি বছরের বুড়োর গলায়ও লটকে পড়ে!

পাঁচকড়ি বলল, কক্ষনো না! তারা লটকে পড়ে না, তাদের লটকে

দেওয়া হয়! এই যেমন আমরা মিলিটারীতে ঢুকেছি! লোকে মনে করে মজা লুটবার জন্যই আমরা সোলজার হয়েছি! কিন্তু আমাদের জ্বালা আমরাই জানি!

মেয়েদুটি ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আবার সকলে ফিরে গেল যে যার সীটে। অনন্ত বলল, যাক, আমাদের যাত্রাটা বোধ-হয় শুভ হবে। হয়তো বেঁচেও ফিরতে পারি!

অমল এসব কথাবার্তায় যোগ দেয়নি। এ জাতীয় আলোচনা তার বিশ্রী লাগে। কিন্তু সে-ও মেয়েদুটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। তাদের মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ভেবেছে তার অসার্থক জীবনের কথা, তার প্রবঞ্চিত পৌরুষের কথা! তার একুশবছর জীবনের মধ্যে সে কোন মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি! এমন কি সামান্য একটী চুম্বন, একটু নিবিড় স্পর্শ, দুটো ভালবাসার কথা, কিছুই তার জীবনে সঞ্চয় নেই! তার জীবনে কিচ্ছু নেই!

ট্রেণ ছাড়ল ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে। গাড়ীর মধ্যে বসে দুশ্চিন্তায় মাথা ভারী হয়ে উঠেছে, ক্লান্তিতে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনের প্রথম হেঁচকায় সকলেই ধড়মড় করে উঠে বসল। যারা বাংকের ওপর ছিল তারাও নেমে এসে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

গড়িয়ে গড়িয়ে ট্রেণ এগিয়ে চলেছে। অমল দেখল, ঠুলি-লাগান একটা আলোর তলায় সেই মেয়েদুটী দাঁড়িয়ে। তাদেরই উদ্দেশ করে কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল, চললাম দিদি—

মেয়েদুটীও হাত উঁচু করে রুমাল নাড়ছে! অমলের মনে হল, তাদের চোখের কোলে যেন খানিকটা জল চকচক করছে!

খগেন অমলের কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল, তাহলে সত্যিই আমরা চললুম অমলবাবু! আর কোনদিন এখানে ফিরব কিনা কে জানে!

অমল চমকে খগেনের মুখের দিকে তাকাল! তার মনে হল, খগেনের গলার স্বরে চাপা-কান্নার গুমরানি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে!

একটার-পর একটা আলো পেছনে ফেলে ট্রেণটা ধীরে ধীরে গতি-মান হয়ে উঠছে। নানারকম চিৎকারে-কলরবে নৈশনিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেছে, সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন যেন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে! বিদায়-

জ্ঞাপন যে তারা কার কাছে করে চলেছে তা তারা নিজেরাই জানে না। তারা শুধু জানে এখনও তারা বেঁচে আছে! তারই সাক্ষ্য তারা রেখে যেতে চায় আকাশ-বাতাস, গাছপালা, যা কিছু তাদের দুচোখের ওপর পড়ছে তাদেরই কাছে!

গাড়ীর গতি বেড়ে উঠেছে। ছেলেরা জানলা থেকে ধীরে ধীরে মুখ সরিয়ে নিয়েছে, আবার সকলে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। অমল তখনো নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। তার চোখের ওপর দিয়ে দুরন্ত গতিতে পিছিয়ে পড়ছে কলকাতা সহর, তাদের কলেজবিল্ডিং, তাদের বাড়ীর গলিটা, তারই মোড়ে বকাটে ছেলেদের আড্ডা, রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠাকুমার জপতপ, মিনি রিণির গৃহ-কাজ, বাবার হিসাবলেখা, বিমলের ঝুলঝাড়া, কমলের ষ্টাম্প-মারা ..

ফুরফুর করে অমলের মাথায় হাওয়া লাগছে, তার শ্রান্ত অবসন্ন শরীরটাকে ঘুমে ঘিরে ধরেছে। চোখদুটো সে বাবেকের তরে বন্ধ করল। একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার গালের ওপর! চোখ খুলে আবার সে বাইরের দিকে তাকাল। কি একটা ছোট্ট ষ্টেশনকে ভ্রুক্ষেপ না করে ট্রেণটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তার চোখের ওপব ভেসে উঠেছে সমীরণের বিয়েবাড়ী, সেই বিরাট সিংহাসন, ফুল-লতাপাতা আর আলোর বাহার! সমীরণের নববধূর সেই অকুণ্ঠিত দৃষ্টি যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে! আচম্বিতে তার মনে হল, ওই মেয়েটীর সঙ্গে তারও তো বিয়ে হতে পারত!

অমলের মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যেটা তাব মুচড়ে দুমড়ে কুঁকড়ে গেছে! চুঁইয়ে চুঁইয়ে আরও কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে এল তার চোখ থেকে!

অব যেন অমল নিজেকে সামলাতে পারে না। বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে সে ভেতরে তাকাল। নিষ্প্রদীপ ট্রেণের মধ্যে চাঁদের আলো এসে টেরচা ভাবে পড়েছে। সব ছেলের শোয়ার জায়গা সংকুলান হয়নি, অনেকে মেঝের ওপর বিছানা পেতে শুয়েছে। অমলও দেহটাকে এলিয়ে দিল। শোয়ার জায়গা তারও হয়নি, খগেনকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে

দিতে হয়েছে। কামরার মধ্যে বোধহয় সে ছাড়া আর সকলেই ঘুমোচ্ছে। নাকডাকার মিশ্রিত শব্দে কামরাটা মুখর হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ পাশের কামরা থেকে জনকয়েক গেয়ে উঠল—

বুইড়া কালে নূপুর দিছি পায়!
মাগো মা, ঝিগো ঝি,
কই গেলিগো বোন দিদি,
দ্যাখতে আমায় ক্যামন দ্যাহা যায়!

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে, বারবার গাইছে, ক্রমেই যেন সুর জমে উঠছে! জনকয়েক বুট ঠুকে তাল দিতে সুরু করেছে। কে একজন হেঁকে উঠল, লেফট—রাইট—লেফট—

হোগলা কুসুম ফুইট্যা রইছে,
যমুনার জল উজান বইছে,
এমন চাঁদিনি রাতে পরাণডা মোর কিডা চায়!
দ্যাখতে আমায় ক্যামন দ্যাহা যায়!

উদাত্ত হয়ে উঠেছে গানের সুর। বুটের তালে-তালে, স্টেপিঙের হাঁকে-হাঁকে সুর যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অমল ভাবে, এই গানের কথার সঙ্গে আর তার নতুন এই জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে! ঠিক যেন সে বুঝতে পারছে না, কোথা দিয়ে কেমন করে একটা অসঙ্গতি তার জীবনের মধ্যে সেঁদিয়ে পড়েছে ঠিক ওই বুড়ো-বয়সে নূপুর পরার মত!

মাথাটা অমল কামরার দেয়ালে এলিয়ে দিল, এইবার সে ঘুমোবে। চোখদুটো সে বুজিয়েছে। কিন্তু খুব কাছাকাছি কোথায় যেন একটা চাপা শব্দ গুমরে গুমরে উঠছে? অমল কান খাড়া করল।

হ্যাঁ, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তাদেরই কামরার মধ্যে...

পাঁচ

সকাল হল পার্বতীপুর জংশনে।

ঘুম থেকে উঠে আড়ষ্ট দেহটার ওপর আড়ামোড়া ভেঙে ছেলেরা শরীরটা ঝালিয়ে নিচ্ছে। খগেন পাশ ফিরে শুয়ে বলল, মন্দ কি!

এভাবে ট্রেণে ট্রেণে কিছুদিন কাটাতে পারলে একটু আরাম পাওয়া যাবে! পি-টি, প্যারেডতো আর করতে হবে না।

স্বরাজ জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে প্ল্যাটফরমের হালচাল লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ বলে উঠল, ওরে, ট্রেণ-পিকেটরা গাড়ীতে গাড়ীতে কি যেন বলছে!

শিবেন বলল, বলবে আর কি! পি-টি'র জন্য তৈরী হয়ে নাও!

অনন্ত হেসে ওঠে, দূর, পি-টি এখানে হতেই পারে না।

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে উঠল, তা পারবে কেন! ট্রেণ-পিকেটরা এসে তোমার গা মালিশ করে দিয়ে যাবে! মেট বহে বাছার গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে কিনা!

খগেন বলল, আহা পি-টি করানর অসুবিধেটা কোথায়! প্ল্যাট-ফরমের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলবেখন, 'মেবে লিয়ে হুকুম, তেরে লিয়ে কাম, ওই কাম বিগিন'—ব্যাস, তোমরা নাচতে থাক, ওরা তাল দিতে থাকুক, আর ষ্টেশনশুদ্ধ লোক বাঁদর-নাচ দেখুক!

ট্রেণ-পিকেট কামরার মধ্যে মুখ গলিয়ে বলে গেল, ঔর আধাঘণ্টা বাদ রোল-কল, দো হুইসিলকে সাথ সাথ পুরা ওয়ার্দিমে ফল-ইন—

শিবেন বলল, নাও, সামলাও! পি-টি না হয় রোল-কল! রানিং-ট্রেণ থেকেও কি লোক পালিয়েছে নাকি!

স্বরাজ বলল, আরে বাবা, যে পালাবে সে রানিং কেন ফ্লাইং-ট্রেণ থেকেও পালাবে। সকলেইতো আর আমাদের মত ভেড়া নয়!

দু হুইসিল পড়ল। ছেলেরা কামরা থেকে নেমে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। একজন লান্স-নায়েক তাড়া দিল, এই, ঠিকসে ইন-থ্রিজমে ফল-ইন হো।

শিবেন গজগজ করতে থাকে, শালা পয়েন্টসম্যান, চল একবার বেন্‌গাজি, কাপলিং টাইট করতে করতে হাতের ছালচামড়া উঠে যাবে!

স্বরাজ বলল, ঠিক বলেছিস মাইরী, আমরাতো তখন গার্ড সাহেব, তখন এই শালা এন-সি-ও'গুলোকে দিয়ে 'লাইন বক্স' বহাব।

যথারীতি নাম ডাকাডাকি গোণাগিনতি সুরু হল। ক্যাম্প থেকে ষ্টেশনে আসার পথে দুজন, আর সান্তাহার ষ্টেশনে একজন, মোট আরও তিনজন পালিয়েছে! খগেন বলল, সাবাস, একেই বলে বাপকো বেটা।

পাঁচকড়ি সমস্ত রোল-কলটা লক্ষ্য করে বলল, কেন! বি-ও-আর'দের রোল-কল মাফ কেন?

অনন্ত ফিসফিস করে বলল, বি-ও-আর'দের অনেকেই যে মেজর সাহেবের টেম্পোরারী শ্যালক!

তার মানে!

মানে অতি সরল। মেজর রায় হচ্ছেন রেলের একজন বড় অফিসার আর এই এ্যাংলোগুলো হচ্ছে সেই রেলেরই লোক। তাঁর দৌলতে কেউ হয়েছে ক্লিনার থেকে ড্রাইভার আর কেউ কেউ হয়েছে চেকার থেকে গার্ড! মেজর রায় দক্ষিণাটী নগদ না নিয়ে গায়ে-গায়ে উশুল করেছেন!

রোল-কলের শেষে চা। চা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি হয়ে গেল, চা খাওয়ার সময়টুকু সকলকে পায়চারী করে বেড়াতে হবে! আধ-ঘণ্টা বাদে হুইসিল পড়বে, তখন আবার কামরায় গিয়ে বসবে।

চায়ের সঙ্গে বিস্কিটও দেওয়া হয়েছে। অনন্ত আশপাশে দেখে নিয়ে বলল, জানিস, এগুলো হচ্ছে ডগবিস্কিট!

পাঁচকড়ি বলল, যাঃ!

স্বরজ বলল, তা ঠিকই হয়েছে! আমরাতো ওই পদেরই জীব!

হুকুম-মোতাবিক ছেলেরা পায়চারী করতে করতে চা খাচ্ছে। প্ল্যাট-ফরমের রেলিঙের ধারে ধারে সবক'টী সেন্ট্রী রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ট্রেণ-পিকেটরা সমস্ত প্ল্যাটফরমটার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। মেজর সাহেব থেকে লান্স-নায়েক সকলেই তটস্থ! এই কড়া পাহারার ব্যূহ ভেদ করে আর যেন কেউ পালাতে না পারে!

চা-পান এবং পদচারণা সমাপ্ত হল। এক হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে-যার কামরায় গিয়ে উঠে বসল। বিড়ি, সিগারেট ধরিয়ে আবার তারা ভাবতে থাকে, এর পর কি! নীরব সবকয়টি ছেলের মধ্যে থেকে হঠাৎ অমল প্রশ্ন করে, আচ্ছা, বলতে পার, আমরা কি?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় সকলে অমলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। অমল বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি, এই যে ব্যবহার আমরা পেয়ে চলেছি এমন ব্যবহার কারা পেয়ে থাকে?

খগেন বলল, ও, তাই বল! সকলে খগেনের মুখের দিকে চাইল।

খগেন বলতে লাগল, আমরা হচ্ছি কয়েদী। কয়েদীদের হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখে আর আমাদের রেখেছে বেয়নেটের ডগায়।

অনন্ত বলল, ঠিক বলেছিস মাইরী! তার ওপর জেল-মেট'এর মত এন-সি-ও'গুলো সবসময়ে পেছনে লেগেই আছে!

খগেন অনন্তকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, তারপর, হুকুম ছাড়া একপা চলার অধিকার আমাদেরও নেই! একটা সামান্য ব্যাপার বললেই বুঝতে পারবে। কয়েদীরা স্নান করবে; মেট এসে হুকুম দেবে, 'কয়েদী, থালা বাটি হাত'। কয়েদীরা থালা আর বাটি হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়াবে। মেট তাদের স্নানের জায়গায় নিয়ে গিয়ে জলের সামনে লাইন দিয়ে বসিয়ে দেবে। তারপর হুকুম দেবে, 'তোল বাটি'—কয়েদীরা জল তুলবে। মেট বলবে, 'ঢাল বাটি'—কয়েদীরা মাথায় জল ঢালবে। মেটের মর্জিমাফিক বারকয়েক 'তোল বাটি—ঢাল বাটি' করেই তাদের স্নান সারতে হবে! তাতে তাদের গা ভিজুক আর নাই ভিজুক। বলতে পার, এই কয়েদীদের সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায়?

শিবেন বলল, তফাৎ আর কোথায়! আজ যে ভাবে চা খাইয়েছে, তাতে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

পাঁচকড়ি বলল, আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে গরুর অবস্থাটা আরও ভাল খাপ খায়! সকালবেলায় পাঁচন হাতে গোয়াল থেকে গরু-গুলোকে বার করে নিয়ে গেল। গরুগুলো সারাদিন মাঠে মাঠে চরে বেড়াল। সন্ধ্যেবেলা গুণেগেঁথে গরুগুলোকে আবার খোঁয়াড়ে দিল পুরে। সারাদিন ধরে যা খেয়েছে, গরুগুলো রাতের বেলায় তারই জাবর কেটে চলল। তেমনি আমরাও সকালে পি-টি থেকে সুরু করে রাতে রোল-কল পর্যন্ত মাঠে মাঠে ঘুরলাম, পাঁচন-হাতে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল মেজর সাহেব থেকে লান্স-নায়েকের দল। রোল-কলের পর বিছানায় শুয়ে আমরাও জাবর কাটি, সারাদিন ধরে যত লাথি-ঝাঁটা খেয়েছি, তারই!

সকলেই চুপ! মুখগুলো সব থমথম করছে। নিজেদের যথার্থ রূপটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় হাতড়ে চলেছে দুনিয়ার গভীর কালো গহ্বরটা!

নীরবতা ভঙ্গ করল অনন্ত, আপনার কি মনে হয় অমলবাবু?

অমল চমকে ওঠে। তার গ্রেড-প্রমোশনের আশা, তার জীবনের উন্নতি, তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হুমড়ি খেয়ে চোখের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে! মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে অমল বলতে সুরু করে, খগেনবাবু আর পাঁচকড়িবাবু যা বলেছেন, সে দুটোই আমাদের বেলায় সমান খাটে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোনটাতেই আমাদের সম্পূর্ণ ছবিটা ফুটে ওঠেনি। আমাদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কতকগুলো মানুষকে পশু বানিয়ে ফেলার মত। মানুষ আর পশুতে মিশিয়ে এমন অদ্ভুত একটি জীব আমাদের বানাচ্ছে যাতে শিকল-ছেঁড়ার কথা কোন-দিন মনেও না আসে!

অনন্ত বলল, ঠিক বলেছেন, আমাদের এরা মানুষতো মনে করেই না, আবার পশুও মনে করে না!

পাঁচকড়ি বলল, তবে আমরা কি?

সকলের দিকে চোখ তুলে অমল বলল, আমরা ক্রীতদাস!

ক্ষণেকের জন্য সকলেই বিমূঢ় হয়ে পড়ে। স্তব্ধতায় জায়গাটা গম-গম করে ওঠে। হঠাৎ খগেন সেই স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে চেঁচিয়ে ওঠে, শালারা আমাদের শ্লেভ বানিয়ে রেখেছে!

অমল বলল, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

শিবেন প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন?

অমল বলল, এদের রাজত্ব বাঁচাবার জন্য। এদেরই হাতে যে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন, জীবনধারণের চাবিকাঠি! তাই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে, জিনিসপত্রের দাম চড়িয়ে যে ফাঁদ এরা সৃষ্টি করেছে, আমরা পেটের দায়ে সেই ফাঁদের মধ্যে এসে পড়তে বাধ্য! দিনের-পর-দিন প্রতিটি কাজে, কথায়, চিন্তায় হুকুম মানার ছাঁচে আমাদের ঢালাই করে ফেলছে, পাছে আমরা কোনদিন এই ফাঁদ কাটার চেষ্টা করি! শুধু দুমুঠো খেতে দেওয়ার বিনিময়ে আমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে ফেলছে। কিন্তু এমনই এদের কলকাঠি যে, আমরা নিজেরা এসে মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি! কনস্ক্রিপশন করে আমাদের ধরে আনেনি!

সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে অমলের মুখের

ওপর চোখ মেলে রয়েছে। কি এক বিরাট ষড়যন্ত্র যেন ধীরে ধীরে তাদের চোখের ওপর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। খগেন উঠে পড়ে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে! পাঁচকড়ি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে! শিবেন আস্ত সিগারেটটা আছড়ে ফেলে দিয়েছে! আর অনন্ত চোখ কুঁচকে অমলের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে!

বেলা দশটায় দুইহুইসিল পড়ল। ফেটীগের জন্য পুরা-কোম্পানি ফল-ইন. অবশ্য বি-ও-আর'রা বাদে।

প্ল্যাটফরমে নেমে ছেলেরা দেখল, তাদের ট্রেণ থেকে ব্রেকভ্যান আর ওয়াগনগুলো কেটে দু'নম্বর প্ল্যাটফরমে প্লেস করা হয়েছে। তিননম্বর প্ল্যাটফরম মিটার গেজ লাইনের, সেখানে একখানা রেক দাঁড়িয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন বিস্ময়কর ঠেকে। যেন একটা অদৃশ্য হস্ত অলক্ষ্যে বসে সুতো ধরে টানছে. আর তারা পুতুল-নাচ নেচে চলেছে

একনম্বর থেকে মার্চ করে দুনম্বর প্ল্যাটফরমে উঠল। ওয় গুলোর সবকটারই দরজা খোলা। হাবিলদার-মেজর বললেন, বড় গাড়ীসে সমুচা সামান ছোটা গাড়ীমে লেনে হোগা। সিরফ এতনা কাম! যেতনা জলদি খতম করনে সেকেগা ওতনা জলদি ছুটি!

কে যেন কথা তুলল, তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়!

আর একজন উত্তর দিল, মনে হচ্ছে যেন আসামে!

কেন! কাটিহার দিয়েওতো পশ্চিমের দিকে যাওয়া যায়!

পশ্চিমে কি হাওয়া খেতে যাবে নাকি! লড়ই চলেছে বর্মায়, সেই-খানেই আমদের নিয়ে চলেছে। কেন. শিয়ালদা ষ্টেশনে বর্মা-ইভ্যা-কুয়ীদের ভীড় দেখনি বুঝি! যত শালা লালমুখো সুড়সুড় করে পালিয়ে আসছে!

তাহলে বেনগাজির কথা ভুয়ো!

তাতে আর কি এসে গেল! মরতে যখন হবেই তখন জার্মান আর জাপানীতে তফাৎটা কি!

সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। জাপানীদের মুখোমুখি হতে? দুর্ভেদ্য সিংগাপুর যারা ফুৎকারে দখল করেছে! প্রিন্স-অফ-ওয়েলস

আর রিপালসের মত জাহাজকে যারা পাথরবাটির মত ডুবিয়ে দিয়েছে! ছ'মাসে যারা মালয় থেকে বর্মা দখল করেছে! যাদের হাতে বৃটিশের সাড়াইলক্ষ সৈন্য বন্দী!

বুকের মধ্যে ধড়াসধড়াস করতে থাকে। সেই জাপান, যে আজ ছ' বছর ধরে নিরীহ চীনের ওপর তাণ্ডব চালাচ্ছে! চীনা বন্দীদের ডামি খাড়া করে বেয়নেট-ফাইটিং প্রাকটিস করছে! বুলেট খরচ বাঁচানর জন্য হাজারে হাজারে চীনাকে তলোয়ার দিয়ে বলি দিচ্ছে!

সহরে নিরাপদ আশ্রয়ে বসে খবর-কাগজের পাতায় জাপানীদের বীরত্বে মুগ্ধ হওয়া চলে! জাপানীদের জয়ে উৎসাহিত হয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করা চলে! কিন্তু জীবন বিপন্ন হওয়ার সীমানায় দাঁড়িয়ে আক্রমণকারী জাপানকে বন্ধু ভাবতে মন দমে যায়, বুকে ভরসা জাগে না!

মৃত্যুর বিভীষিকা চোখের ওপর ভেসে বেড়াতে সুরু করে! ডাক ছেড়ে তাদের কাঁদতে ইচ্ছে করে! কী এমন মহাপাতক তারা করেছে যে, মৃত্যু ছাড়া আর তাদের গত্যন্তর নেই! কাঁধের বোঝা মাটিতে নামিয়ে কি- দৃষ্টিতে তারা পালানর উপযোগী একটা সুড়ঙ্গ খুঁজতে থাকে!

কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটীর প্রতিশ্রুতিতেও কাজে উৎসাহ আসে না। তবুও কাজ শেষ হয় এন-সি-ও'দের তাড়ায় আর খিঁচুনিতে। কাজ শেষ হলে হাবিলদার-মেজর আবার তাদের মার্চ করিয়ে এনে কামরায় পুরে দেন। আবার ট্রেণ-পিকেটরা ব্যাটন দুলিয়ে টহল দিতে থাকে।

খগেন বলল, জানিস আমরা মণিপুর যাচ্ছি!

অনন্ত বলল, শেষ পর্যন্ত জাপানীদের হাতেই মরতে হবে!

পাঁচকড়ি বলল, জাপানীরা বাঙালীদের কিছু বলে না। জানিস, সুভাষ বোসতো এখন জাপানেই আছেন।

অনন্ত বলল, যাওয়ার সময় বুঝি তের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

না না, ঠাট্টা নয়! রাসবিহারী বোস নিজে এসে নিয়ে গেছেন। সুভাষবাবুর বাড়ীর সামনে চোদ্দজন করে সি-আই-ডি বসে থাকত! তবুও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে গেছেন!

হঠাৎ একটা হৈ-চৈ শব্দে ষ্টেশন গরম হয়ে উঠল। কামরা থেকে ছেলেরা জানলার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। জমাদার সাহেব একটি

ছেলেকে সার্টের কলার ধরে টানতে টানতে দুনম্বর প্ল্যাটফরমে তুললেন। তারপর চলল তার ওপর চড়চাপড়, ঘুষি, কিল!

মেজর সাহেবকে একজন এন-সি-ও ডেকে নিয়ে এল। জমাদার সাহেব নিরস্ত হয়ে ছেলেটিকে মেজর সাহেবের সামনে খাড়া করে দিলেন। মেজর সাহেব তার চুলের ঝুঁটি ধরে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, মিলিটারীতে ঢোকার সময় মনে ছিল না? এখন ব্লাডি চোরকা মাফিক ভাগতা হ্যায়! ঘরমে ক্যা বহুৎ রুপেয়া জমা হো গয়া?

ছেলেটি মেজর সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব, তোমার বহুৎ ভাল হবে! আমার বড় ডর লাগছে!

মেজর সাহেব ঝটকা মেরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, আঠাশদিন কয়েদ খাটলে সমস্ত ভয়ডর কেটে যাবে—তারপর হুকুম দিলেন টোয়েন্টি-এইট ডেজ আর-আই আর খুব হার্ড ফেটীগ।

ছেলেটী তখনও মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছে। দুজন সেন্ট্রী তার পিঠের ওপর হাত রেখে বলল, চল ভাই!

জমাদার সাহেব খিঁচিয়ে উঠলেন, ওইসা নহি! এইসা বলেই তিনি ছেলেটির জামার কলার ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চললেন। ছেলেটী তখনও একটানা চেঁচিয়ে চলেছে, আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব! তোমার বহুৎ ভাল হবে!

খগেন বলল, তবুও শালাবা আশা করে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা ওদের জেতাব!

পাঁচকড়ি বলল, এবার আর বাছাধনদের জিততে হচ্ছে না। সাধে কি আর কলকাতার লোকে এ-আর-পি কথাটার মানে করেছে, এবার রণে পরাজয়! আমিতো বেঁটে মামাদের দেখলেই হাত তুলে দাঁড়াব।

অনন্ত বলল, সেই ভাল। রামে মারলেও মারবে আর রাবণে মারলেও মারবে! এ শালারা মারবে তিলে তিলে আর জাপানীরা মারবে এক-কোপে! সে হিসেবে জাপানীরাই ভাল!

অমল গুম হয়ে বসে আছে, তার মুখখানা থমথম করছে। শিবেন তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, কি অমলবাবু, অত ভাবছেন কি?

অমল চমকে উঠে বলল, আমি! আমি ভাবছিলুম, মেজর সাহেবের

সেদিনকার রাতের লেকচারের কথা! উনি বলেছিলেন, কেউ যদি থাকতে না পারে উনি নিজেই তাকে ছেড়ে দেবেন। অথচ এখনই চোখের ওপর দেখিয়ে দিলেন ছেড়ে দেওয়ার নমুনা। তাই ভাবছিলুম, যারা মিলিটারীতে থাকতে চায় না, তাদের কেন এরা জোর করে ধরে রাখে!

লালমণিরহাটে ট্রেন ইন করল, বেলা তখন প্রায় সাড়েচারটে।

ট্রেন-পিকেট অনিল কামরার জানালায় এসে দাঁড়াতেই পাঁচকড়ি বলে উঠল, কিহে, আবার ফেটীগ হবে নাকি?

অনিল বলল, কেন আমি বুঝি কেবল ফেটীগের খবরই আনি?

তা ছাড়া আর কি কম্মোটা করছ শুনি?

অনিল অভিমানের স্বরে বলল, যা যা, তোদের সঙ্গে আর কথাই বলব না। ভাবছিস বুঝি এই ব্যাটন-হাতে দারোয়ানী করতে আমার খুব ভাল লাগছে? তোরাতো তবু দশজন এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করছিস্! আর আমি?

পাঁচকড়ি অনিলের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, নারে না, রাগ করছিস কেন শুধুশুধু। ওই ডিউটীতে যতক্ষণ আছিস ততক্ষণই তুই শত্তুর! তারপরতো তোর আমার একই হাল! যাক, কোথায় নিয়ে চলেছে কিছু জানিস নাকি! তোরাতো এখন হাই-কমান্ড মহলে ঘোরা-ফেরা করছিস!

সেই কথাইতো বলতে এসেছিলাম।

আরেঃ তাই নাকি? আয় আয়, ভেতরে এসে বস্। ওরে শিবে, অনিলকে একটা সিগারেট দেরে!

নারে না, ভেতরে যাব না। ওই শালা বেঁটে-খচ্চরটাতো পেছনে লেগেই আছে!

কে? জমাদার সাহেব?

তাছাড়া এমন গুণধরটী আর কে!

অনন্ত উঠে এসে অনিলের কানের কাছে মুখ এনে বলল, দে না অন্ধকারের মধ্যে শালার মাথায় একঘা ব্যাটন কষিয়ে! যেই শালা অজ্ঞান হয়ে পড়বে অমনি দিবি শালাকে চাকার তলায় ফেলে।

অনিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে হয়নারে অনন্ত। ইচ্ছে কি আর হয়না! কিন্তু আমার যে শতেক জ্বালা!

তোর আবার কি জ্বালা হল?

সে আর শুনে কি করবি! সে সব কথা আর লোকালয়ে বলবার মত নয়! মনে হলেই আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

মনের মধ্যে কথা কখনও চেপে রাখতে নেই, তাহলেই অশান্তি বাড়ে। খোলসা করে বলে ফেল মন হাল্কা হয়ে যাবে।

তা যখন বললি, তবে শোন্। লোকের একটা বিয়েই হয় না আর আমার কপালে দু'দুটো! আর দুটোই রয়েছে বেঁচে!

স্বরাজ বলে উঠল, বলিস কিরে, একেই বলে ছপ্পড়-ফুঁড়ে পাওয়া! আর আমরা শালা রাস্তায়ঘাটে প্রেমের-পিত্যেশ-পরদেশী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! কিন্তু এমনই ফাটা কপাল, আজও মাইরী একটা বিয়ে হল না।

অনন্ত স্বরাজকে থামিয়ে দিয়ে বলল, সব কথায় ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে না স্বরাজ, মানুষের মন বুঝে কথা কইতে হয়। যাক্, তুই বল অনিল।

অনিল বলতে লাগল, বছরখানেক আগে আমার প্রথম বিয়ে হয়। বাবার সঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের লাগে খটাখটি পাওনা-থোওনা নিয়ে। বাবাতো রেগে গিয়ে বৌটাকে দিয়ে এলেন তার বাপের বাড়ী! তারপর দুমাস বাদে আবার আমার বিয়ে দিলেন। আর আমায় হুকুম দিলেন, প্রথম বৌয়ের কথা একেবারে ভুলে যেতে। আচ্ছা বলতো, একি কোন মানুষে পারে। মন্তর পড়ে অগ্নি সাক্ষী করে যাকে বিয়ে করেছি তাকে ভুলে গেলে যে নরকেও আমার স্থান হবে না! সে বৌটা এখনও আমাকে লুকিয়ে চিঠি লেখে কিন্তু আমি কি যে করব ভেবে কুল-কিনারা পাই না!

অনন্ত বিষণ্ণ স্বরে বলল, কি আর করবি বল, যা হবার তাতো হয়ে গেছে। বাবা মারা গেলে তাকেও ঘরে নিয়ে আসবি। তাড়িয়ে দিলেইতো আর দায়ীত্ব চলে যায় না! সেতো আর তোকে ছেড়ে যায়নি!

শিবেন বলল, ঠিক বলেছিস অনন্ত, বাপের প্রায়শ্চিত্ত ছেলেকেই করতে হবে! এ নিয়ে আর মন খারাপ করিসনি অনিল। যাক্, কি বলতে এসেছিলি, তাই বল।

কথা বলতে গিয়ে অনিলের গলাটা কেঁপে ওঠে। পকেট থেকে রুমাল

বার করে মুখ মুছতে মুছতে সে চোখটাও মুছে নেয়। তারপর বলে, আমাদের কোম্পানি বোধহয় এখানেই নামবে।

কি করে বুঝলি?

মেজর সাহেব, ক্যাপটেন, এ্যাডজুটাণ্ট আর সুবেদার সাহেব গেছেন ষ্টেশনে। কি একটা জরুরী মেসেজ এসেছে! আচ্ছা, আমি চলি ভাই—

স্বরাজ বলল, তা মন্দ হয় না। জায়গাটাতো বেশ ভাল বলেই মনে হচ্ছে। এত বড় একটা জংশন-ষ্টেশন, বেশ কাজটাজ শেখা যাবে।

পাঁচকড়ি বলল, ক্যাম্পও তাহলে নিশ্চয়ই ষ্টেশনের কাছে পড়বে?

স্বরাজ বলল, সেতো বটেই, আর রেলওয়ে কলোনিওতো একটা দেখলুম। দিনকাল দেখছি ভালই যাবে!

পাঁচকড়ি বলল, মাল-ঝাল এক আধটা নজরে পড়ল নাকি?

চোখেতো পড়েনি! তবে শাড়ীটাড়ী কয়েকটা শুকোতে দেখেছি।

ব্যাস্, তাহলেই হল। শাড়ী যখন আছে তখন তা পরবার লোকও নিশ্চয়ই আছে, কি বল?

দুনম্বর প্ল্যাটফরমে একটা ট্রেণ এসে দাঁড়াল। তার কামরাগুলোতে গাদাগাদি করে লোক বসেছে। একই কামরায় মেয়ে, পুরুষ, সাহেব, মেম, বাচ্চাকাচ্চা সবই আছে। গাড়ীটা দাঁড়াতেই কেউ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, কেউ কঁকিয়ে উঠল, বাচ্চকাচ্চার দল চ্যাঁ-ভ্যাঁ সুরু করে দিল! রেলওয়ে পুলিশ এসে প্রত্যেকটা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল!

পাঁচকড়ি বলে উঠল, এ আবার কি ট্রেণ! সিভিলিয়ানদের পাহারা দেয় কেনরে বাবা!

স্বরাজ চেঁচিয়ে ও-গাড়ীর একজনকে জিজ্ঞেস করল, ও দাদা, শুনছেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

উত্তর এল, বর্মা থেকে!

জাপানীরা বুঝি এসে পড়েছে?

কচু-কাটা করছে!

পাঁচকড়িদের সামনাসামনি কামরা থেকে মাথা বাড়িয়ে এক বৃদ্ধ বমি করতে সুরু করেছে আর এক মহিলা তাঁর মাথায় জল ঢালছে।

খগেন বলল, দেখুন অমলবাবু একবার কান্ডটা! যুদ্ধের দৌলতে

তাহলে শুধু যে আমরা মরব, তা নয়! সিভিলিয়ানরাও বাদ যাবে না!

মেজর সাহেব ষ্টেশনে ফিরেই দেখেন, কামরার মধ্যে বসেই ছেলেরা চিৎকার করে বর্মা-ইভ্যাকুয়ী-ট্রেণের খবরাখবর জানছে। তিনি নিজেই দুহুইসিল বাজিয়ে দিলেন। ছেলেরা লাফাতে লাফাতে প্ল্যাটফরমে নামছে! তাদের ধারণা লালমণিরহাটে ক্যাম্প করার জন্যই এই হুইসিল! ট্রেণ-পিকেটদের কৃপায় সুসমাচারটী থেকে কেউই বঞ্চিত হয়নি।

মেজর সাহেব সুবেদার নন্দীকে বললেন, ঘন্টাখানেক এদের রুট-মার্চ করিয়ে আন। ততক্ষণে নিশ্চয়ই ওই ইভ্যাকুয়ী-ট্রেণটা চলে যাবে!

রঙ্গিয়া জংশন পার হওয়ার পরই দেশের চেহারা যেন বদলে যেতে থাকে! মেঘলা আকাশ। চারিদিকেই জল থৈ-থৈ করছে। লাইনের দুধারে নামাল জমিগুলো জলে ভর্তি আর তার বুক ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে সবুজ ঘাস, মাথা চাড়া মেরে জলের বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে! দূরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘগুলো যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে দিয়ে এসে পড়ছে রোদ্দুর, যেন পালকের মত হাল্কা! উঁচুনীচু মাঠের মাঝে কোথাও চাষীরা টোকা মাথায় লাঙ্গল দিচ্ছে, কোথাও কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে ছিপ ফেলে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আর কোথাও মেছো বক লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে চলেছে শুচিবায়ুগ্রস্ত গ্রাম্য-ব্রাহ্মণের মত!

অমল জানলার ধারে বসে আছে। সারারাত তার ঘুম হয়নি, কেবল মাঝে মাঝে ঢুলেছে। কি এক অজানিত ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে! ভেবেছে তার ফেলে-আসা জীবনের কথা আর অনাগত মৃত্যুর কথা! ভোরের আলো, মেঘলা আকাশের ধূসর রোদ আর লাইনের দুধারে সবুজের সমারোহ আবার যেন তাকে সজীব চঞ্চল করে তুলছে। জানলার ওপর থুতনিটা রেখে সে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

একটা বাঁকের মুখে ট্রেণখানা বেঁকে যেন ধনুকের মত হয়ে যায়। মিটার গেজের ট্রেণ, গাড়ীগুলো মনে হয় যেন দেশলাইয়ের বাক্স! কিন্তু লাইন আর গাড়ী ছোট বলে ট্রেণটা দৈর্ঘ্যে তো কম নয়! অমলের বিস্ময় জাগে, এত সরু লাইনের ওপর দিয়ে এত লম্বা একটা ট্রেণ এত জোরে

চলছে কি করে! কিন্তু ট্রেণতো চলেছে, অবিরাম চলেছে! তিনদিনতো কেটে গেল, তবুও এ চলার কি শেষ নেই!

ট্রেণটা হঠাৎ খনখন ঝনঝন করে একটা ক্রসিং পার হয়ে চলল। তার-পর চলেছে একটা ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে! গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে আসছে। ট্রেণের দুধারে অগনন লাইন, এঁকেবেঁকে এদিকসেদিক কোন দিকে যে চলে গেছে তার যেন আর হদিস্ পাওয়া যায় না! অমল ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে বলল, আমরা বোধহয় এসে পড়লাম।

পাঁচকড়ি জিজ্ঞেস করল, কোথায়!

খগেন বলল, কোথায় আবার! জাহান্নমে।

কাঁচা একটা লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেণটা ধিকিধিকি গড়িয়ে চলেছে।

অনন্ত বলল, এতো বাবা নতুন তৈরী ইয়ার্ড, এর মধ্যে ঢোকাচ্ছে কেন! তবে কি এখানেই নামাবে নাকি!

ট্রেণটা যেখানে গিয়ে থামল সে লাইনটা একেবারে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের ওপর। সীট ছেড়ে ছেলেরা নদীর দিকে গিয়ে বসল। ভরাভর্তি নদ, স্রোতের টানে কচুরীপানা ভেসে চলেছে সাঁইসাঁই করে। দুপারে কত যে ষ্টিমার বোট আর ফেরী তার যেন আর ইয়ত্তা নেই! ট্রেণে বসেই নদের অপর পার দেখা যায়, পাহাড়ের ঢল নেমে এসেছে নদের বুকে! ছেলেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নদীর ওই দুর্বার স্রোতের দিকে চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফুলে ফেঁপে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে! তারাও বুঝিবা এমনিভাবে কেবল চলবে আর চলবে! জীবন তাদের হঠাৎ একদিন থেমে যাবে না! আশা আকাঙ্খার সবকিছুই হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে না......

ছয়

আমিনগাঁও রেলওয়ে-ইন্‌ষ্টিটিউটের মাঠে কোম্পানির তাঁবু পড়ল। মাঠের সামনে পিচঢালা রাস্তা, তার অপর পারেই ব্রহ্মপুত্রের পাড়। মাঠটা ছোট, তাই তার বেড়া ঘেঁষে তাঁবু ফেলেও সবকটা তাঁবু খাটান যায়নি। লোকের অনুপাতে তাঁবু কম, তাই একই তাঁবুতে আঠার থেকে

কুড়িজন করে থাকার হুকুম। বি-ও-আর'দের জন্য ব্যবস্থা হল ইন্‌ষ্টিটিউটের পাকা দালানে!

মাঠের চারিধার ঘিরে তাঁবু পড়েছে। মাঝখানে একটা চালা আগে হতেই ছিল, সেইখানে হল লঙ্গর। অফিস, ষ্টোর, অফিসাব আর ভি-সি-ও'দের তাঁবু পড়ল রাস্তার ধারে, একেবারে নদীর কিনারে। কোয়ার্টার-গার্ডের তাঁবু পড়ল মাঠের গেটে। সন্ধ্যে হওয়া পর্যন্ত ছেলেরা মাঠেব চারধারে কাঁটাতারের বেড়া লাগাল।

আমিনগাঁও একটা টার্মিনাস-ষ্টেশন। ওখানকার আবহাওয়াটাই জমজমাট! একেবারে যে একটা জঙ্গলে এসে পড়েনি একথা ভেবে ছেলেরা খুশী। কেউ খুশী, নতুন জায়গায় নতুন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে বলে, আবার কেউ খুশী সৈনিকজীবনের ফুর্তির খোরাক মদ আর মেয়েমানুষ সুলভ হওয়ার সম্ভাবনায়। সামাজিক জীবের খোরাক রয়েছে ইন্‌ষ্টিটিউটের লাইব্রেরী, ফ্রী-রিডিং-রুম, মাঝে মাঝে গানের জলসা, থিয়েটাবের রিহার্সাল আর সিভিলিয়ান পরিবার-গুলো। আর সৈনিকের খোরাক রয়েছে বিরাট ধাঙগড়বস্তি, দেশীমদ সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। আর মেয়েমানুষ সুলভ হওয়ার কারণ, ওই অঞ্চলের নীচেরতলার মানুষের অসীম দারিদ্র।

ক্যাম্প হওয়ার তৃতীয়দিনে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে চলল ষ্টেশন মাষ্টার, সিগন্যালার আর পয়েন্টস্‌ম্যান রঙিগয়া, সরভোগ আর বরপেটা ষ্টেশনে। সেখানে তারা হাতেনাতে কাজ শিখবে, দরকার পড়লে স্বাধীন ভাবেও কাজ করবে! বারজন গার্ড বুক্‌ করা হয়েছে আমিনগাঁও থেকে লালমণিরহাট সেকসনে রাস্তা চিনতে। আমিনগাঁও লোকো-শেডে কাজে লেগে গেল শেড-ষ্টাফেরা। ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানরা কাজ নিল ইয়ার্ড পাইলটে। নতুন ধরণের এক কর্মব্যস্ততা সমস্ত কোম্পানিটাকে পেয়ে বসেছে। ছেলেরা নিজের নিজের ক্যাটেগরীতে কাজ করতে পেয়ে আর পি-টি, প্যারেড থেকে রেহাই পেয়ে অসীম উৎসাহে মেতে উঠেছে।

টেকনিক্যাল-ডিউটী যাদের কপালে জোটেনি তারা বৃষ্টি না হলে পি-টি, প্যারেড করে, যত রকমের ফেটীগ দরকার হয় সব তারাই করে, কোয়ার্টার-গার্ড ডিউটীও তারা দেয়! তবুও এই শিথিল আবহাওয়ার

মধ্যে ছিদ্র খুঁজে নিয়ে বিকেলে নদীর ধারে ধারে খানিকটা ঘুরে ফিরে বেড়ায়, চোখে ধুলো দিতে পারলে বাজারটাও একপাক দিয়ে আসে!

ডিউটীতে বুক করার সময় প্রথম সুযোগ পেয়েছে বি-ও-আর'রা, তার পর সুবেদার জমাদার সাহেবের পেয়ারের লোকেরা! কাজেই অমল, অনন্ত, পাঁচকড়ি প্রভৃতির আর লাইনে বার হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি! অবশিষ্ট ছেলেদের মধ্যে তারাই উচ্চবেতন আর শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাই চোট এসে পড়ছে তাদেরই ওপর বেশী।

খগেন তাঁবুতে ঢুকে বলল, একটা সুখবর দেব, কে কি খাওয়াবে বল ?

অনন্ত বলল, খবর যদি সাচ্চা হয় একডোজ দিশী খাইয়ে দেব!

না ভাই, ও যেন পোষায় না! বড় গলা-বুক জ্বালা করে!

বুকে যাদের আগুন জ্বলে তারাই ওই জ্বালায় আনন্দ পায়!

পাঁচকড়ি বলল, তোর বুকে বুঝি আগুন জ্বলে অনন্ত? কিসের আগুন বাবা! বেশতো ঢুকুঢুকু চালাও দেখি মাঝে মাঝে!

অনন্ত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাইল। অমল পাঁচকড়িকে বলল, যেতে দাও অনন্তর কথা। খগেন যা বলছিল সেইটাই শোনা যাক।

খগেন বলল, শুনে এলাম, গৌহাটীতে একটা ডিট্যাচমেন্ট শিগগীরই খেলা হবে। সেখানে গার্ড আর ষ্টেশন-মাষ্টার জনকয়েক দরকার হবে।

পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠল, আমি যাব মাইরী। তুই পিটার সাহেবকে বলে-কয়ে করিয়ে দে, তার একরাতের ফুর্তির খরচ আমি দেব! আর পারছি না মাইরী! দিনরাত মুটেমজুরের মত বস্তা বহা আর রাইফেল ঘাড়ে দারোয়ানী করা! সত্যি বলছি, আমি এবার সুইসাইড করব!

খগেন বলল, অমল, তুমি ?

যেতে আমার খুবই ইচ্ছে আছে কিন্তু ঘুষ আমি দিতে পারব না।

তবেই হয়েছে! জানইতো, পিটার সাহেব হচ্ছে মেজর সাহেবের ডানহাত! সেতো ভাই টু-পাইস না নিয়ে কাজ করবে না।

পাঁচকড়ির কোয়ার্টার-গার্ড ডিউটী, সে চলে গেল গাড রুমে। খগেন বলল, যাক্, সে না হয় দেখা যাবেখন। চল, এখন একটু ঘুরে আসি।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে অফিসার্স-মেসের কাছাকাছি এসে ওরা দেখে

তাঁবুর বাইরে অফিসাররা সকলেই বসে আছেন। টেবিলের ওপর দুটো হুইস্কির বোতল আর সকলেরই হাতে গ্লাস।

অমল দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, না ভাই, ওদের সামনে দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। নেশার ঝোঁকে হয়তো সবশুদ্ধ কোয়ার্টার-গার্ডে পুরে দেবে!

খগেন বলল, দূর বোকা, সব কাজেরই ট্যাকটিকস আছে। জানইতো ও শালারা সেলামের কাঙাল! আমরা করব কি, ওদের সামনে দিয়ে পাস করার সময় তিনজনেই একসঙ্গে বকায়দা সেলাম ঠুকে দেব! দেখবে, কোন শালা আর একটী কথাও বলবে না।

দুরুদুরু বুকে ওরা এগিয়ে চলল। অফিসারদের কাছ বরাবর এসে খগেন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আপ—ওরা তিনজনেই বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কপালে হাত তুলে ছ'কদম এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব মদের গ্লাসশুদ্ধ হাত তুলে সেলাম গ্রহণ করলেন।

অমল বলল, বাপস্, যেন আগুনের ওপর দিযে হেঁটে এলুম!

খগেন বলল, কায়দাগুলো শিখে নাও, না হলে মরে যাবে। ফাঁকি যদি না দিতে পার তাহলে ও শালারা দুদিনে সাবড়ে দেবে! হ্যাঁ, তবে ফাঁকি দিতে হবে বুদ্ধি খরচ করে। এই যে আমরা স্যালিউট করে বেরিয়ে এলাম, ও ব্যাটারা ভাবছে আমরা বুঝি ডিউটীতে চলেছি!

ফেরীঘাটের কাছাকাছি এসে অমল বলল, নদী পার হলেইতো গোহাটী যাওয়া যায়। একদিন যেতে হবে বেড়াতে, কি বল অনন্ত?

খগেন বলে ওঠে, কোথায়? তিননম্বর গেটে নাকি?

অমল বলল, কিসের তিননম্বর গেট!

খগেন অনন্তর দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বলল গেটওয়ে-টু-হেভেনস!

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। এতক্ষণে অনন্ত মুখ খোলে, না ভাই অমল, যদি সম্ভব হয় ওই হেভেনসের গেটে কোনদিন যেয়োনা।

খগেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, বলিস কিরে! তুই যে ভোল পালটাচ্ছিস?

অনন্ত কোন উত্তর দেয় না। অমল অনন্তর বিষণ্ণ মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, তোমার কি হল অনন্ত, হঠাৎ এত মুষড়ে পড়লে কেন!

অমলের একটা হাত চেপে ধরে অনন্ত বলল, সে অনেক কথা, এক দিন তোমায় সব বলব অমল!

ওরা সবেমাত্র ফেরীঘাটের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এমন সময় একটা ষ্টীমার এসে আমিনগাঁওর জেটীতে ভীড়ল। ষ্টীমার ভর্তি সৈনিক। অমল জিজ্ঞেস করল, এত মিলিটারী আসছে কোথা থেকে!

খগেন বলল, আর কোথা থেকে! বর্মা থেকে ল্যাজ গুটিয়ে বীরত্বের সহিত পশ্চাদপদ হচ্ছেন!

অনন্ত বলল, কাল কাগজে দেখলুম মণিপুরে জাপানীরা বম্বিং করেছে, অবশ্য ক্ষতি কিছুই হয়নি! কিন্তু এখনতো দেখছি সৈনিকরাই ঝা পালিয়ে আসছে!

খগেন অমলকে ঠেলা দিয়ে বলল, দেখ দেখ, অফিসারগুলো যে সব পাদ্রীসাহেব হয়ে গেছে হে! লম্বা লম্বা দাড়ি, ছেঁড়া জামা আর খালি পা! আহা শুকিয়ে বাছারা চামচিকে হয়ে গেছে!

ফেরী থেকে নেমে খানিকটা বালি ভেঙে পাড়ে উঠতে হয়। পাড় থেকে খানিকটা দূরেই ষ্টেশন। ষ্টেশনের মুখে বিরাট দুই ড্রামে চা আর কয়েকটিন বিস্কিট নিয়ে জনকয়েক লোক বসে আছে। আর-টি-ও'র একজন লেফটেনান্ট সেখানে দাঁড়িয়ে অফিসারদের বিবরণ লিখে নিচ্ছে।

একভাঁড় চা আর একপ্যাকেট বিস্কিট নিয়ে অফিসাররা বালির ওপর বসে পড়ছে। চায়ের ভাঁড়ের দিকে তাকাতেই চোখগুলো তাদের চকচক করে উঠছে! একটা বিস্কিটের সমস্তটাই একবারে মুখে পুরে দিচ্ছে!

অমল বলল, খাওয়ার ধরণ দেখ! কতদিন যেন খেতে পায়নি!

অনন্ত বলল, তা ছাড়া আবার কি! সেদিন একটা অফিসার বলছিল, চৌত্রিশদিন ধরে সে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে স্রেফ চাল চিবিয়ে! ডিমাপুরে পৌঁছে চেষ্টা-চরিত্তির করলে নাকি খাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে বসে গেছে লুটের কারবার! একটা খানা খেতে গেলে লাগবে বস্তা বস্তা টাকা! একবাণ্ডিল বিড়ির দাম উঠেছে পাঁচসিকে!

খগেন বলল, আরে, জানিস না বুঝি? দিনদুই আগে একটা অফিসার, রীতিমত হোমরাচোমরা, কর্ণেল না ব্রিগেডিয়ার কি যেন, সোরাবজীর রেষ্টুরেন্টে এয়সা খাওয়া খেয়েছে যে, তখুনি বমি করতে করতে পটল তুলেছে! সেই থেকে আর-টি-ও কোন ইভ্যাকুয়ী-অফিসারকে আর ওখানে খেতে দেয় না!

অফিসারদের নামার পালা শেষ হলে সাধারণ সৈনিকরা নামতে সুরু করল। নামছে তারা অসীম উৎসাহে কিন্তু চলার ক্ষমতা নেই! শরীরের সমস্ত রস শুকিয়ে গেছে! নামছে ধরাধরি করে আর কেউ নামছে অপরের কাঁধে ভর দিয়ে। কদম রাখার বালাই নেই! ড্রেসিঙের দিকে তাকাবার অবসর নেই! কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দেওয়ারও কেউ নেই! সব আজ বাঁচার তাগিদে আপনসর্বস্ব!

চায়ের জায়গায় এসে জমা হচ্ছে। যার যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে তারই জোরে তারা অন্যকে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। যারা মাটির ওপর বসে পড়েছে তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চা নিয়ে কেউ সবটাই একবারে মুখের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে! তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলে যদি আরও একবার পাওয়া যায়! কতক লোক বমি করতে সুরু করেছে! বহুদিনেব অনশনক্লিষ্ট জঠরে গরম চা দুষ্পাচ্য হয়ে উঠেছে!

অমল বলল, আর কি খেতে দেওয়ার জিনিষ পেল না!

অনন্ত বলল, খেতে দেওয়ার জন্য কি আর দিয়েছে! তাহলে চেয়ে দেখ যারা চা দিচ্ছে তাদের পেছনে ওই সাইনবোর্ডখানা!

বোর্ডখানিতে আঁকা—একজন ভারতীয় সৈনিক খুসীতে-ফেটে-পড়ে ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে! বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ড!

খগেন আঁতকে উঠল, ওঃ, কি সাংঘাতিক! একেই বলে ব্যবসাদার! মৌকা পেয়েছেতো অমনি বিজ্ঞাপন চালাচ্ছে। কিন্তু এই লোকগুলো কি স্বর্গে গিয়ে ওদের চায়ের বাজার বাড়াবে!

তখনও সৈনিকরা নামছে। বাকী মাত্র আব কয়েকজন, তারা দলছাড়া হয়ে পড়েছে! তাদের কেউ নামিয়ে আনার চেষ্টা করেনি, তবু তারা নেমে আসছে টলতে টলতে। পারঘাটার পাটাতনের দড়ি ধরে একপা একপা করে এগিয়ে আসছে! একজন দড়ির শেষপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এর পর কি অবলম্বন করে সে পাড়ে উঠবে! সবশেষের লোকটী আর চলতে পারে না, দড়িটাকে দুহাতে চেপে ধরে এলিয়ে পড়ল পাটা-তনের ওপর!

অমল খগেন আর অনন্ত ওই লোকদুটীকেই লক্ষ্য করছিল। **অমল** বলল, চল আমরা ওদের একটু সাহায্য করি।

নেমে এল ওরা পাটাতনের ওপর। যে লোকটী পাটাতনের শেষ-প্রান্তে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সে খগেনের জামাটা চেপে ধরল। খগেন বলল, আমি একে নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা ওকে নিয়ে এস।

খগেন লোকটীর কোমর জড়িয়ে ধরে তার বাঁহাতটা নিজের গলায় জড়িয়ে নিল। একপা একপা করে তারা পাড়ে উঠছে। খগেনের দম বন্ধ হয়ে আসছে! ওঃ কি বিকট দুর্গন্ধ লোকটার গায়ে! আর জামা-গুলোয় পোকা কিলবিল করছে! লোকটীর কোমর থেকে খগেন হাতটা সরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটী খগেনের গলাটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল! অগত্যা খগেন তাকে জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠতে থাকে।

অমল আর অনন্ত পাটাতনের ওপর পড়ে-যাওয়া লোকটীর পাশে এসে বসল। অমল লোকটীর মাথা তুলে নিল তার উরুর ওপর, ডাকল তাকে অনেক ভাবে কিন্তু কোন সাড়া নেই! চোখের পাতা টেনে দেখে অমল বলল, ষ্ট্রেচার না হলেতো একে ওপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না! এখনও বোধহয় সময় আছে!

অনন্ত বলল, একে শান্তিতে মরতে দাও অমল! আর টানাহেঁচড়া করে কাজ নেই। এমন কত হাজারে-হাজারে বর্মার রাস্তায় বিছিয়ে রয়েছে, তাদের আজ চিলে শকুণে ছিঁড়ে খাচ্ছে!

অমল বলল, না অনন্ত, নিছক অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে একে মরতে দেব না। আজ বুঝতে পারছি, আমাদেরও এই একই পরিণতি! তবুও আমরা বাঁচবার চেষ্টা করব! অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে মরতে যাব না!

অনন্ত চলে গেল ষ্টেশনে। অমল ঝুঁকে পড়ে লোকটির মুদিত চোখের দিকে চেয়ে তার কপালে একটী হাত রাখল। ফেরীঘাট জনশূন্য হয়ে গেছে। টী মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ড বিনামূল্যে চা বিতরণ করে, চা-পানরত সৈনিকদের ফটো তুলে নিয়ে চলে গেছে! নদীর বুকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে সন্ধ্যা। অমলের গা ছমছম করছে। সে ভাবছে, কে এই লোকটি! কোন দেশে এর বাড়ী! এর বাড়ীতেই বা আছে কে কে! কেনই বা মরতে এসেছিল এইভাবে? কিন্তু মরার জন্যতো

লোকটি এখানে আসেনি! এসেছিল বেঁচে থাকার আশায় চাকরি করতে! মরণকে এড়াতে গিয়ে এ কি শোচনীয় মৃত্যুকে সে বরণ করল!

সন্ধ্যে উৎরে গেছে, অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। পাড়ের ওপর থেকে দু'একটা আলোর রেখা ঠিকরে এসে পড়ছে চোখে। ব্রহ্মপুত্রের অবিরাম স্রোত জেটীর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে ধাক্কা খাচ্ছে। নদীর বুকে শুধু অন্ধকার, নিকষ কালো অন্ধকার! অমলের সত্যিই ভয় করছে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, লোকটী আর বেঁচে নেই! তার ইচ্ছে হয়, লোকটির মাথা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু অনন্ত এত দেরী করছে কেন! চোখ কুঁচকে সে তাকাল পাড়ের দিকে। জনকয়েক লোক যেন নেমে আসছে! কথাবার্তার শব্দও আসছে যেন! এইবার তাহলে সে লোকটীর বুকের ওপর কান রেখে দেখতে পারে সত্যিই বেঁচে আছে কিনা!

অনন্ত, খগেন আর দুজন সৈনিক অমলের সামনে এসে বসল।

খগেন জিজ্ঞেস করল, আছে, না শেষ হয়ে গেছে?

অমলের গলা কেঁপে উঠল, নাঃ, নেই!

একজন সৈনিক বলল, থাকবার কথাও নয়। মাটীতে যে একবার পড়ে সে আর ওঠেনা! তার বুকের ওপর পা রেখে আমরা হেঁটে এসেছি!

অমল হঠাৎ ফেটে পড়ে, কিন্তু কেন?

সেই কথাটা আমরাও ভাবি! আমরা কি শুধু মরার জন্যই মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছিলাম! সামনে এগিয়েও মরেছি! পেছু হঠতে গিয়েও মরেছি! আমরা কেবল মরেছি, মরছি, পরেও হয়তো মরব!

অনন্ত বলল, জান অমল, বর্মায় এঁরা ছিলেন আড়াইহাজার লোক। আর আজ এঁরা ফিরে এসেছেন বড়জোর শ'পাঁচেক!

সৈনিক দুজন উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি ওরা তিনজনও উঠে দাঁড়াল। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে, তারই আলোয় ব্রহ্মপুত্রের বুকটা চিকচিক করছে! শিরশির করে হাওয়া দিচ্ছে! অপর পারের ফেরীঘাট থেকে অস্ফুট গুঞ্জণ ভেসে আসছে!

সৈনিকটী বলল, তাহলে আমরা চলি।

অমল লাশটীকে দেখিয়ে বলল, আর একে—

ওঃ, বলে সৈনিকটী তার সাথীকে ডাকল, আয়রে—

দু'জনে নীচু হয়ে লাশটাকে টেনে ফেলে দিল। ব্রহ্মপুত্রের জলে কেবল ঝপাৎ করে একটা শব্দ হল্‌!

ইভ্যাকুয়ীর ভীড় বেড়েই চলেছে, প্রতিদিনই আসছে দলে দলে! এসে জমা হচ্ছে ষ্টেশনে, ওয়েটীং-রুমের চালার তলায়, বাজারের আনাচে-কানাচে, কোন একটু আচ্ছাদনবিশিষ্ট জায়গার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এসে জমা হচ্ছে আবর্জনার স্তূপের মত! ভীড় যত বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা ততই বাড়ছে! মৃতদেহ যখন দু'চারটে হত তখন ষ্টেশনের ধাঙগড়-মেথর সেগুলোকে টেনে নদীতে ফেলে দিত। মৃত্যুর সংখ্যা যখন দিনপ্রতির সংখ্যা ছেড়ে ঘন্টাপ্রতির সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে তখন ধাঙগড়-মেথরের দল উধাও হয়ে গেছে! ঝাঁটপাট দেওয়ার জায়গা নেই, পরিষ্কার করার মত পরিসর নেই! কাজেই তাদের ছুটী। মরা-মানুষ ছড়িয়ে রয়েছে যেখানেসেখানে, তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে, রোদ লাগছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে! প্রথম প্রথম চিল শকুণ জীবন্ত মানুষের কাছাকাছি আসতে ভয় পেত কিন্তু এখন তারা নির্ভয়ে এসে ভোজে বসে যায়!

কোম্পানি-অর্ডারে হুকুম জারি হয়েছে, ষ্টেশন বাজার আর ফেরীঘাট আউট-অফ-বাউণ্ডস্‌! ইভ্যাকুয়ীদের মধ্যে কলেরা লেগেছে। কোম্পানির ছেলেদের ওই এলাকায় যাওয়া, ওখান থেকে কোন জিনিষ কিনে খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। বেলা তিনটের সময় ইনঅকুলেশন প্যারেড! ক্যাম্পের প্রত্যেকটী ছেলেকে এ্যান্টি-কলেরা ইনজেকশন নিতে হবে।

অমল কিন্তু ভেবেছিল অন্যরকম। তার মনে হয়েছিল কোম্পানির প্রতিটী স্পেয়ার ছেলে যদি ফেরীঘাট আর ষ্টেশনে গিয়ে ইভ্যাকুয়ীদের ষ্টিমার থেকে নামতে আর ট্রেণে উঠতে সাহায্য করে তাহলে বোধহয় নিছক ঠেলাঠেলি আর দৌড়দৌড়ি করে মরার হাত থেকে অনেকগুলো মানুষকে বাঁচাতে পারে! আর সেইটাইতো সৈনিকের কাজ!

কোম্পানি-অর্ডার শুনে অমলের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ষ্টেশনে সে যাবেই তাতে তার যাই হোক্‌! দুর্দশা আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের এই সংগ্রাম তার কাছে নতুন এক দুনিয়াকে মেলে ধরেছে। সে কেবল

দেখছে মানুষ! এত রকমের এত বিভিন্ন ধরণের মানুষ সে আর কখনো দেখেনি! তার কলেজী শিক্ষার ছকে-ঢালা মানুষ এরা নয়! এরা জীবন্ত, এরা গতিশীল! সে আরও দেখছে, এই মানুষগুলো কেমন করে বাঁচে! আঘাতে আঘাতে চুরমার হয়ে গিয়েও এরা মরেনা, মরতে জানেনা! কিন্তু কোথায় এদের প্রাণশক্তি!

ওয়েটীঙ রুমের চালার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে অমল ছোট একটী দলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, একজন সধবা মহিলা, একজন প্রৌঢ়া বিধবা আর ছোট একটি মেয়ে! অমল আন্দাজ করে নেয়, কে কি—ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, তাঁর মা আর তাঁর মেয়ে। বাঃ, এমন সম্পূর্ণ একটা পরিবার এ-ক'দিনের মধ্যে তার চোখে পড়েনি! সব সময়েই সে দেখেছে, ভাঙাভাঙা, টুকরোটুকরো ছন্নছাড়া সংসার!

ভদ্রলোক বলছেন, দুধ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি? এক ফোঁটা খাবার জল যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে দুধ কোথায় পাব?

সধবা মহিলা মেয়েটীকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন, কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচাতে হবেতো! রাস্তা থেকে কুড়িয়ে যখন এনেছি তখন যে কোন উপায়েই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে! না হলে মিনু আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবেনা!

অমল কথাগুলো সবই শোনে। কোন কিছু না ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বলল, একটু যদি অপেক্ষা করেন আমি কিছু টীনের দুধ এনে দিতে পারি।

চমকে উঠে ভদ্রলোক অমলের একটা হাত খপ করে চেপে ধরলেন, এত জোরে যে অমলের হাতটা টনটন করে উঠল। অমল বলল, বেশতো, আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন!

ছোট মেয়েটী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল, না কিছুতেই যেয়োনা। ওদের মিথ্যে কথা!

অমল মেয়েটীর দিকে ফিরে চায়! কোল ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার কোটরে-ঢোকা চোখগুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, নাকটা উঠেছে ফুলে! ভদ্রমহিলা তাকে টেনে বসাতে চেষ্টা করছেন।

ভদ্রলোক অমলের পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। বছরদশেক বয়স, কি দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে যে ওর জীবন চলেছে সে বোধহয় আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! মানুষের স্নেহ, ভালবাসার ওপর ওর আর একতিলও বিশ্বাস নেই!

অমলেরও একথা বহুবার মনে হয়েছে। সে দেখেছে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা বলে কোন প্রবৃত্তি যেন এই জগৎটায় নেই! সে সব যেন বইয়ে পড়া নিছক নীতিবাক্য! সেই বর্বরযুগের বাঁচার প্রেরণা নিয়ে কতকগুলো আদিম মানব যেন আজ এক জায়গায় জড় হয়েছে! সে দেখেছে কত মৃত্যু, কত কষ্ট! তবুতো কারও চোখে কান্না আসেনা! মানুষ বুঝিবা কাঁদতে ভুলে গেছে! প্ল্যাটফরমে যখন গাড়ী লাগে, ইভ্যাকুয়ীর দল সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। স্বামীকে ফেলে স্ত্রী আগেভাগে উঠে বসে! মাকে ফেলে ছেলে নিজের জায়গা করে নেয়! সন্তানকে ফেলে মা-বাপ জায়গা খুঁজে নেয়! কারও জন্য কারও দায়ীত্ব নেই! নিজেকে ছেড়ে অন্য কারও কথা চিন্তা করার অবসর নেই! শুধু বেঁচে থাকা! যে কোন উপায়েই হোক প্রাণটাকে ধরে রাখা!

অমল জিজ্ঞেস করল, মেয়েটীকে কোথায় কুড়িয়ে পেলেন?

না না কুড়িয়ে পাইনি, ভগবান ওকে দিয়েছেন! আমরা মহা ভাগ্যবান মশাই! ওঃ, সে এক বিরাট কাহিনী!

ষ্টেশন ছেড়ে বাজারের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পের দিকে ওরা চলেছে। ভদ্রলোক গুম হয়ে আছেন। অমল বারকয়েক তাঁর দিকে ফিরে চাইল। কয়েকটা ঢোঁক গিলে ভদ্রলোক বলতে সুরু করলেন, ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুণে বোমা পড়ল! শুধু বোমা নয়, তার ওপর আবার মেশিন-গান। বহুলোক মারা গেল। আমার ছোটভাই কাজ করত একটা ব্যাঙ্কে, হতভাগ্য বোমার আওয়াজে বাইরে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করতে করতে মেশিন-গানের গুলিতে প্রাণ হারাল! বেচারা বোধহয় আমারই খোঁজে বেরিয়েছিল। তার লাশ আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেদুটো সেই যে স্কুলে গেল আর ফিরলনা। আটবছর আর বারবছরের দুটী ছেলে স্কুল-বিল্ডিং চাপা পড়ে মরল।

—বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। এখনই বর্মা থেকে পালিয়ে চল!

বিরাট কাঠের কারবার ফেঁদেছিলাম, অগাধ পয়সা করেছিলাম, তাই ফেলে আর আসতে পারছিলাম না! আরও দিনকয়েক না দেখে চলে আসতে মন সরছিল না। ভাবলাম, বৃটীশ জাত যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, সে কি আর বর্মা রক্ষে করতে পারবে না! বিশ্বাস ছিল বন্দোবস্ত একটা হবেই। কিন্তু কোথায় কি! এই শুনলাম জাপানীরা টেনাসেরিমে নেমেছে তারপরই শুনি ট্যাভয় দখল করেছে! হু-হু করে এগিয়ে আসছে মৌলমিনের দিকে! আটকাবার কোন ব্যবস্থাই নেই, তার ওপর আবার মিলিটারী সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে! জাপানীরা যখনতখন যেখানে-সেখানে বোমা ফেলছে, একেবারে ছাদ পর্যন্ত নেমে এসে মেশিন-গান্ চালাচ্ছে! মানুষ মরছে ঝাঁকেঝাঁকে! রেঙগুণ সহর লন্ডভন্ড হয়ে গেল! আমার কাঠের গোলাতেও আগুন লাগল!

—ভেবেছিলাম শেষ দেখে যাব। অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছিলাম। তাই ঠিক করেছিলাম, অমন ফলাও কারবার ফেলে পালাব না। আসুক জাপানীরা, তাদের রাজত্বেই বাস করব। আমাদের কাছে বৃটীশ আর জাপানীতে তফাৎটা কোথায়! আমার কারবারটা চালু থাকলেই হল। ভাবতাম, দুটোছেলে মরেছে তাতে কি হয়েছে! আরও দুটো কেন দশটাও হতে পারবে! বয়স আমার এমন কিছু বেশী নয়! কিন্তু অমন কারবার কি আর কোনদিন ফাঁদতে পারব! কিন্তু সে কারবারও গেল, একেবারে পথের ভিখিরী হলাম।

—রেঙগুণ থেকে কিছুদূরে আসার পর ট্রেণের ওপর বোমা পড়ল। যথাসর্বস্ব ট্রেণের মধ্যে ফেলে রেখে কেবল গহনা আর নগদ টাকা কোঁচড়ে বেঁধে রাস্তায় নামলাম। তখন আমরা চারজন—আমি, মা, আমার স্ত্রী আর মিনু, আমার ছ'বছরের মেয়ে। রাস্তা হাঁটতে সুরু করলাম। ট্রেণে বোমা পড়ার পরও যারা মরেনি তাদের সঙ্গে হেঁটে এসে সদর রাস্তায় উঠলাম। সেখানে দেখি, যতদূর চোখ যায় কেবল মানুষের মাথা! মনে বল পেলাম, এত লোক যখন হাঁটছে তখন আমরাইবা পারব না কেন! হাঁটছিতো হাঁটছিই—রাস্তার দুধারে কেবল মড়া আর দুর্গন্ধ! চলতে চলতে একটা গ্রামের ধারে এসে ভাবলাম, গ্রামে ঢুকে একটু বিশ্রাম করব। কিন্তু বর্মিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামের রাস্তা পাহারা দিচ্ছে! গ্রামের মুখ

ছেড়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার পর বর্মি-ডাকাতরা আমাদের ওপর হামলা করল। আমার স্ত্রী গহনার পুঁটলিটা তাদের হাতে তুলে দিলেন! অন্তত দশ-বারহাজার টাকার গহনা!

—ডাকাতের খপ্পরে যারা পড়ল তাদের অনেকেই খুনজখম হল, আর আমরা পাশ কাটিয়ে চলে এলাম। মাঝে মাঝে জাপানী প্লেনের ঝাঁক উড়ে আসে, খুব নীচে নেমে এসে মেশিন-গান থেকে কয়েকপশলা গুলি চালায়। যাদের গায়ে গুলি লাগে তারা পড়ে চেঁচাতে থাকে। যারা অক্ষত থাকে তারা মাটি থেকে উঠে গা-ঝেড়ে আবার হাঁটতে সুরু করে। আটদিন ধরে পথ হাঁটার পর মান্দালয়ে এসে পোঁছলাম। সেখানেও ওই একই অবস্থা! বিশ্রাম আর নেওয়া হলনা। পথে খাওয়া বলে কিছুই হয়নি, মাঝে মাঝে কাঁচা চাল চিবিয়েছি। নালানর্দমা থেকে জল খেয়ে তেষ্টা মিটিয়েছি। ঘুম যে কি জিনিষ তা প্রায় ভুলে গেছি! মিনুর পেট নামাল, ধীরে ধীরে সে দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। মাটীতে নামিয়ে দিলেই তার পা কাঁপতে থাকে! কিন্তু আমরাও তো আর বইতে পারিনা! ছ'বছরের মেয়ে, সে-ওতো এক বিরাট বোঝা! অনেকবার ভেবেছি, ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে পথের ধারে শুইয়ে দেব। এমনতো সকলেই করছে! শেষ পর্যন্ত মিনুর বোঝাও লাঘব হল, রাস্তার ধারে পায়খানা করতে গিয়ে সে একেবারে এলিয়ে পড়ল। মানুষের স্রোত এগিয়ে চলেছে! অপেক্ষা করার অবসর নেই! আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি মিনুর শেষ নিঃশ্বাসটীর জন্য। মিনু ধীরে ধীরে নিঝুম হয়ে পড়ল, চোখ তার বোজা, মুখের দিকে চেয়ে থাকলে বোঝাই যায়না তার নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। আর অপেক্ষা করা যায় না, সঙ্গীর দল অনেকখানি এগিয়ে গেছে! আমাদের দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপও নেই! আমি উঠে দাঁড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও! আবার আমরা যাত্রী-দলে মিশে গেলাম! বারবার মনটা খোঁচা দিয়ে উঠেছে, নাড়িটা একবার টিপে দেখলে হত! কিন্তু দেখিনি যে ইচ্ছে করে, পাছে নাড়িটা তখনও টিপটিপ করে!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমল ভদ্রলোকের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে! আতঙ্কে তার শরীর কাঠ হয়ে যায়! মুখ দিয়ে বেরিয়ে

পড়ে. এ্যাঁ. মিনু তখনও বেঁচে ছিল ?

ভদ্রলোক মাথা নীচু করলেন। মুহূর্তের মধ্যে অমলের চোখের ওপর ভেসে ওঠে রিণির চেহারা! মিনুর জায়গায় রিণির কথা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! প্রাণপণে সে হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ করে।

ক্যাম্পের পেছনে বস্তিটার আড়ালে ভদ্রলোককে দাঁড় করিয়ে অমল বেড়া টপকিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল। ষ্টোর-টেন্টের সামনেই বসে রয়েছে কোয়ার্টার-মাষ্টার-হাবিলদার ভটচায। অমল গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, এখন আর কোন জিনিষ ইসু হবেনা! ষ্টোর বন্ধ হয়ে গেছে।

অমলের নজরে পড়ল তাঁবুর ভেতরে বসে ষ্টোরের অর্ডারলি গুটী-চারেক কমলালেবু রস করছে। আমতাআমতা করে সে বলল. আমি এসেছিলুম একজন বাঙালী ইভ্যাকুয়ী ভদ্রলোকের জন্য কিছু দুধ, পাঁউ-রুটী আর চিনি চাইতে। ভদ্রলোককে ক্যাম্পের পেছনে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। অন্তত কিছু জিনিষ আপনাকে দিতেই হবে। নাহলে ভদ্রলোকের মেয়েটী মারা যাবে!

হাবিলদার ভটচায মিটমিট করে চেয়ে বলল. তাই বলুন. তা নইলে ইভ্যাকুয়ীর ওপর এত দরদ কেন! জিনিস দিতে পারি একটি সর্তে—আমাকেও ভাগ দিতে হবে।

ভাগ! কিসের ভাগ ?

ওঃ একেবারে যে আকাশ থেকে পড়লেন মশাই! ভাগ কিসের তাও বুঝি বোঝেন না। যে মেয়েটীকে দুধ-রুটী খাওয়াতে চলেছেন সেই মেয়েটীর ভাগ।

অমল বিস্ময়ে হাঁ করে হাবিলদার ভটচাযের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হাবিলদার ভটচায বলল. ভাবছিলেন বুঝি. সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার আর শিবের বাবাও টের পাবেনা! আরে মশাই এরকম দুধচিনি আমি রোজই দিচ্ছি! যাক, তা কোথায় জায়গা ঠিক করেছেন ? ওই অসামিয়া লোকটার চায়ের দোকানটায়তো ?

তখনো অমল সেই একইভাবে হাবিলদার ভটচাযের মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে বুঝবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

হাবিলদার ভটচায বলল, কি মশাই. গালে মাছি ঢুকে গেল যে! এ

কারবারে এই হাতেখড়ি বুঝি? আরে মশাই ঘাবড়াবার কিছু নেই! আমাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

ষ্টোরের অর্ডারলি কাঁচের গ্লাসে কমলালেবুর রস এনে হাবিলদার ভটচাযের হাতে দিল। হাবিলদার ভটচায বলল, দাওতো হে এই বাবুকে একটা হাফপাউন্ড রুটী, একটীন দুধ আর খানিকটা চিনি—গ্লাসে কয়েকটা মৃদু চুমুক দিয়ে অমলকে বলল, কিন্তু সাবধানে নিয়ে যাবেন মশাই! ওই শালা কেলেমানিক যদি দেখে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। ও শালার যত রোখ এই আমাদের ওপর অথচ ও'র ব্যাটম্যানটি দিনে অন্তত দশবার আসছে! ঘী-ময়দা দাও, সাহেব লুচি খাবেন! দুধচিনি দাও, সাহেবের পায়স খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে! সে কত বায়নাক্কা —আবার গোটাকয়েক চুমুক দিল কমলালেবুর রসে, আরামে চোখদুটো তার বুজে আসে!

অর্ডারলি জিনিসগুলো একটা কাগজে মুড়ে নিয়ে এল। হাবিলদার ভটচায বলল, নিয়ে যান আর সময় মত আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন।

অমল বলল, আমি যে মেয়েটীর কথা বলছি তার বয়েস দশবছর।

সঙ্গে সঙ্গে হাবিলদার ভটচায বলে ওঠে, ওঃ তাহলে বুঝি অন্য রফা হয়েছে? তা কত টাকায় হল?

অমল শক্ত গলায় বলল, না, কোনরকম রফাই আমি করিনি। দেখলুম মেয়েটির অবস্থা খারাপ, তাই ভদ্রলোককে সঙ্গে করে এনেছিলাম।

অবস্থা ভাল ওই ইভ্যাকুয়ীদের মধ্যে আর কারইবা? তাবলে আপনি ষ্টেশনশুদ্ধ লোককে ক্যাম্পে এনে হাজির করবেন! আরে মশাই এটা হল লড়াইয়ের মাঠ, এখানে ওসব সেণ্টীমেণ্টাল্ ব্যাপার চলে না। জানেন ওই ইভ্যাকুয়ীদের কাছে হাজার হাজার টাকার বর্মা নোট আছে! একটাকার জিনিষের জন্য একটা দশটাকার নোট ওরা অম্লান-বদনে দিয়ে দেবে। আপনি যা জিনিষ দিচ্ছেন তার জন্য পঞ্চাশটাকা ওইভদ্রলোক হাসিমুখে দেবে। আমাকে অন্তত কুড়িটা টাকা দিতে হবে।

অমল বলল, না, থাকগে। জিনিষ আমার চাইনা! ওভাবে টাকা আমি চাইতে পারব না!

কিন্তু সে ভদ্রলোকতো ক্যাম্পের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন?

আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে না-হয় চলে যাবেন!

ওইতো মশাই আপনাদের বোকামি! আরে মশাই, দুনিয়ায় চোখ মেলে চলতে শিখুন। এমন একখানা টিপস দিয়ে দিলুম অনায়াসে টু-পাইস করতে পারতেন। তা না, ভালমানষি আপনাদের আর যেতে চায় না! যাক, ভদ্রলোককে যখন ডেকেই এনেছেন এবারকার মত নিয়ে যান। কিন্তু মনে রাখবেন, গ্রাটিশে কারবার আমি করিনা।

রবিবারের সকালবেলা। ছুটির দিন অর্থাৎ পি-টি প্যারেড বন্ধ! নিতান্ত জরুরী ফেটীগ ছাড়া অন্য সবরকম কাজও বন্ধ! বিস্তারা-ড্রেসিং না করলেও কেউ চোখ রাঙাবে না! ঘুম ভেঙে উঠে প্রথম কাজ চা খাওয়া। অমলকে একমগ চা এনে দিয়ে অনন্ত তার পাশ ঘেঁষে বসল।

অমল বলল, কি অনন্ত, কিছু বলবে নাকি?

অনন্ত বলল, হ্যাঁ, সেদিন তোমায় যে কথাটা বলব বলেছিলুম সেই কথাগুলো না বলে যেন আর পারছিনা!

শিবেন মগ হাতে এসে উপস্থিত হল, তার পেছনে এল সুনীল। অনন্ত চাপা গলায় অমলকে বলল, এখন থাক।

পাঁচকড়িকে দেখা গেল মাঠের মধ্যে। অমল বলল পাঁচকড়িকে ডাকা যাক, শোনা যাবে মণিপুরের হালচাল কি রকম!

বোঁচকাবুঁচকি নামিয়ে রেখে বসতে বসতে পাঁচকড়ি বলল, ওঃ, এই ইভ্যাকুয়ীগুলোর অবস্থা আর চোখে দেখা যায় না!

জয়ন্ত এসেছে পাঁচকড়ির পেছন-পেছন। সে বলে উঠল, ওদের অবস্থাটা তো কেবল দেখবার জিনিষ নয়, ওটা বোঝবারও জিনিষ।

সুনীল বলল, আমিতো বুঝিনা, বর্মা থেকে পালিয়ে এসে রাস্তায়-ঘাটে এভাবে কুকুর-বেড়ালের মত মরবার কি দরকার পড়েছিল!

শিবেনেরও সেই মত, বলল, তা ছাড়া আর কি! জাপানীরা কিছু বলত না। হাজার হোক তারা এশিয়ার লোক, এদের কুকুর-বেড়াল মনে করত না।

অনন্ত বলল, তাতো বটেই! বৃটীশের তরফে থেকে মরছে কুকুরের মত গুলি খেয়ে আর জাপানী তরফে থাকলে মরত বেয়ণেটের খোঁচায়

ই'দুরের মত! মরতে যখন হতই তখন আর পালিয়ে আসার কি দরকার পড়েছিল!

অমল বলল, জাপানীরা কিছু বলত না এ-গল্প বলে আর লাভ নেই। কাল ইভ্যাকুয়ী এক ভদ্রলোক বললেন, জাপানীরা শুধু সহরে বোমা ফেলেনা, রাস্তা দিয়ে যে সমস্ত ইভ্যাকুয়ী হে'টে আসছে তাদের ওপর মেশিন-গানও চালায়।

সুনীল বলে উঠল, সেতো চালাবেই, আর চালানই উচিত! তারা এল এদের বৃটীশের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে আর এ শালারা কিনা কুকুরের মত বৃটীশপ্রভুর পেছন পেছন পালিয়ে আসছে!

জয়ন্ত বলল, তুমি কেবল এদের পালিয়ে আসতেই দেখলে সুনীল! কিন্তু বুঝলে না কেন এরা পালিয়ে আসছে! এরা সকলেই সাধারণ মানুষ, নিজের জীবন ছাড়া আর কোন পুঁজি এদের নেই, নিজেকে বাঁচাবার মত কোন ব্যবস্থাও এদের হাতে নেই! কাজেই পালিয়ে আসা ছাড়া আর কি এরা করতে পারে বল? বিদেশী আক্রমণকারীকে শত্রু না ভেবে বন্ধু মনে করার মত কূট রাজনৈতিক জ্ঞান যে এদের নেই!

সুনীল ফোঁস করে উঠল, ওইতো তোমার দোষ জয়ন্ত। তোমার কেবল বড় বড় কথা! সাধে কি আর মেজর রায়ের কাছে মার খেয়েছিলে!

জয়ন্তর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। অমল অস্বস্তি বোধ করে, অনন্ত বিরক্তিভরে সুনীলের দিকে চায়।

জয়ন্ত বলল, তুমি ভুল করলে সুনীল, বড় কথা আমি একটাও বলিনি। আমি বলেছি সরল সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা। আমি এই কথাই বলতে চেয়েছি যে, আজ যদি আমি হঠাৎ লাঠিসোঁটা নিয়ে তোমার বাড়ীতে চড়াও হই তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সুহৃদ মনে করবে না! আর ওই যে বললে মেজর সাহেবের হাতে মার খেয়েছি, ওতে আমার অপমান হয়নি, আমার গৌরব বেড়েছে! অত্যাচারীকে অত্যাচারী বলার মত সৎসাহস আমার আছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তি আমার আছে!

জয়ন্ত উঠে দাঁড়াল। পাঁচকড়ি বলল, তা তুমি যাচ্ছ কোথায়?

জয়ন্ত যেতে যেতে বলল, না ভাই, এরপর থাকলে তোমাদের আড্ডা-টাই মাটী হয়ে যাবে।

অনন্ত বলল, তোমারইতো দোষ সুনীল। তুমি কেন ফট করে পার্সোন্যাল-এ্যাটাক করে বসলে?

সুনীল বলল, আমি ওর ওই চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

ক্যাম্পের গেট দিয়ে খগেনকে ঢুকতে দেখে পাঁচকড়ি চেঁচিয়ে উঠল, ওরে, ও খগেন, এদিকে আয়রে। শুনি তোর হালচালটা কি?

খগেন এসে পেঁছিলে বলল, মণিপুরে দেখলাম তুই আমার একদিন আগে বেরিয়েছিস! কোন ট্রেন নিয়ে এলি?

পিঠ থেকে প্যাকটা খুলতে খুলতে খগেন বলল, আর কোন ট্রেন, সেই ইভ্যাকুয়ীজ স্পেশ্যাল!

পাঁচকড়ি বলল, আরেঃ আমিওতো একটা ইভ্যাকুইজ স্পেশ্যাল নিয়ে আজ ভোররাত্তিরে ফিরেছি। কিন্তু তুই এই একটা পুরো-দিন কোথায় ডিটেইনড হলি?

একটা বিছানার ওপর শরীরটাকে ছড়িয়ে দিয়ে খগেন বলল, আমার কথা আর বলিসনি। মণিপুরে কোলিং না করেই আমার ট্রেনটায় একটা ইঞ্জিন দিলে লাগিয়ে। ড্রাইভার খুব আপত্তি করেছিল কিন্তু মণিপুরের ও-সি কোয়ার্টার-গার্ডের ভয় দেখিয়ে ড্রাইভারকে দিল জোর করে ইঞ্জিনে তুলে! দলদলিতে এসে সেই যে গাড়ী লুপ-এ ঢুকল তারপর একটি দিন আর নট-নড়নচড়ন। ব্যাস্, ইঞ্জিনও ডেড!

শিবেন বলল, তা ডেড-ইঞ্জিনটাকে নিয়ে গিয়ে মণিপুরের ও-সি'র কাছে পেশ করে দিলি না কেন! কিছুদিন আর্-আই খাটিয়ে দিত সায়েস্তা করে!

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। খগেন বলল, আমাকে একটু চা খাওয়াবি মাইরী, আর যেন পারছি না! যে কাণ্ডটা ব্রেকে ঘটল ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

পাঁচকড়ি বলল, তোর আবার কি ঘটল! আমার কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটেছে এই ডাউন-ট্রিপে!

খগেন বলল, তবে তোরটাই বলতে সুরু কর। আমি ততক্ষণে একটু চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নি।

পাঁচকড়ি বলতে সুরু করে, আমার গাড়ী ছাড়বার কথা টোয়েন্টি-ফিফটিতে ওয়েষ্ট-ট্রুপস-সাইডিং থেকে। রাজ্যের যত খোলা ওয়াগন দিয়েতো দিয়েছে একটা ট্রেন ফর্ম করে। তারই ওপর উঠে বসেছে ইভ্যাকুয়ীর দল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, লোকগুলো বসে বসে ভিজছে! কতক বমি করছে! কেউ কেউ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে, ঠেলাঠেলি, আঁচড়াআঁচড়ি, কামড়াকামড়ি করছে! আর মাঝেমাঝে শোন জঙ্গলের মধ্যে ঝুপ করে একটি শব্দ! তার মানে মড়া ফেলে দিচ্ছে। টোয়েন্টি-ফিফটিতো কোথায়! গাড়ী ছাড়ল প্রায় অড-আওয়ার্সে। সিগন্যাল দিয়ে ব্রেকে উঠে দেখি একটী সাড়ীপরা বর্মি মেয়ে আমার সীটে বসে!

সুনীল বলে উঠল, তাই বল, তাহলে রসের ব্যাপার দেখছি—আরও একটু পাঁচকড়ির গা-ঘেঁষে বসল।

পাঁচকড়ি বলে চলেছে, আমি ইংরেজীতে বললাম ব্রেকভ্যানে মেয়ে-দের নেওয়ার আইন নেই! সে যেন পরের স্টপেজেই নেমে যায়। মেয়েটী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি বাঙালী? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, আমিও বাঙালী! মানে আমার বাবা বাঙালী আর মা বর্মি। আবার তাকে বুঝিয়ে বললাম, কোনমতেই আমি তাকে ব্রেকভ্যানে নিয়ে যেতে পারি না। তা সে কথা কে শোনে! সে তার নিজের কথাই বলে চলেছে—তার বাবা পথে মারা গেছেন, মাকে বর্মি ডাকাতেরা ধরে নিয়ে গেছে! দুটোভাই ছিল, তারা যে কোথায় গেছে তার কোন পাত্তা নেই! আমিতো মহা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। সামনেই লামডিং, হেডকোয়ার্টার ষ্টেশন, যদি কোন অফিসার বা ষ্টাফ দেখে ফেলে! তারওপর মেয়েটীর বয়েসটাও খারাপ, এই উনিশ-কুড়ির মতন!

সুনীল পাঁচকড়ির উরুর ওপর একটা চাপড় মেরে বলে উঠল, তাই বলনা বাবা, বেশ একহাত লুটেছ।

তা আমি কি করব বল। আমার মাথায় ওসব খেয়াল মোটেই আসেনি! ভয়েই আমি আড়ষ্ট যদি কেউ দেখে ফেলে আর কোম্পানিতে

রিপোর্ট করে দেয়! কিন্তু মেয়েটাইতো আমায় চাগিয়ে তুলল! রাঙা-পাহাড় ক্রসিং পার হয়ে গেছি, গাড়ী চলেছে বেশ স্পীডে। মেয়েটী বলল, আমায় কিছু খেতে দিতে পারেন! আজ প্রায় চারদিন একমাত্র জল ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি! আমিতো রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেলাম, মিলিটারী-গার্ডের লাইন-র‍্যাশন একটী মেয়েকে দেব কেমন করে! আমাকে ভাবতে দেখে মেয়েটী বলল, চারদিনের মধ্যে অন্তত চারবারও খেতে পারতাম! কিন্তু যে উপায়ে খেতে হয় তাতে চেষ্টা করি যত কমবার খেয়ে পারা যায়! জিজ্ঞেস করলাম, কি উপায়ে খেতে হয়? মেয়েটী বলল, দেহের বিনিময়ে! আমার বয়েসটা কাঁচা বলে বোধহয় কেউই বিনা প্রতিদানে খেতে দিতে চায় না! কিন্তু আর যেন পারছিনা, গাড়ীর ঝাঁকানিতে পেটের ভেতর মোচড় দিচ্ছে, গা বমি-বমি করছে।

এই কথা শোনার পর মেয়েটীকে ভাল করে দেখার লোভ আর সামলাতে পারলাম না। চোখ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে দেখি মেয়েটী দু'হাতে পেট চেপে ধরে কুঁকড়ে বসে আছে! প্যাক খুলে তার মধ্যে থেকে পাঁউরুটী আর চিনির কৌটো তার সামনে রেখে, ছিপি খুলে ওয়াটার-বটলটা এগিয়ে দিলাম। আলো ঘুরিয়ে দিলাম তার মুখের দিকে। দেখলাম, চোখদুটো তার বসে গেছে, গাল শুকিয়ে গেছে, চুল রুক্ষ, তবুও যেন বেশ পরিপাটী ভাব। মেয়েটা অল্প অল্প করে খাচ্ছে ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে!

দলদলিতে সিগন্যাল দেখিয়ে আমার জায়গায় এসে বসলাম। চুপচাপ থাকতে কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় যাবেন? বলল—চট্টগ্রামে, সেখানেই আমার বাবার দেশ। এর আগে খুব ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম বাবার সঙ্গে। এবার যাচ্ছি একা, বাবা সঙ্গে নেই, তার ওপর আমিই গিয়ে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেব। দেখি কাকারা কি বন্দোবস্ত করেন!

খাওয়া শেষ করে মেয়েটী বলল, আর না, আপনার জিনিষপত্তর তুলে রাখুন। এতক্ষণে যেন শরীরটা ভাল লাগছে! জিনিষপত্তর সব গোছগাছ করে তুলে রেখে দেখি মেয়েটী দেয়ালে মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রয়েছে। আর কিছু না বলে আমার বিছানাটা পেতে দিয়ে

বললাম, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন, লামডিঙে আপনাকে ডেকে দেবখন।

দ্বিরুক্তি না করে মেয়েটি শুয়ে পড়ল। আলোটাকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখে বাইরে মুখ বার করে বসলাম। তখন আমার ট্রেণ নায়লালং পাস করছে। বরাৎ আমার নেহাতই ভাল, ল্যাঙচোলিয়েটও পার হয়ে গেলাম। কিন্তু বারলাঙফার পার হওয়া বৈতরণী পার হওয়ার চেয়েও দুঃসাধ্য ব্যাপার! বারলাঙফারে ট্রেণ ইন করল লুপ-লাইনে, বুঝলাম কপাল পুড়েছে! লামডিঙে পেঁাছনর জন্য প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। হাতবাতিটা নিয়ে উঠলাম ঢিবির ওপর ষ্টেশনে। ষ্টেশন-মাষ্টার বলল, আরে মশাই, ড্রাইভারকে বলে দিয়ে ঘুমোনগে যান, ভোরের আগে আপনার কোন আশাই নেই! লামডিং একেবারে কনজেষ্টেড! ইয়ার্ড ক্লিয়ার না করে ওরা আর কোন গাড়ী নেবে না।

তার মানে, তিনটি ঘণ্টা হাপিত্যেশে বসে থাকতে হবে! ঢিবি থেকে নেমে ব্রেকের দিকে যাচ্ছিলাম। ট্রেণের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনি কেবল গোঙানি আর চিৎকার! লাইনের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ঝুপ করে একটা শব্দ হল। বুঝলাম, কোন গাড়ী থেকে মড়া ফেলে দিয়ে যাত্রীরা আর একটু জায়গা করে নিল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম, ব্রেকে গিয়েই বা আর লাভ কি! সেখানেতো আর ঘুমোবার জায়গা নেই! ফিরে গেলাম ইঞ্জিনের কাছে, ড্রাইভারের সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজব করলাম। তাতেও কি ছাই সময় কাটে! ভাবলাম মেয়েটি বোধহয় এতক্ষণে উঠেছে। এইবার তাকে ব্রেক থেকে নামিয়ে একটা ওয়াগনে তুলে দেওয়া যাক, এর পরইতো লামডিং। ব্রেকে ফিরে দেখি মেয়েটি হুবহু একইভাবে শুয়ে আছে! কেমন যেন খটকা লাগল, মরে যায়নি তো! এ রকমতো কত যায়। বেশ আছে, বসে আছে কিম্বা শুয়ে আছে, কিছুক্ষণ বাদে দেখ, মরে কাঠ হয়ে গেছে!

খগেন মাঝখান থেকে বলে উঠল, আরেঃ, এবারকার ট্রিপে আমার ভাগ্যে একশালা মেজরতো ওইভাবে গেল মরে! কতবার ভেবেছি, দিই শালাকে টান মেরে ফেলে কিন্তু কিছুতেই আর গায়ে হাত দিতে পারলাম না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ছাব্বিশটা ঘণ্টা মড়া আগলে বসে থাকার পর লামডিঙে এসে আর-টি-ও'কে বলতে তবে তারা মড়াটা নামিয়ে নিয়ে

গেল! কিন্তু আর-টি-ও শালা যে আমার নাম নম্বর টুকে নিল! ফাঁসিয়ে দেবেনাতো?

শিবেন বলল, ফাঁসিয়ে দিলেই হল আর কি! ওরকম কতশত মেজর দেখগে যা রাস্তায়ঘাটে পড়ে আছে, আর কাক-শকুণে তাদের ঠুকরে খাচ্ছে! তবে কি জানিস, চলতিগাড়ি থেকে টান মেরে ফেলে দিলেই আর কোন ঝামেলা থাকত না!

সুনীল শিবেনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক ওসব কথা। তারপর বল পেঁচো তোর কারবারটা! হাতের গোড়ায় এমন একটা মাল পেয়ে যখন তুই এত ভেবেছিস তখন তোকে মিলিটারীতে না রেখে বাবাজীর আখড়ায় ট্রান্সফার করে দেওয়া দরকার!

সকলেই পাঁচকড়ির দিকে তাকাল। পাঁচকড়ির মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে ওঠে, আমতা আমতা করে বলল,আমি—মানে আমার—

আড়ামোড়া ভেঙে অনন্ত উঠে দাঁড়াল।

সুনীল বলল, আরে, চললি কোথায়! শেষটা শুনে যা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অনন্ত বলল, শেষ আর কি শুনব' এর শেষ শোনার মত নয়!

সকালের খানা কোনরকমে সেরে অমল একফাঁকে তাবের বেড়াটা টপকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দু'দুটো ইভ্যাকুয়ীজ স্পেশ্যাল এসেছে! এত-ক্ষণে তার সমস্ত লোক নিশ্চয়ই পান্ডু থেকে আমিনগাঁও এসে পড়েছে। পথ চলতে চলতে সে ভাবে, পাঁচকড়ির ব্রেকভ্যানের সেই মেয়েটি যদি এখানে আসত সে নিশ্চয়ই তাকে চিনে নিতে পারত।

বাজারের মধ্যে দিয়ে ষ্টেশনে ঢোকবার পথে অমলের নজরে পড়ে একটা চায়ের দোকান। একজন অসমিয়া চা তৈরী করছে আর তাদের কোম্পানির জনকয়েক ছেলে তার সঙ্গে কথা কইছে। তাহলে এইটিই হল হাবিলদার ভটচাযের ভাগবখবরা বুঝে নেওয়ার ঘাঁটি!

দোকানে ঢুকে অমল এককাপ চা চাইল। ছেলেগুলোও হঠাৎ চুপ করে গিয়ে একেবারে নির্বিকার হয়ে উঠল। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অমল ভাবে, সেই বর্মী-বাঙালী মেয়েটি যে এখানে আসেনি, ভালই

হয়েছে! এলেই হয়তো এদের খপ্পরে পড়ত! হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা মেয়েটি কি পাঁচকড়ির কাছে কোন আপত্তি জানায়নি! বিবরণটা জানার জন্য তার ভীষণ কৌতুহল হয়েছিল কিন্তু অতগুলো ছেলের সামনে এ প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি!

ওয়েটিং-রুমের চালার নীচে এসে অমল দেখল লোক কিলবিল করছে! তিল ধারণের ঠাঁই আর কোথাও নেই। কিন্তু আজকের ভীড়ের যেন একটু বিশেষত্ব রয়েছে! অধিকাংশই আহত, বেশীর ভাগ লোকের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! অমল বুঝল, এই হল জাপানী এ্যান্টী-পার্সোনেল বম্বের মহিমা! যন্ত্রণার গোঙানি আর আর্তনাদে জায়গাটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে!

অমলের ঠিক সামনে এক ভদ্রলোক শুয়ে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছেন আর পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছেন। তাঁর পাশে এক মহিলা নির্বিকার মুখে বসে আছেন। আশপাশের লোকেরা মাঝেমাঝে বিরক্তিভরে ভদ্র-লোকের দিকে কটমট করে চাইছে। অমল ঝুঁকে পড়ে দেখল ভদ্রলোকের ক্ষতস্থানটা রয়েছে খোলা, তার ওপর ধুলোবালি পড়ছে, মাছি বসছে! সমস্ত পা'টা ফুলে যেন কলাগাছ হয়ে উঠেছে আর তার রঙ হয়ে গেছে সিঁদুরের মত লাল! কি করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে অমল ভদ্র-লোকের পাশে বসে টুপি দিয়ে মাছি তাড়াতে থাকে। মহিলাটি বারেক অমলের দিকে ফিরে চাইলেন। সে চাহনি দেখে অমলের কেমন যেন ভয় ভয় করে! এত ঘৃণা সে আর কখনও কোন মানুষের চোখে দেখেনি!

ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠতে সুরু করেছে, দেহটা কাঠ হয়ে আসছে, গোঙানি আর আর্তনাদ থেমে গেছে! পায়ের ফোলা জায়গার সিঁদুরে-লাল রঙ ধীরে ধীরে নীল হয়ে যাচ্ছে! মহিলাটি আর একবার ফিরে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে, তাঁর বিবর্ণ মুখখানা একেবারে উদাসীন হয়ে উঠেছে! আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন টীনের চালাটার বাইরে! অমল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে সেই আড়ষ্ট দেহটার দিকে, ভয়ে সে আবিষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে কি যে কোথা দিয়ে ঘটে গেল সে যেন তখনও বুঝতে পারছে না!

কে যেন আলগোছে তার কাঁধটা চেপে ধরেছে! অমল চমকে পেছন

ফিরে চাইল। জয়ন্ত বলল, এখানে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি! চলুন!

পাশ থেকে একজন প্রৌঢ় অমলকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে, করবার আর কিছু নেই সেপাইজী, বিলকুল সাবাড়! দেখছ না ধণুষ্টঙ্কার! যাক বাবা, বাঁচা গেল! চিৎকার করে কানের পোকা বার করবার জোগাড় করেছিল! আরে বাবা, চেঁচালেই কি আর বাঁচতে পারবি! কলির আয়ু যে শেষ হয়েছে! এইবার সব ধ্বংস হবে—লোকটি একটানা বকে চলল।

অমল জয়ন্তকে বলল, আপনিও এখানে আসেন নাকি? কই আপনাকেতো কোনদিন দেখিনি!

জয়ন্ত চলতে সুরু করে বলল, আপনাকে আমি রোজই দেখি। কিন্তু আপনি থাকেন পরোপকার করার তালে তাই আমাকে দেখতে পান না।

আমিতো কিছুই করতে পারি না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এখানে এসে এদের সাহায্য করা।

জয়ন্ত মুচকে হেসে বলল, ওই যে ভদ্রলোকটির পায়ে বোমার স্প্লিনটার লেগে গ্যাংগ্রীণ হয়ে গেল, ধণুষ্টঙ্কার হয়ে যে লোকটি মরে গেল, আপনি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কি করতে পারলেন? ও লোকটি ঠিকই মরে গেল। মাঝখান থেকে আপনি হয়ে গেলেন মহা-পুরুষ! এইবার সেবাধর্ম আর মানবতা সম্বন্ধে গালভরা বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করবেন!

অমল বিরক্ত হয়ে ওঠে। জয়ন্ত যেন বড় বেশী খোঁচা দিয়ে কথা কয়! সুনীল সকালে নিতান্ত ভুল বলেনি!

জয়ন্ত বলল, তার চেয়ে এক কাজ করুন। ঘুরে ঘুরে দেখুন কোথায় কি ঘটছে, কেমন করে ঘটছে আর কারাই বা ঘটাচ্ছে! সেবা আপনাকে করতে হবে না, ইভ্যাকুয়ীদের দৌলতে কারবার বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে! যুদ্ধের এই কারবারীরা শকুণের মত এসে এদের ছেঁকে ধরবে! ছুটে আসবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি লাখে লাখে টাকা নিয়ে আর হাজারে হাজারে ভাড়াটে-সেবক নিয়ে।

একটা ভীড়ের সামনে এসে অমল দাঁড়িয়ে পড়ে। ইভ্যাকুয়ীর দল

একটা দোকানের সুমুখে ঠেলাঠেলি করছে সামনে যাওয়ার জন্য। ওরা দোকানটার পাশে এসে দাঁড়াল। দোকানটিতে এক মাড়োয়ারী একটি ক্যাশবাক্সের পাশে টাকার থলি আর নোটের তাড়া সাজিয়ে বসে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক নেপালী দারোয়ান একটা দো-নলা বন্দুক হাতে।

অমল জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার!

জয়ন্ত বলল, পুণ্যে কাজ! আর্তের সেবা! বর্মা-নোট এখানে অচল বলে তার বদলে ইনি ভারতীয় নোট বিতরণ করছেন।

অমল বলল, ভালই হল। এখানকার দোকানদারগুলো বর্মা-নোটের বদলে কোন জিনিস বিক্রী করতে চায় না।

ইনি দিচ্ছেন ফ্ল্যাট-রেট—দশটাকায় দুটাকা!

আর আটটাকা?

বেমালুম হজম! শুধু তাই নয়, বর্মা-নোট না থাকলে যে কোন জিনিসের বদলে নগদ টাকা দিচ্ছেন। ওই দেখুন।

এক প্রৌঢ়া মহিলা দুগাছা সোনার চুড়ি ক্যাশবাক্সের ওপর রেখে বললেন, ও বাবা, শুনছ, আমায় পঞ্চাশটা টাকা দিয়ো বাবা, দুগাছা চুড়িতে পাক্কা দু'ভরি সোনা আছে।

মাড়োয়ারী জলদগম্ভীর স্বরে বলল, বিশরুপয়া—বলেই দু'খানি দশটাকার নোট তার হাতে দিল। নোটদুটি নিয়ে ক্ষণেকের জন্য নাড়া-চাড়া করে আবার ক্যাশবাক্সের ওপর রেখে দিয়ে মহিলাটি বললেন, না বাবা, কুড়িটাকায় দিতে পারব না, তুমি আমার চুড়ি ফেরৎ দাও!

চুড়ি দুগাছা ততক্ষণে ক্যাশবাক্সের মধ্যে চলে গেছে! মাড়োয়ারীজী অভ্যর্থনার হাসি হেসে পরের লোকটিকে বলল, বলিয়ে—আপকো—

মহিলাটি চটে উঠেছেন, আমার চাই না টাকা। ওরে বাবা, এ যে ডাকাতরে বাবা! করকরে দুভরি সোনার জন্য দিচ্ছে কিনা কুড়িটাকা!

পরবর্তি লোকটি তার শেষ সম্বল পাঁচখানি দশটাকার বর্মা-নোটের বিনিময়ে একটি ভারতীয় দশ-টাকার নোট নিয়ে চলে গেল। তার পরের লোকটি এগিয়ে গেল ক্যাশবাক্সের দিকে।

মহিলাটি ততক্ষণে ক্ষেপে গেছেন! সামনের লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাড়োয়ারীটির হাত চেপে ধরলেন, ভাল চাও তো আমায়

পঞ্চাশটাকা দাও বলছি! না-হয় আমার চুড়ি ফেরৎ দাও! নইলে আমি এখানে কুরুক্ষেত্তর বাঁধাব! জান আমার ছেলে দারোগা, আসছে সে পেছনেই। সে এলে তোমাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে তবে ছাড়ব!

মাড়োয়ারীজীর মুখে কেন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। স্বভাব-সুলভ স্মিতহাস্যে আর একখানি পাঁচটাকার নোট মহিলাটির হাতে গুঁজে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে হাঁকল, বাহাদুর!

বন্দুকধারী নেপালী দারোয়ান মহিলাকে বন্দুকের বাট দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলল, টুম ডাকা মারনে মাঙটা হ্যায়—চলো—ভাগো—

ভীড়টা দুদিক দিয়ে ফাঁক হয়ে যায় আর বন্দুকধারী নেপালী দারোয়ান ঠেলতে ঠেলতে মহিলাকে ভীড়ের বাইরে বার করে দিয়ে আসে। মহিলা তখনও তাঁর দারোগা ছেলের উদ্দেশে একটানা চেঁচিয়ে চলেছেন।

অমল হঠাৎ তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যায়। জয়ন্ত তাকে ধরে ফেলে বলল, যাচ্ছেন কোথায় ?

ওই মাড়োয়ারীটার কাছে! এভাবে দিনে-ডাকাতি চলতেই পারে না!

জয়ন্ত বলল, কিন্তু ডাকাত আপনি বলছেন কাকে! খবর নিয়ে দেখুন এই লোকটি হয়তো লাখ-লাখটাকা দান করে অনাথ-আশ্রমে, হাসপাতালে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে! এর দানে কত গরীব-আতুর আজও খেতে পরতে পায়! হয়তো এর মহানুভবতায় প্রীত হয়ে সরকার বাহাদুর একে 'স্যার' টাইটেল দিয়ে ভূষিত করেছেন! এরাই তো আমাদের সমাজের মাথা!

অমল চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু লোকটা যে একটা জ্বলজ্যান্ত ঠগ!

জয়ন্ত অমলের হাত ধরে ভীড় থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, এমনই একটা সত্যি কথা আমি বলেছিলাম মেজর সাহেব সম্বন্ধে। তার ফল কি হয়েছিল তা বোধহয় আপনার মনে আছে। আর আমার এই নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনাদের সকলের সামনে সুনীল আজ সকালে আমাকে যা বলেছিল তাও নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। আপনারা হয়তো আমার জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ করা দরকার মনে করেননি!

সঙ্কোচে আর লজ্জায় এতটুকু হয়ে গিয়ে অমল অপরাধীর দৃষ্টি

মেলে ধরে জয়ন্তর মুখের ওপর।

জয়ন্ত অমলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলল, এখন বুঝতে পারছেন বোধহয়, মেজর সাহেবকে অত্যাচার করবার অধিকার দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ! সেই অধিকারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে সুনীলের মত উচ্চাভিলাষি মানুষ আর সহায়তা করছে আপনাদের মত সৎ আর শান্তিপ্রিয় মানুষের দল! তেমনি এই মাড়োয়ারীটিকে অবাধ-লুঠের অধিকার দিয়েছে রাষ্ট্রব্যবস্থা, সেই অধিকারকে কার্যকরী করছে আপনার মত মানবতার পূজারী সেবকের দল, আর সহায়তা করছে যত ধর্মভীরু অজ্ঞ মানুষের দল!

সাত

সেদিনকার সেই 'বুকে আগুন জ্বলার' কথা বলে ফেলার পর থেকে অনন্ত তার জীবনের মর্মান্তিক ইতিহাস অমলের কাছে বলার জন্যে ছটফট করেছে। সৈনিকজীবনের আওতায় আসার পর থেকে তার ফেলে-আসা জীবনটা বারবার তাকে খোঁচা দিয়েছে। মিলিটারী ব্যবস্থার নগ্ন চেহারা যত বেশী করে সে দেখেছে ততই সে এই ব্যবস্থাকে নিছক একটা জুলুম বলে সাব্যস্ত করতে চেয়েছে! কিন্তু তখনই নিজের কাছে নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয়েছে! লীলার সঙ্গে যে ব্যবহার সে করেছে তার সঙ্গে এই মিলিটারী ব্যবহারের কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য রয়ে গেছে! তাই বারবার তার মনে হয়েছে, অমলকে সমস্ত ব্যাপারটা বলতে পারলে বোধহয় সে খানিকটা শান্তি পাবে! হয়তো সমাধানের একটা পথও পেতে পারে!

অমলের সেদিন গার্ড-ডিউটী, বিকেলের দিকে ছিল অফফ। অনন্ত তাকে ডেকে নিয়ে গেল নদীর ধারে, কোন ভণিতা না করে বলল, আচ্ছা অমল, আমি মদ খাই বলে তুমি বোধহয় আমায় খুব ঘৃণা কর, না?

অমল অস্বস্তি বোধ করে বলল, কই, ঘৃণাতো আমি তোমায় কোন দিন করিনি অনন্ত! কিন্তু আমি ভেবে পাই না মদই বা কেন তুমি খাও!

না খেয়ে যে পারিনি। মনের যে অবস্থা নিয়ে মিলিটারীতে ঢুকে-ছিলাম সে অবস্থায় মদ যদি না ধরতাম তাহলে হয়তো পাগল হয়ে যেতাম!

অনন্তর মুখখানা লক্ষ্য করে অমল বলল, কি ব্যাপার!

অনন্ত বলল, আমাকে তোমরা সকলেই জান অবিবাহিত বলে। কিন্তু জান অমল, আমার বিয়ে হয়েছে আজ তিন-চারবছর আগে!

অমল চমকে উঠল, তার মানে!

অনন্ত যা বলল তার সারাংশটা হল এই;—বাল্যকালেই তার বাবা মারা যান। ভায়েদের কাছেই সে মানুষ হতে থাকে। ম্যাট্রিক পাশ করে আর কোন সহায়তা না পেয়ে টিউশানি করেই সে আই-এ পাশ করে।

লীলা তার এক ছাত্রীর সহপাঠি, মাঝে মাঝে পড়াশুনায় তাকে কিছু কিছু সাহায্যও করে থাকে। লীলা তাকে একদিন নেমন্তন্ন করে তার মায়ের তরফ থেকে। নিছক নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার সঙ্কোচ জাগলেও আরও একটি ছাত্রী পাওয়ার লোভে সে লীলাদের বাড়ী যায়। লীলার মায়ের অনাবিল আত্মীয়তায় সে মুগ্ধ হয়ে যায়, ধীরে ধীরে সে লীলাদের বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অবিরাম পরিশ্রমের মধ্যে ওই বাড়ীতে কিছুক্ষণ, তার কাছে যেন একটা বিরতির মত। এমনই একদিনের অনবধান এক মুহূর্তে লীলা উপযাচিকা হয়ে বিবাহ প্রস্তাব করে। সেদিন সে লীলাকে কোন কথা দিতে পারেনি। কিন্তু লীলার এই প্রস্তাব তার জীবনে আনল উত্তাপ আর আলোড়ন! কয়েকদিন পরে সে সম্মতি জানায়।

কিন্তু বাড়ীর মত পাওয়া যায় না! সে নিজের মতে বিয়ে করবে এ যেন ঘোর অরাজকতা! বাড়ীর অমতেই সে লীলাকে বিয়ে করে। মাসদুই পরে আলাদা সংসারও পাতে। বিয়ের মাসছ'য়েক পরে দাদা-বৌদি এসে সাদরে তাদের ডেকে নিয়ে যান। বাড়ীতে ঢুকে সে দেখে, তার খাতির বেড়ে গেছে দ্বিগুণ আর লীলার ওপর ব্যবহার চলেছে নিষ্ঠুর-তম! সব কিছুই সে দেখে, কিছু কিছু যেন বুঝতেও পারে, পারে না কেবল মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে। প্রতিদিন সে শুনতে থাকে লীলার অজস্র নিন্দা, কুৎসা আর অপদার্থতার কথা। তাদের স্বাধীন সংসারের মধুর রেশটুকুও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

চরম পরিণতি ঘটে তার মেজদার মধ্যস্থতায়। তিনি আদেশ দেন, লীলাকে ত্যাগ করতে। লীলার জন্য সংসারে অশান্তি ঢুকেছে, পাড়ায়

দুর্নাম রটেছে, তাঁদের বংশের মাথা হেঁট হয়েছে! এর একমাত্র কারণ, লীলার বিবাহপূর্ব জীবনের চারিত্রিক স্খলন! তাঁর অভিযোগ সপ্রমানিত করলেন, লীলার ভূতপূর্ব প্রেমিকের একখানি চিঠি দাখিল করে। তার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। প্রতিদিনকার জমা হওয়া সহস্র অশান্তি তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। সে লীলাকে দোষ স্বীকার করতে বলে। লীলা শুধু একটি কথা বলে, 'আমার চেয়ে এ বিষয়ে তোমার দাদা আর যাঁকে দিয়ে এই চিঠি লিখিয়েছেন তাঁরাই জানেন ভাল।' লীলার এ উক্তিকে নিছক ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞা বলেই তার মনে হয়। নির্মমভাবে সে লীলাকে প্রহার করে। লীলার কপাল কেটে যায়, সর্বাঙ্গ যায় থেঁতলে!

সেই মুহূর্তে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। দিনতিনেক পরে যখন সে বাড়ী ফেরে তখন তার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে! লীলা তার বিরুদ্ধে এ্যাসল্ট-চার্জের মামলা রুজু করেছে! মামলা চলল। তার দুই বড়ভাই যথেষ্ট পয়সা খরচ করলেন। আদালতের রায়ে সে দোষী সপ্রমাণিত হয়। অর্থদণ্ড দিয়ে সে বাড়ী ফেরে। কিন্তু বাড়ীতে ততক্ষণে তার সম্বন্ধে ব্যবহারের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। মামলায় তার দুই ভাই-ই নাকি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সুতরাং সে যেন পথ দেখে নেয়!

সন্ধ্যে উৎরে গেছে, নেমে এসেছে আঁধার, কখন চলে গেছে অনন্ত। অমল অনন্তর অন্ধকার জীবনটার দিকে চেয়ে ভেবে চলেছে, তাই আজ অনন্ত মদ খায়! আত্মঘাতি আক্রোশে সে নিজের ওপর নির্যাতন করে! আবার এমনই একটা আঘাতের ফলে কত লোক তো বিবাগী হয়ে সাধু হয়! কৃচ্ছ্রসাধন আর ব্রহ্মচর্য পালন করে! তবে কি মদের নেশা আর ধর্মবোধ দুর্বল মানুষের ওপর একই কাজ করে!

গার্ডরুমের সামনে বসে নদীর কালো বুকে চোখ রেখে অমল ভাবছে, মেজর সাহেব চান কোম্পানির প্রতিটি ছেলে হবে তাঁর ক্রীতদাস! অনন্তর দাদারা চেয়েছিলেন অনন্ত তাঁবেদার হয়ে থাক তাঁদের কাছে! আর অনন্তও চেয়েছিল, লীলা তার জুলুম মুখ বুজে সহ্য করুক! এমনি করেই বুঝি ধাপে ধাপে চলেছে এক জুলুমের রাজত্ব!

দশটার ঘণ্টা পড়ল। গার্ড কমাণ্ডার অমলকে বলল, তিননম্বর

পোষ্টে সুনীলকে রিলিভ করে দিন।

ক্যাম্পের পেছনে ছোট বস্তিটার সামনে তিননম্বর পোষ্ট। প্রথম যখন ক্যাম্প পড়ে, তখন এ পোষ্টটা ছিল না! কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল, একটু বেশী রাতে অনেক ছেলেই এই বস্তিটায় যাতায়াত সুরু করে দিয়েছে! একদিন একটি ছেলে মাতাল অবস্থায় একটি মেয়েকে মারপিট করায় বস্তির লোকেরা মেজর সাহেবের কাছে নালিশ করে। সেই থেকে এই পোষ্টটির সৃষ্টি।

সুনীলের কাছ থেকে রাইফেলটা নিয়ে অমল বলল, আপনি এবার যেতে পারেন—সুনীল তবুও ইতস্তত করে! অমল বলল, ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কেবল আপনার অনুমতিটা পেলেই হয়!

অনুমতি! কিসের?

ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। একটি মেয়ে জোগাড় হয়েছে, কাঁচা বয়েস, এই সামনের বস্তিতেই! বুঝলেন না, রাত আটটার পর মিলিটারী-ক্যাম্পের ধারে জল নিতে আসে! আন্দাজ আমি ঠিকই করেছিলুম। দেখেশুনে টোপ ফেলে দিলুম। আরে মশাই না গিলে আর যাবে কোথায়!

বিস্ফারিত চোখে অমল সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সুনীল বলল, সবই ঠিকঠাক, এখন কেবল আপনার অনুমতিটা পেলেই হয়!

আমার অনুমতির কি দরকার!

আপনার নাতো কি জমাদার সাহেবের! আপনার অনুমতি না হলে, আপনিই যে আমাকে সেণ্ট্রী থেকে কয়েদী বানিয়ে দিতে পারেন! বুঝলেন না ব্যাপারটা!

না সে ভয় আপনার নেই। আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে আমি ল্যান্স-নায়েক হওয়ার চেষ্টা করব না।

সুনীল হাত কচলে বলল, সে কি আর আমি জানি না। জানি বলেই না আপনার কাছে কথাটা পাড়তে সাহস পেলুম। তবে কথা দিচ্ছি, বঁড়শিতে যদি গাঁথতে পারি তাহলে আপনার পাতও নিরমিষ যাবে না! এদিকওদিক দেখে নিয়ে সে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

রাইফেলটাকে অমল সোলডার-আর্ম করে নিল। যথারীতি মার্চ

করে বীট'এর মধ্যে টহল দিতে থাকে। পাশে ক্যাম্প, লাইট-আউট হয়ে গেছে। একটানা বেজে চলেছে ঝিঁঝিপোকার ঐক্যতান। অমলের কদম ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে, চলার তাল যাচ্ছে কেটে। তার মাথার মধ্যে যেন ঝাঁঝাঁ করছে! সময় বহে চলেছে মৌন এক আশঙ্কায়!

গলিটার মুখোমুখি অমল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। পাদুটো তার থরথর করে কাঁপছে, ঘনঘন ক্যাম্পের দিকে ফিরেফিরে তাকাচ্ছে। গলিটার মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! চোখ কুঁচকে অমল লক্ষ্য করতে থাকে সুনীল ফিরছে কিনা!

তাহলে সুনীল বঁড়শিতে গেঁথেছে! সুনীল বলেছে, গাঁথতে যদি সে পারে তাহলে তার পাতও নিরমিষ যাবে না!

না, না,—ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার সে টহল দিতে সুরু করে। একাজ সে করতেই পারে না। গলির মুখে ফিরে এসে আবার অমল দাঁড়িয়ে পড়ে। কেনই বা না? সমস্ত মনটা তার গর্জে ওঠে, কেন না? পাঁচকড়ি ছেলে ভালই কিন্তু সেতো বর্মি-বাঙালী মেয়েটিকে ছেড়ে কথা কয়নি! হাবিলদার ভটচায ভদ্রঘরের শিক্ষিত মানুষ কিন্তু সেওতো ইভ্যাকুয়ী বলে করুণা দেখায় না! ওই মাড়োয়ারীটিতো একজন পর-হিতব্রতী কিন্তু পরোপকারের নামে দিনে-ডাকাতি করতে তার বিবেকে বাধে না! আর সুনীল শিক্ষিত, সভ্য, ভদ্র, কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা একটি মেয়ের কাছে দেহভোগের প্রস্তাব করতেতো দ্বিধা করেনি!

ডানহাতটা তার কাঁপছে। ট্রিগার-গার্ডের মধ্যে আঙ্গুল দুটো টন-টন করছে, কাঁধ থেকে হাতটা বুঝি এখনই ছিঁড়ে পড়বে! রাইফেলটাকে ি-লঙ-আর্ম করে নিল। শরীরের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে লম্বা ধাপ ফেলল, বুক চিতিয়ে দুহাত দুলিয়ে আবার টহল দিতে লাগল।

সুনীল ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, কেউ খোঁজ করেছিল নাকি?

অমল বলল, না।

দিন তবে রাইফেলটা—বলেই অমলের কাঁধ থেকে রাইফেলটা নিয়ে বলল, যান, চট করে ঘুরে আসুন! ডানহাতে তিননম্বর দরজা। তিনটে টোকা মারলেই খুলে দেবে।

বস্তির চালার ওপর দিয়ে রেলওয়ে-ইয়ার্ডের আলো কিছুটা এসে

পড়েছে সুনীলের মুখের ওপর। মিনমিনে ঘামে সুনীলের কপালটা ভিজে উঠেছে, মুখটা রক্তের আভাষে জ্বলজ্বল করছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

অমলের কাঁধে চাপড় মেরে সুনীল বলল, আরেঃ, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলে কি হবে! কাম অন! বাক আপ! ঠেলতে ঠেলতে অমলকে গলির মুখ পর্যন্ত পেঁছে দিল।

অমল এগিয়ে চলেছে। নিজের বুকের ঢিপঢিপ শব্দ সে নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। প্রথম দরজা, দ্বিতীয় দরজা, এইবার তৃতীয়! তার গতি মন্থর হয়ে আসে। তৃতীয় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত তোলে টোকা মারবার জন্য! উদ্যত সেই হাতে তার ঘর্মাক্ত মুখখানা একবার মুছে নেয়। চকিতের জন্য ভাবে, একদৌড়ে আবার সে তার পোস্টে ফিরে যেতে পারে।

দরজার ওপর অমল তিনটে টোকা মারল। কই দরজাতো খুলছে না! ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না! প্রতি লোমকূপ তার উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে!

ভাঙা দরজার ফাটলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা আলো এগিয়ে আসছে। অমল এক পা পেছিয়ে দাঁড়াল। তার সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে! প্রদীপ হাতে একটি মেয়ে কপাট খুলে পাশে সরে দাঁড়িয়েছে ভেতরে যাওয়ার মৌন অনুজ্ঞা জানিয়ে। অমল থমকে গেছে! তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছে! হাতদুটো কাঁধ থেকে অসহায়ভাবে ঝুলছে!

মেয়েটি চাপা গলায় বলল, চলে আসুন তাড়াতাড়ি।

একলাফে অমল ভেতরে ঢুকে পড়ল। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, সাবধানে আসুন আমার সংগে, কোন শব্দ করবেন না যেন—কিছু দূর গিয়ে মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস করে বলল, একটু দাঁড়ান, আলোটা ও-ঘরে রেখে আসি—ঘরের মধ্যে ঢুকে এক কোণে একটা দেলকোর ওপর প্রদীপটা রেখে একটা বিছানার পাশে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন!

মেয়েটিকে অনুসরণ করে অমল আর একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ছেঁচাবেড়ার দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ইয়ার্ডের আলো এসে পড়েছে ঘরের

মধ্যেকার মাচাটার ওপর। মেয়েটি মাচাটাকে দেখিয়ে বলল, বসুন।

অমল বসল। মেয়েটি তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। বেবাক বিস্ময়ে অমল তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, ওঘরে কে?

আমার বাবা, রোগে শয্যাশায়ী, আমাদের আর কেউ নেই!

অসীম করুণায় অমলের মনটা টলটল করে ওঠে! মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নেয় নিজের বুকের কাছে! তার বলতে ইচ্ছে করে, কেন আমিতো রয়েছি!

ধীরে ধীরে মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মাচার ওপর উঠে শুয়ে পড়ে। অমল ঘুরে বসে মেয়েটির মুখোমুখি। করুণ এক বেদনায় তার বুকটা শিরশির করতে থাকে! মেয়েটি বলল, তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন কিন্তু!

কখন তার নিজেরই অজ্ঞাতে অমল মেয়েটির ওপর ঝুঁকে পড়েছে। অপার বিস্ময়ে অনুভব করছে তার আকৈশোর কৌতূহলের বস্তু নারীর দেহ! অনাবৃত বক্ষের ওপর হাতদুটি রেখে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস জমে উঠেছে তার বুকের মধ্যে! মনে জেগেছে স্তন্যপায়ীর উদ্বেলতা! অমল মুখটা নামিয়ে আনে। মাথাটা ঠেলে দিয়ে মেয়েটি বলল, সেরে নিন না তাড়াতাড়ি।

অমলের বুকটা ব্যথায় টনটন করছে! তার অসার্থক জীবনে সমস্ত বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে! তার অনাঘ্রাত পৌরুষ ব্যথায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে! তার মনের গোপন কোণে যে কাঙাল অহরহ কেঁদে মরে, সে বুঝিবা এখনি মেয়েটির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে! অমল মিনতির সুরে বলল, আমাকে একটু তোমার বুকের মধ্যে চেপে ধরবে?

মেয়েটি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ওসব হবে-টবে না! আপনি যান।

অমল দাঁড়িয়ে ওঠে। মাচাটার পাশ থেকে একধাপ সে পেছিয়ে দাঁড়ায়। না, না! এ জিনিস সে চায়নি! সে চেয়েছিল, মেয়েটি তাকে একটু—একটু—হ্যাঁ, একটু ভালবাসুক!

অমলকে দেখে সুনীল বলল, ওঃ, আপনি এত দেরী করছিলেন!

অমল সুনীলের হাত থেকে রাইফেলটা টেনে নিল। সুনীল বলল, মেয়েটা বড্ড গরীব। শরীরে কিচ্ছু নেই! কেবল এক আঁটি হাড়!

কিছুদিন ভাল করে খাওয়ান দরকার, তবেইতো শাঁসাল হবে!

অমল চুপ করে থাকে। সুনীল আরও কাছ ঘেঁষে বলল, আসুন অমলবাবু, লেট আস শেয়ার! ওই কি ছাই একটা বিছানা!

অমল বলল, আমি আর কোনদিন যাব না।

কেন! শালী কোন খারাপ ব্যবহার করেছে নাকি? দিলেন না কেন একঘা বুটের ঠোক্কর!

না, খারাপ ব্যবহার করেনি। আমি নিজেই আর যাব না।

কিছুক্ষণ অমলের মুখের দিকে লক্ষ্য করে হাল্কা হেসে সুনীল বলল, ওঃ, এই বুঝি আপনার প্রথম!

গার্ড-ডিউটী থেকে অফফ হয়ে এসে অমল তাঁবুর পর্দা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বিষম ক্লান্তিতে তার মন গেছে আচ্ছন্ন হয়ে। গত-রাতের ঘটনা তাকে বিব্রত করে তুলছে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানানভাবে সে ভেবে চলেছে সেই মেয়েটির কথা! তারতো মেয়েটিকে বেশ ভাল লেগে-ছিল! সে তো ভাল ব্যবহারই করেছিল তার সঙ্গে! তবে কেন মেয়েটি তার সঙ্গে ওরকম করল! একের-পর-এক তার মনে পড়ে, মেয়েদের সম্বন্ধে রজতের ধারণা! বাঁড়ুয্যেদাদার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতির নমুনা! হাবিলদার ভটচাযের ইভ্যাকুয়ী মেয়েটির ভাগ চাওয়া। পাঁচকড়ির ব্যবহার সেই বর্মি-বাঙালী মেয়েটির ওপর! সুনীলের এই মেয়েটিকে শেয়ার করার প্রস্তাব! তবে কি মেয়েরা কেবল ফুর্তির খোরাক! তাদের একমাত্র দাম ওই দেহটুকুর জন্য!

কিন্তু মেয়ে বলতে কি কেবল এদেরই বোঝায়! মিনিতো বড় হয়েছে, রিণিও বড় হবে! তারাও কি এই রকম ব্যবহার পাবে! ভাবতে ভাবতে অমলের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ কেমন করে সম্ভব! 'মেয়ে বলতেই বোঝায় তার দেহটুকু! মানুষ হিসেবে তার কোন মূল্য নেই!

তাঁবুর পর্দাটা নড়ে-চড়ে উঠতে অমল চমকে উঠল। হয়তো কেউ আসছে ব্যাপারটা নিয়ে রস-মস্করা করতে! সুনীল কি আর এতক্ষণ কাকেও বলেনি! তাকে কি আর একটা আস্ত গাধা বলে সকলের কাছে প্রতিপন্ন করেনি! কিন্তু সে করবে কি! তার যে কিছুতেই প্রবৃত্তি

হল না! এ জিনিস যে সে চায়নি!

পর্দা সরিয়ে ঢুকল জয়ন্ত! অমল আশ্বস্ত হল। নাঃ জয়ন্ত অন্তত এসব ব্যাপার নিয়ে বদরসিকতা করবে না। তাঁবুর পর্দাদুটো তুলে দিতে দিতে জয়ন্ত বলল, কি মশাই, সব সময়ে এমন মনমরা হয়ে থাকেন কেন?

আস্তে আস্তে উঠে বসে অমল বলল, এখানে মনমরা হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি! খুশী হওয়ার মততো কিছু দেখতে পাই না।

চলুন না, খানিকটা ঘুরে আসি।

কোথায়ইবা আর যাবেন! হয় বাজারে না-হয় ষ্টেশনে! ইভ্যাকুয়ী-দের নিয়ে এই ছিনিমিনি যেন আর সহ্য হয় না!

বেশতো ইভ্যাকুয়ীদের ভীড়ে নাইবা গেলাম। চলুন না, নর্থ-গৌহাটির দিকে। ওখানে খুব পুরনো একটা মন্দির আছে পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের ঢল নেমে গেছে একেবারে নদীর বুকে। মন্দ কি, খানিকটা প্রকৃতির শোভা দেখা যাবে!

অমল বুট পরে পট্টি জড়াতে জড়াতে বলল, তাহলে আপনার প্রাণেও কাব্য আছে দেখছি!

না থাকলেও, সন্ধানতো মাঝে মাঝে করি!

পিথ্-হ্যাটটা হাতে নিয়ে অমল বলল, তাহলে চলুন।

ষ্টেশন পার হয়ে পোষ্টঅফিস ছাড়িয়ে ওরা উঁচু লাল রাস্তাটা ধরেছে। রাস্তার বাঁদিকে মিলিটারী-ক্যাম্প, পাইওনীয়র কোরের। সোজা লাইনে তাঁবুর সারি, দুদিককার ফ্ল্যাপ তোলা, প্রত্যেকটি বিছানা পরিপাটিভাবে সাজান। অমল বলল, কি রকম ঝকঝকে তকতকে ক্যাম্প দেখছেন!

জয়ন্ত বলল, আমার কিন্তু এই ক্যাম্পের চেয়ে তার লোকগুলোর চেহারাই চোখের ওপর ভাসছে। ভাবুনতো দেখি, তাদের ওপর কত জুলুমই না করে! যার জন্য ক্যাম্প এমন ঝকঝকে তকতকে।

অমলের মনে হল, ঠিকইতো তাই! ট্রেণিং-ক্যাম্পে ঢুকে প্রথম দিন তারওতো মনে হয়েছিল, কত সুন্দর! সেদিন সে ছিল বাইরের লোক। আর আজ সে সৌন্দর্যবোধ কোথায় উবে গেছে!

ওরা গ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে। নদীকে ডাইনে রেখে গ্রামের রাস্তা ক্রমশই বাঁয়ে ঘেঁষে চলেছে। পাতলা বসতি সুরু হয়েছে। রাস্তার দুধারে পতিত জমি, তার বুকে আগাছা উদ্ধত দম্ভে বেড়ে উঠেছে। উঁচু রাস্তার দুপাশে নামাল জমি বর্ষার জলে ভরা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ন্যাকড়া-কানি পরে কোমরে খাঁচা ঝুলিয়ে জলাগুলোর মধ্যে ছিপ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

অমল আর জয়ন্তকে দেখে ওই ছেলেমেয়ে-মহলে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল! গুটি গুটি তারা জলার ধার থেকে রাস্তায় উঠে আসে, ড্যাবড্যাব করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ দৌড়তে সুরু করে। অমল বলল, ব্যাপারটা কি বলুন তো! ওরা পালাচ্ছে কেন?

পালাচ্ছে, গোরাপল্টন দেখেছে বলে!

অমল থমকে দাঁড়াল।

জয়ন্ত বলল, কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!

থাক, তবে আর গিয়ে কাজ নেই!

কেন, ভয় করছে?

অমল আবার চলতে সুরু করে। গ্রামের মাঝামাঝি এসে পড়েছে। রাস্তার দুধারে বসতি ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠছে। একটা আর্তনাদের শব্দে অমল আর জয়ন্ত একই সঙ্গে সেইদিকে ফিরে চায়! একটি বছর বার-তের বয়সের মেয়ে ছোট্ট একটি ছেলে কোলে করে দাওয়ায় বসেছিল, তারই এই আর্তনাদ! ছেলেটীকে মাটীর ওপর ফেলে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল! তার কাপড়ের আধখানা তখনো দরজার বাইরে! বাড়ীর ভেতর থেকে চেঁচামেচির রোল উঠল! একসঙ্গে অনেকগুলি মেয়েলি স্বর, তার কোনটী কান্না, কোনটী আর্তনাদ, কোনটী অনর্গল প্রশ্ন!

অমল আর জয়ন্ত সেই বাড়ীটার সামনে এসে পৌচেছে। দেখল, কয়েকজোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ জানলাটাকে সজোরে বন্ধ করে দিয়ে চট করে সরে গেল! দাওয়ার ওপর শিশুটি তখনও পরিত্রাহি কাঁদছে! অমল বলল, আরও আগে আপনি যেতে চান নাকি?

জয়ন্ত বলল, নিশ্চয়ই!

ওরা কিন্তু আমাদের আক্রমণ করতে পারে!

সেতো পারেই। সেই জন্যেইতো আমাদের যাওয়া বিশেষ দরকার। বৃটীশের তাঁবেদারী ফৌজে ভর্তি হয়েছি বলে আমরাতো আর বৃটীশ হয়ে যাইনি!

গ্রাম আরও ঘন হয়ে উঠছে। প্রায় প্রতিটি বাড়ীর সামনে একজন দুজন করে পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অমল বলল, ওরা বোধহয় আমাদের ঘিরে ফেলছে!

জয়ন্ত বলল, ফেলুক না, আমাদের ভয়টা কি!

কিন্তু!

না অমলবাবু, এর শেষ আমাদের দেখতেই হবে! মিলিটারী আর সিভিলিয়ানের মধ্যেকার বেড়া ভাঙতেই হবে! এদের সঙ্গে আমরা আলাপ করব, এদেরই সঙ্গে মিলেমিশে থাকব।

সে কেমন করে সম্ভব!

সম্ভব এইজন্য যে আমরা পল্টন হলেও সাধারণ মানুষ! সামনে একটা চায়ের দোকান দেখে বলল, চলুন একটু চা খাওয়া যাক্।

অমল আবার বলল, একেবারে ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়বেন?

উপায় নেই অমলবাবু। মোকাবিলার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়া ভাল! দোকানের দাওয়ায় উঠে বলল, হ্যাঁ ভাই, চা পাওয়া যাবে?

দোকানী ফ্যাকাশে মুখে মাথাটা ঈষৎ দুলিয়ে জানাল, না।

জয়ন্ত মাথা থেকে টুপি খুলে বাঁশের মাচার ওপর বসে বলল, আহা আমাদের এত ভয় পাচ্ছ কেন ভাই? আমরাতো আর গোরা পল্টন নই, আমরা তোমাদেরই দেশের মানুষ!

দোকানী ওদের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, বারকয়েক আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, আপনালোক বঙাল্ ন হয়?

অমল বিদ্রূপ করে ওঠে, বাঙালী নাতো সাহেব নাকি!

জয়ন্ত বলল, তবে ভাই এবার একটু চা খাওয়াও, অনেক দূর থেকে আসছি। যাব অশ্বক্রান্তার মন্দিরে।

দোকানী যেন সন্দিগ্ধভাবটা কাটিয়ে ওঠে। সহজভাবেই বলল, মই ভাল্ চা করি দিম্—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে একটা আধনিভন্ত উনানে খান-

কয়েক ঘুঁটে ফেলে দিয়ে বাঁশের একটা চোঙের মধ্যে দিয়ে ঘনঘন ফুঁ দিতে লাগল। ঘুঁটে জ্বলে উঠল, ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেল। একটা টীনের পাত্রে জল চড়িয়ে দিয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বলল,আপনালোক এই ফালে কেনেকৈ আহিলা?

জয়ন্ত বলল, কেন বলত ? ?

খবর আহিছে, গোরাপল্টন মাইকি মানুহরে ধাওয়া করিব লাগিছে!

জয়ন্ত বলল, এমন খবরটী তোমাদের দিলে কে?

দোকানী একথার কোন জবাব না দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। একদল লোক দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা-না-একটা হাতিয়ার! অমলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জয়ন্ত দোকানীকে বলল, ওদের সর্দারকে একটু ডেকে নিয়ে এসতো।

দোকানী বলল, ভয় ন করিবা, মই সকল কথা কহি দিম্—বাইরে বেরিয়ে, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দোকানী হাত-পা নেড়ে যেন কি সব বলল। তার কথা শেষ হলে একজন লোক তার সংগে ভেতরে এল।

জয়ন্ত পাশে জায়গা দেখিয়ে বলল, এস সর্দার, বস।

সর্দার সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে থাকে। জয়ন্ত বলল, তোমরা ভুল করেছ সর্দার, আমরা পল্টন হলেও গোরা-পল্টন নই! আমরা তোমাদেরই দেশের মানুষ, পেটের দায়ে মিলিটারীতে ঢুকেছি! আমরা তোমাদের ওপর জুলুম করব না।

সর্দার বলল, আপনারা আর কখনও গ্রামে ঢুকবেন না।

অমল বলল, আমাদের কি তোমরা বিশ্বাস করতে পার না?

সর্দার বলল, গ্রামের মধ্যে আমরা পল্টন ঢুকতে দেব না।

কিন্তু সর্দার, যখন জাপানীরা এসে দেশ দখল করবে তখন তোমরা কেমন করে গ্রাম রক্ষে করবে? সর্দার কোন উত্তর না দিয়ে কেবল তার হাতের দা'খানা তুলে ধরল।

দোকানী ইতিমধ্যে কাঁচের গ্লাসে চা আর শালপাতায় চারখানা করে লবঙ্গলতিকা ওদের সামনে দিয়েছে। খেতে সুরু করে অমল সর্দারকে বলল, আমরা ভেবেছিলাম অশ্বক্রান্তার মন্দিরটা দেখে যাব।

যেতে পারেন। কিন্তু কোন ভাল-মন্দ হলে আমরা জানি না।

জয়ন্ত বলল, তাহলে আমরা ফিরেই চললুম সর্দার!

সর্দার বলল, আপনাদের কোন ভয় নেই, আমাদের লোক আপনাদের গ্রামের সীমানা পার করে দিয়ে আসবে।

রাস্তায় নেমে অমল একবার পেছন দিকে দেখে নিল। জনচারেক লোক কিছু তফাতে তাদের পেছনে পেছনে আসছে। অমল বলল, কই জয়ন্তবাবু, এরাতো আমাদের বিশ্বাস করল না!

জয়ন্ত বলল, আমি ভুল করেছিলাম অমলবাবু, আমার চেয়ে এদের দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ। আমরা বাঙালীই হই আর অসমিয়াই হই, আমরা হচ্ছি সৈনিক! যে সৈনিক ওদের ওপর আবহমানকাল ধরে অত্যাচারই করেছে! সুতরাং আমরা ওদের শত্রু। আমরা যদি কোনদিন ওদের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দিতে পারি, সেইদিনই ওরা আমাদের বিশ্বাস করবে।

জয়ন্তর কথাগুলো শুনতে শুনতে অমল কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনে পড়ে তার সেই মেয়েটীর কথা! তাহলে মেয়েটীও নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি! তাকে মনে করেছে সুনীলের মতই একটী জীব! সুতরাং অবিশ্বাস্য।

দুপুরের খানার পর ঘন্টাদেড়েকের অবসরটা ছেলেরা সাধারণত ঘুমিয়ে না-হয় গল্প করে কাটিয়ে দেয়। অনন্ত বকের মত পা ফেলতে ফেলতে এসে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। কাদায় সারা মাঠটা প্যাচপ্যাচ করছে! জামার বোতাম খুলে দিয়ে বুটের কাদা চাঁছতে সুরু করে বলল, ওঃ জীবনটা বিষময় করে তুলেছে! এই শালা বৃষ্টি যেন এন-সি-ও'দের চেয়েও অসহ্য!

সুনীল বলল, বৃষ্টি পড়ছে তাও কি এন-সি-ও'দের দোষ! তোদের দেখছি এ এক রোগ হয়েছে!

অনন্ত বলল, রোগ হল আমাদের! গাছতলায় বসিয়ে রাইফেল-ক্লাস করবার কি দরকারটা বাবা! আর ওরই ফাঁকে ঝাল ঝেড়ে নেওয়া! আমরা যে কি এমন ওদের পাকা ধানে মই দিয়েছি বুঝি না।

সুনীল বলল, কিন্তু ওদের কথাটাও বা তোরা যে কেন ভাবিস না

আমি বুঝতে পারি না! ওদের দোষটা কি! ওরাতো হুকুমের চাকর।

বুটের তলা সাফ করা শেষ করে অনন্ত সুনীলের পাশে শুয়ে পড়ে বলল, অমলটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে!

সুনীল বলল, সে জানিস না বুঝি? ওর মাথাটী খাচ্ছে ও জয়ন্তটা। ওটা যেমন ট্যাঁকট্যাঁক করে কথা বলে, আজকাল অমল দেখি তাই সুরু করেছে! আরে বাবা, ব্লাডি বাষ্টার্ডতো মিলিটারীতে কথার মাত্রা বিশেষ! ও নিয়ে চটাচটি করার কি কোন মানে হয়!

সন্তোষ ছিল সুনীলের পাশে, উঠে বসে বলল, দেখ সুনীল, নিজের কাপুরুষতাকে বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করিসনি!

সুনীল বলে উঠল, আর এঁরা হলেন অমলবাবুর চেলা! পেছন থেকে বাহবা দেন। কিন্তু অমলকেইতো সাতদিন আর-আই খাটতে হবে!

সন্তোষ বলল, মানুষের মত মানুষ হলে, তারাই এগিয়ে যায়!

অনন্ত বলল, ব্যাপারটা হয়েছিল কি?

সন্তোষ বলতে থাকে, হবে আর কি! হাবিলদার মুখার্জিকে তো জানই, ওই যে শালা মিছরির-ছুরি! রাইফেল-ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ তাঁর প্রাণে উচ্ছ্বাস জেগে উঠল! তিনি তাঁর আত্মচরিত শোনাতে সুরু করলেন। তিনিই নাকি ম্যাগনোলিয়ার হর্তাকর্তা ছিলেন, দুনিয়ার যত রাজামহারাজা ছিল তাঁর খদ্দের! এইসব যত গ্যাঁজা আর কি! অমলের পাশে বসেছিল ফায়ারম্যান্ পি, বি, মুখার্জি আর ব্ল্যাক্স্মিথ এন্, বি, দে। তারা বোধহয় ভেবেছিল, হাবিলদার সাহেব যখন খোস-মেজাজে আছেন তখন তারাও একটুআধটু গল্পসল্প করতে পারে! নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে তারা গল্প সুরু করে দেয়। আর যাবি কোথায়! হাবিলদার সাহেবের মেজাজ গরম! ভক্তি গদগদ চিত্তে তাঁর আত্মচরিত না শুনে কিনা গল্প জুড়ে দিয়েছে! হাবিলদার সাহেব মুখচোখ লাল করে বলে উঠলেন, সাট আপ, ইউ বাষ্টার্ড! অমল কি মনে করেছিল কে জানে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ইউ উইদ্ড্র। হাবিলদার মুখার্জি একলাফে অমলের সামনে এসে তেড়ে ওঠেন, কি, কি বললে তুমি? অমলও সোজা জবাব দেয়, আপনি যা বলেছেন তা প্রত্যাহার করুন! গালাগালি দেওয়ার অধিকার আপনার নেই। হাবিলদার

ম্খার্জি প্রথমটা যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। আমাদের সকলের দিকে একবার কটমট করে চাইল। আমাদের হাত-পা তখন ঠকঠক করে পছে। আর কিছু না বলে ব্যাটা গটমট করে চলে গেল। আমি লকে বললুম, বোধহয় মেজর সাহেবকে ডাকতে গেল। অমল বলল, শী আর কি হবে, না-হয় জয়ন্তর মত খানিকটা মার খেতে হবে। ন্তু এদের এই জঘন্য ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে! একটু পরে হাবিলদার ম্খার্জি জমাদার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। অমলকে দেখিয়ে লল, এই যে স্যার ইনি, এ'কে জী হুজুর না বললে এ'র অপমান হয়! জমাদার সাহেব বললেন, তাতো হবেই, উনি যে গ্র্যাজুয়েট! তারপর অমলের সামনে দাঁড়িয়ে মোগলাই কায়দায় কুর্ণিশ করে বললেন, হুজুর, এ বান্দাকি গোস্তাকী মাফ করনা! আইয়ে জী হামারা সাথ—বলে শালা হাঁটতে সুরু করল কোয়ার্টার-গার্ডের দিকে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, হুজুরকেতো গোঁসাখানায় দিয়ে এলাম! হাবিলদার সাহেবের কথায় আর কারও গোঁসা হয়েছে নাকি?

অনন্ত বলে উঠল, এরা মনে করেছে কি! আমরা কি ভেড়ার পাল নাকি! যা বলবে তাই শুনে যাব, প্রতিবাদও করতে পারব না!

সুনীল বলল, প্রতিবাদ করে আর লাভটা কি! ওইতো কোয়ার্টার-গার্ড খাটতে হবে। আর কটাদিন মুখ বুজে সহে যা না বাবা, ওদিকে মণিপুরতো হয়ে গেছে!

সন্তোষ বলল, ওই আনন্দেই থাক। জাপান এসে তোমাদের মত ভেড়ুয়াদের স্বাধীন করে দেবে।

অনন্ত বলল, যাক, তারপর কি হল বল?

সন্তোষ বলতে লাগল, তারপর জমাদার সাহেবের তম্বিগম্বি! ওকে আমি কোয়ার্টার-গার্ড খাটাবই! কোন স্যাপার যে একজন হাবিলদারের সামনে মাথা তুলে কথা বলবে সেটি এখানে চলবে না! আর ওর বিরুদ্ধে তোমাদের দুজনকে সাক্ষী দিতে হবে। আমাদের ছুটি হয়ে গেল। পি. বি. মুখার্জি বলল, খবরটা অমলবাবুকে দিয়ে আসি, আর তাঁকে জানিয়ে দিই, আমরা কেউ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দাঁড়াব না।

সন্তোষ বলে যায়, তার কিছু পরে অমলকে মেজর সাহেবের কাছে পেশ করল জমাদার সাহেব, আর সাক্ষী হলেন ওই শালা হাবিলদার মুখার্জি।

অনন্ত ফোঁস করে উঠল, হাবিলদার মুখার্জি কেমন করে সাক্ষী হবে! সেইতো নালিশ করেছে!

সন্তোষ বলল, তাতে কি হয়েছে, সে যে হাবিলদার! হাবিলদার মুখার্জি বানিয়ে বানিয়ে একগঙ্গা মিথ্যে কথা বলে গেল। জমাদার সাহেব বেছে বেছে একজন পয়েন্টস্‌ম্যানকে অনেক শিখিয়েপড়িয়ে সাক্ষী খাড়া করে দিল। সে কিন্তু যা সত্যিই ঘটেছিল তাই বলেছে। জমাদার সাহেবতো ক্ষেপে গিয়ে তাকে একস্ট্রা-ফেটীগ দিয়েছে, নদী থেকে ত্রিশ বালতি জল তোলা! আর মেজর সাহেব অমলকে মাত্র সাতদিনের আর-আই দিয়েছেন 'পয়লা কসুর' বলে।

সুনীল বলল, তাছাড়া মেজর সাহেবের আর উপায়ই বা কি। কোম্পানিতে ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে হবেতো। অমলকে কোন শাস্তি না দিয়ে যদি ছেড়ে দিতেন তাহলে স্যাপাররা কি আর কোনদিন এন্‌-সি-ওদের মানত?

অনন্ত ফ্যালফ্যাল করে সুনীলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, তুমি কি বলছ সুনীল! শুধু ডিসিপ্লিনের নামে তুমি এতবড় একটা অন্যায়ের পক্ষে ওকালতি করছ?

সুনীল বলল, ওকালতি আমি করছি না। কিন্তু যাদের ওপর এতবড় এডমিনিস্ট্রেশন চালানর ভার তাদের কথাটা একবার ভাববে না?

সন্তোষ বলে উঠল, তোমার প্রভুভক্তির জন্য তুমি হয়তো শিগগীরই এন-সি-ও হয়ে যাবে সুনীল। কিন্তু আমার মন বলছে এ্যাডমিনিস্ট্রে-শনের এই কায়দা বোধহয় আর খুব বেশীদিন চলবে না!

আট

বর্ষা নেমেছে! একবার বৃষ্টি সুরু হলে আর থামতে চায় না! তাঁবুর আউটার-ফ্ল্যাপ ভারী হয়ে ইনার-ফ্ল্যাপে ঠেকে যায়, বৃষ্টির ছাঁটে আর বুটের জলে তাঁবুর মাটী কাদা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে ঘুরে

এসে ছেলেরা জামার বোতাম খুলে দেয়, দেহের উত্তাপেই জামা শুকিয়ে যায়। পিথহ্যাটটা ভিজে ভিজে যখন নরম হয়ে ওঠে তখন লঙ্গরখানায় উনানের পাশে রেখে সেটাকে সেঁকে নেয়। কিন্তু বিপদ ওই বুট-জোড়াকে নিয়ে! ঘুম থেকে উঠেই পাদুটো গলিয়ে দিতে হয়। সারা-দিন ধরে জলে কাদায় ভিজে তলা থেকে ওপর পর্যন্ত ঢ্যাবঢ্যাব করতে থাকে, ভেতরের গরম মোজা ভিজে ওঠে। তবুও রাত আটটায় রোল-কল শেষ হওয়ার আগে বুট খোলার অবকাশ নেই। রোল-কলের শেষে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে মাথাপিছু একহাত জমির ওপর নিজের নিজের বিছানায় বসে নিজেরাই নিজেদের পায়ের তলায় হাত ঘষে পাদু'টোকে গরম করে নেয়।

এক একটা তাঁবুর মধ্যে আঠার থেকে কুড়িজন লোকের থাকার হুকুম। তবুও যৌথভাবে বিছানা পেতে একটু হাত-পা খেলিয়ে আরাম করে শোয়ার উপায় নেই। এক বিছানায় দুজন লোক শোওয়া মারাত্মক গর্হিত কাজ! যেহেতু ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধি-বাসীদের নিয়েই ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোড়াপত্তন, সেইজন্য তাদের কদভ্যাসের প্রতিরোধক এই আইন আজও বলবৎ। সুতরাং প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বিছানা পাততেই হয়। একখানা গ্রাউন্ড-সীট লম্বা-লম্বি দু'ভাঁজ করে পেতে মাথাপিছু বিছানা! তারই ওপর একসারিতে দশজন ছেলে যদি চিৎ হয়ে শোয় তাহলে আর 'এক বিস্তারামে দো আদমি'র মত 'বুরা কাম্' এড়িয়ে চলা যায় না। কাজেই, আইন রক্ষার দায়ে প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে মশারী খাটিয়ে ব্যবধান রচনা করতে হয়।

তাঁবুর চারপাশের নালাকে রোজই সংস্কার করতে হয়। জল নিষ্কাশনের পথ সুগম না থাকলে একটু বেশী বৃষ্টিতে তাঁবুর মধ্যে বন্যার সম্ভাবনা! শুধু নালাতেই রেহাই নেই, তাঁবুর পেগগুলোকেও পরখ করে দেখতে হয়, তাঁবুর দাড়িগুলোকে টানটান করে দিতে হয়। রোল-কলের পর বিছানার মধ্যে ঢুকেও শান্তি নেই। নানাজাতের দুর্যোগ-আশঙ্কায় মনটা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত গল্প চলতে থাকে কোন একদিনের দুর্যোগকে কেন্দ্র করে। প্রবল বৃষ্টিতে কেমন করে নালা ছাপিয়ে জল ঢুকেছিল তাঁবুর মধ্যে!

দমকা বাতাসে কবে কোন তাঁবু গিয়েছিল উপড়ে! তাঁবুর জল বার করার জন্য কে কে বুট করে জল সেচছিল! তাঁবু সামলাবার জন্য কে কে তাঁবুর খুঁটি ধরে সারারাত বসে ছিল! গল্প চলতে থাকে, তারই মধ্যে নেমে আসে অবসন্নতা, ক্লান্তিতে চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে—ছেলেরা একে একে ঘুমিয়ে পড়ে!

খগেন আর পাঁচকড়ি লাইন থেকে ফিরেছে। তাঁবুর হাল দেখে নিজেরাই লেগে গেছে পেগগুলো ঠুকে দিয়ে দড়িগুলো টানটান করে দিতে। দুপুরবেলায় অন্য ছেলেরা তাঁবুর মধ্যে ঘুমোচ্ছে। খগেন বা পাঁচকড়ি কেউই তাদের ঘুম ভাঙিয়ে ডাকতে পারেনি, কেমন যেন সঙ্কোচ লেগেছে! টেকনিক্যাল-ডিউটীতে রয়েছে, ফেটীগ খাটতে হয় না, প্যারেড করতে হয় না—এর জন্য নিজেদেরই যেন অপরাধী মনে হয়!

মেডিক্যাল্ এন্-সি-ও হাবিলদার-ক্লার্ক ব্যানার্জি হাঁক মেরে উঠল, এই শুনো জোয়ান, আজ তিনবাজে 'শর্ট আর্ম' ইন্সপেক্শন্! হরেক জোয়ান আড়াইবাজে ফার্ষ্ট-এইড-পোষ্টকা সামনামে ফল-ইন!

খগেন ডাকল, ও বাঁড়ুয্যেদা, শোননা এদিকে?

হাবিলদার ব্যানার্জি তাঁবুর একটা পোল ধরে দাঁড়িয়ে বলল, কি হে সব ঠিক্ঠাক আছে তো? তোমাদের নিয়েইতো ভাবনা বেশী। লাইনে যাচ্ছ, কোথায় কি করে আসছ কে জানে! আচ্ছা চলি ভাই, আবার সব তাঁবুতে তাঁবুতে বলে দিতে হবে। আমারও যেমন পাপের ভোগ, কার গণোরিয়া হল, সিফিলিস্ হল, আমাকে বসে বসে দেখতে হবে!

হাবিলদার ব্যানার্জি চলে গেলে পাঁচকড়ি ফিসফিস করে বলল, এইবারতো তাহলে সুনীলটা মরবে দেখছি!

খগেন বলল, সুনীল! কেন, ওকি তিননম্বর গেটের খদ্দের নাকি?

নারে, এলেম থাকলে সবই হয়! এইখানেই জুটিয়ে নিয়েছে!

তাই বল। আর শয়তানটা আমাকে একটী কথাও বলেনি। তাই মাঝে মাঝে দু'চারটাকা ধার নেয়! হ্যাঁরে, কতদিন হলরে?

তাওতো আজ প্রায় একমাস হতে চলল। আরে ছাই, আমিও কি জানতাম নাকি! সেদিন রাত প্রায় এগারটার সময় দেখি, সুনীল মশারী থেকে বেরিয়ে খালি পায়ে বগলের তলায় একটা পুঁটলি নিয়ে

গুটীগুটী বেরিয়ে যাচ্ছে! আমি না চুপিসাড়ে উঠে ধরলাম ওর একটা ঠ্যাঙ চেপে। তখন ও একে একে সমস্ত বলল। মেয়েটী নাকি ভীষণ গরীব। ও একটা কম্বল দিয়েছে আর রোজ সেরদুয়েক চাল কিছু ডাল আর চিনি দিয়ে আসে। কোয়ার্টার-মাষ্টার-হাবিলদার ভটচাযের সঙ্গে মাসে পাঁচটাকায় রফা করে নিয়েছে। আরেঃ দেখলাম, মেয়েটার ওপর ওর রীতিমত মায়া পড়ে গেছে।

তিনটে বাজতে পনের মিনিটে হুইসিল পড়ল। ছেলেরা সব খালি গায়ে আণ্ডার-ওয়্যারের দড়ি বা হাফ-প্যান্টের বোতাম খুলে রেডি হয়ে আছে। একে একে ক্যাপটেন সাহেবের সামনে গিয়ে কাপড় সরিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ইন্সপেকশন শেষ হলে আবার তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছে।

দুটী ছেলে ধরা পড়েছে। তারা ছেলেদের দিকে পেছন করে হস্‌পিট্যাল-টেন্টের মধ্যে বসে আছে। অন্য আর সকলের বুক ধড়াস-ধড়াস করছে! কে জানে যদি তাদের কিছু গলৎ বেরিয়ে পড়ে!

বাচ্ছা মতন একটা ছেলেকে টানতে টানতে এনে জমাদার সাহেব বললেন, দিস বাগগার ওয়াজ ট্রাইং টু এস্‌কেপ স্যার!

ক্যাপটেন সাহেব ছেলেটীর পিঠে একটী হাত রেখে বললেন, কোই ডর নেহি! প্যান্ট খুলো—ছেলেটীকে ইতস্ততঃ করতে দেখে জমাদার সাহেবকে বললেন, নাউ ইউ ক্যান্‌ গো জমাদার সাব্‌—মনক্ষুণ্ণ হয়ে জমাদার সাহেব চলে গেলেন। ক্যাপটেন সাহেব ছেলেটিকে আবার বললেন, ঘাবড়াও মত্‌ বেটা, বেমার্‌ হোয়েগা, হম্‌ আচ্ছা কর ডেগা—ভয়ে ছেলেটীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কান্নায় সে ফেঁপে উঠেছে। ক্যাপটেন সাহেব নিজেই তার প্যান্ট খুলে দেখে বললেন, টুম্‌ভি উধর্‌ বৈঠো।

ইন্সপেক্‌শন্‌ শেষ হলে হাবিলদার ব্যানার্জি ছেলে তিনটির রোগের ইতিহাস নিতে বসল। প্রথম দুটী সোজাসুজি স্বীকার করে, তারা তিন-নম্বর গেটে গিয়েছে। তৃতীয়টীর দিকে ফিরে হাবিলদার ব্যানার্জি খিঁচিয়ে ওঠে, এইতো কচি ছেলে, গলা টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, গণোরিয়া বাঁধিয়ে বসেছে! কি রে, তোর বয়স কত?

ছেলেটি বলল, আজ্ঞে ষোল বছর!

তবে তুই ভর্তি হলি কি করে? বয়েস ভাঁড়িয়েছিলি বুঝি?

না বাবু, আমি বয়েস ভাঁড়াইনি!

তা বেশ করেছ। বলতো বাছাধন, রোগটী বাধালে কি করে? ছেলেটী মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। হাবিলদার ব্যানার্জি বলল, কেঁদে কি হবে! রোগ যখন বাধিয়েছ, তখন মর! আমি কি করব?

হাবিলদার ব্যানার্জির পা জড়িয়ে ধরে ছেলেটী বলল, বাবু আমারে বাঁচান। আমি যাতি চাইনি! হাবিলদার সাহেব আমারে নে গেল।

হাবিলদার সাহেব! কোন হাবিলদার সাহেব?

উই হাবিলদার জামান সাহেব।

ওঃ, তাই বলি! সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল দেখি, কিচ্ছু লুকোবি না! একটা মিথ্যে কথা বলেছিস কি তোর নির্ঘাত মৃত্যু!

ছেলেটী চোখের জল মুছে কয়েকটা ঢোঁক গিলে বলল, আমি এক্কেবারে সত্যি কথা বল্‌তিছি বাবু। উই দিন হাবিলদার জামান সাহেব আমারে বলল, 'চল, গৌহাটী সফর করে আসি।' আমি তেনার সাথে গেলাম। গৌহাটীতে একটা বাড়ীতে ষাইয়া হাবিলদার সাহেব সিভিলিয়ান পোষাক পরলেন আর আমারেও কাপড় দিলেন। তারপর রেল লাইনের ধারে একটা বস্তিতে নে গেলেন। সেখানে অনেকগুলো মেয়েলোক হাবিলদার সাহেবের সাথে কি সকল ফষ্টি-নষ্টি করল। তারপর একটা ঘরের মধ্যে যাইয়া হাবিলদার সাহেব আমারে বিছানার ওপর শোয়াইয়া জোর করে খারাপ কাজ করলেন। আমি হাবিলদার সাহেবের পায়ে ধরি অনেক মানা করলাম! তবুও হাবিলদার সাহেব শোনল না!

হাবিলদার ব্যানার্জি সরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হুম! তা হাবিলদার সাহেব তো করল। কিন্তু তোর রোগ হল কি করে?

ছেলেটী কাঁদকাঁদ স্বরে বলল, আমি কি করব বলেন। হাবিলদার সাহেব বাইরে যাইয়া একটা মেয়েলোকেরে ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন। সেই মেয়ে লোকটাইতো জোর করিয়া আমারে—

হাবিলদার ব্যানার্জি আর্তস্বরে বলে উঠল, থাম! উঃ নরক—ঝট করে উঠে পড়ে বলল, দাঁড়া দেখছি, এই হাবিলদার সাহেবটীর একটা ব্যবস্থা হয় কিনা।

একটু পরেই জমাদার সাহেবের কাছ থেকে ধমক খেয়ে ফিরে এসে

হাবিলদার ব্যানার্জি নিজের কর্তব্যকর্মে মন দিল। নিজে হাবিলদার হয়ে তার জানা উচিত ছিল, কোন স্যাপারের মুখ থেকে হাবিলদারের বিরুদ্ধে নালিশ শোনা মিলিটারীতে চলে না।

মর্ণিং সিক-রিপোর্ট তৈরী করে হাবিলদার ব্যানার্জি ক্যাপটেন সাহেবের কাছে এগিয়ে দিল। সই করতে করতে ক্যাপটেন সাহেব বললেন, ইট্ ইজ্ ফর্ ইওর নেগলিজেন্স, ব্যানার্জি!

বিস্ময়ে হতবাক হাবিলদার ব্যানার্জি বলল, হাউ স্যার!

ক্যাপটেন সাহেব বললেন, ইউ স্যুড্ হ্যাভ্ ইস্যুড্ প্রফিল্যাক্টিক্ প্যাকেটস টু দিজ মেন। ইউ ক্যান্ট্ ষ্টপ্ দেম্ গোয়িং টু দি প্রষ্টি-টিউটস্, বাট্, ইউ ক্যান্ প্রিভেন্ট দেম্ কন্ট্র্যাক্টিং ভি-ডি।

তিনটীছেলে লজ্জিত, বিমর্ষ মুখে মাথা নীচু করে হস্পিটাল্-ট্রাকে উঠে বসল। ক্যাপটেন সাহেব তাদের দিকে বারেক চেয়ে হাবিলদার ব্যানার্জিকে বললেন, টেল্ দেম্ নট্ টু বি ওয়্যরিড্! ভি-ডি ইজ্ এ মার্শাল-ডিজিজ্!

মশারী ফেলার সময় তখনও হয়নি। দিনের আলোয় সময়টা কোন-রকমে কেটে যায়। তাঁবুর মধ্যে বিছানা থাকে গুটান, শুধু গ্রাউন্ড-সীট পেতে নিয়ে স্যাঁতসেঁতে মাটীর ওপর বসে জনকয়েক মিলে গল্প-গুজব করা চলে, পা ছড়িয়ে বুটপাট্টি পরেও খানিকটা শুয়ে থাকা চলে। কিন্তু দিনের আলো যতই ম্লান হয়ে আসে সে ম্লানিমা ছেলেদের মন ততই আচ্ছন্ন করতে থাকে। তারা ভাবতে বসে তাদের জীবনের কথা! যে জীবন আজ স্থির, অচঞ্চল, ঝিঁঝিঁপোকার অশ্রান্ত কাঁদনের মত এক ঘেঁয়ে! যে জীবনের গণ্ডি হল ক্যাম্পের এলেকা আর তার পরিবেশ হল কতকগুলো এন্-সি-ও, ভি-সি-ও, অফিসার, আর আজ্ঞাবহ কতক-গুলো নির্জীব আধমরা মানুষ! একদল হুকুম করে অপরদল হুকুম তামিল করে। তাই দিন যখন ম্লান হয়ে যায় তখন ছেলেরা ভাবতে থাকে তাদের ফেলে-আসা জীবনের কথা, তাদের বাড়ীর লোকের কথা, আর তাদের অতি প্রিয়জনদের কথা!

বিপদ বাধে সন্ধ্যে থেকে রোল-কলের সময় পর্যন্ত ফাঁকটাকে নিয়ে।

আইন হচ্ছে সন্ধ্যের আগে বিছানা পেতে মশারী ফেলে দিতে হবে কিন্তু রোল-কলের আগে বুটপট্টি খোলা চলবে না। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরে, তাঁবুর মধ্যে আঠারটা মশারীর চাপে দম বন্ধ হয়ে আসে। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মন জীব-জগতের স্বাভাবিক বৃত্তির বশে উষ্ণ একটা আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সে আশ্রয় কোথায়! তাই কারও কারও চোখ ফেটে জল আসে আর কেউ কেউ ছোটে মদ আর নারীদেহের সন্ধানে!

কয়েকটা তাঁবুর পাশ দিয়ে মেজর সাহেব হনহন করে হেঁটে চলে যান। মেডিক্যাল-অফিসার পরামর্শ দিয়ে গেছেন ছেলেদের যথেষ্ট পরিমাণে ঘুরেফিরে বেড়াবার ছুটী দিতে। তাহলেই আর তারা বেশ্যা-বাড়ীর দিকে যাওয়ার জন্য অত বেশী ঝুঁকবে না, কোম্পানিতে ভি-ডি রুগীও এত বেশী হবে না! মেজর সাহেব নিজে বেরিয়েছেন দেখতে আটক অবস্থায় ছেলেরা ক্যাম্পের মধ্যে কি করে! মাঝামাঝি একটা তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে একটী ছেলেকে কাছে ডেকে বলেন, তোমরা এ সময়ে তাঁবুর মধ্যে বসে আছ কেন?

ছেলেটী মেজর সাহেবের লাল লাল চোখ আর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে আমতাআমতা করে বলে, বিছানা করছিলাম স্যার'

ব্লাডি, ঝুটা বাত্ মত্ বোলো! সাফ সাফ বাতাও কোই ডর্ নেহি!

নির্ভয়ে বলার আশ্বাসে ভয় আরও বেড়ে যায়! অফিসাররা যখন কড়া-মেজাজে থাকেন তখন ছেলেরা তাঁদের সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু তাঁরা যখন সহানুভূতি দেখান, বন্ধুভাবে কথা বলেন, তখনই তারা পড়ে যায় ফাঁপরে! মন তাদের সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে! ছেলেটী মরিয়া হয়ে বলল, ছুট্টি নহি মিল্তা সাব্!

মেজর সাহেব পা ঠুকে মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক্ হ্যায়—হনহন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সেদিনকার রোল-কলে ঘোষণা শুনে ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রতিদিন ত্রিশজন ছেলেকে ছুটী দেওয়া হবে গৌহাটীতে সিনেমা যাওয়ার জন্য। রোজ বিকেলে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত অফফ-ডিউটী ছেলেরা বাজারে, ফেরীঘাটে বা নদীর ধারে বেড়াতে পারবে কিন্তু বাজারে কিছু

কিনে খেতে পারবে না বা গ্রামের দিকে যেতে পারবে না।

ছেলেরা খুশীই হল। সকলেরতো আর গ্রাম বা বস্তির দিকে যাওয়ার ঝোঁক অত প্রবল নয়! সাধারণের ঝোঁক বিকেলের দিকে একটু ঘুরেফিরে বেড়াবে, দু'দশটা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে, দরকারি জিনিষপত্তর কিনবে—ব্যাস্! কিন্তু পরদিন সকালে কোম্পানির রেজিমেন্টাল-পুলিশের পাঁয়তারা দেখে ছেলেরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বাছাই-করা বারজন তাগড়া তাগড়া ছেলেকে নিয়ে হল আর-পি স্কোয়াড। তাদের বুট থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পালিশ করা হয়েছে! বাঁহাতে আর-পি ব্যাজ আর ডানহাতে দেড়হাত লম্বা ডান্ডা!

জয়ন্ত অমলকে বলল, এটী হল নতুন একটী ফাঁদ। ঠিক ফ্লাই-ট্র্যাপের মত। একটা কাগজে খানিকটা চিটেগুড় মাখিয়ে খোলা জায়গায় রেখে দিল যাতে মাছি এসে বসে!

বেলা চারটের সময় ত্রিশজন ছেলে ফুল-ইউনিফর্মে কোয়ার্টার-গার্ডের সামনে ফল-ইন করল। তাদের ইন্সপেকশন করলেন সুবেদার সাহেব। প্রত্যেকটী ছেলের বুটের পালিশ, পট্টি বাঁধা, প্যান্টের ক্রীজ, জামার আস্তিন গুটান, হ্যাট পরা, সব কিছুই তিনি তন্নতন্ন করে দেখলেন। জনকয়েককে আবার বুট পালিশ করে আসতে হল! জনকয়েককে নতুন করে জামায় বোতাম বসাতে হল! দুজনের প্যান্টের ফিটিং ঠিক না হওয়ায় নামই কাটা গেল! পরিশেষে ফৌজের সাজগোজ সম্বন্ধে সুবেদার সাহেব বললেন, ফৌজকা ওয়ার্দি হোনা চাহি বিলকুল রেণ্ডিকা মাফিক! উয়ো যেতনা চমকায়গা ওতনা অফসরলোগ খুসী হোগা! ঔর তামাম আদমী জানেগা ফৌজ কোই ভিখ-মাঙনেওয়ালা নহি হ্যায়!

সাড়েচারটের সময় এক হাবিলদার সাহেব সিনেমা-স্কোয়াডের পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন, সিনেমা-স্কোয়াড, বাই-দি-রাইট, কুইক্-মার্চ—

প্রথম ধাপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মনে খটকা লেগেছে, তারা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে না প্যারেড করছে! সিনেমা দেখার জন্য যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু একান্ত প্রয়োজন সেটুকুও কি তারা পাবে না!

সিনেমার বই নির্বাচন থেকে বসার বন্দোবস্ত সবই হাবিলদার সাহেবের হুকুমমত করতে হল। সিনেমা ভাঙার পর মার্চ করে গৌহাটি

ষ্টেশনে যাওয়া, সিঙ্গল-লাইনে গাড়ীতে ওঠা, পাণ্ডুতে নেমে আবার ইন্-থ্রিজ ফল-ইন, সিঙ্গল-লাইনে ফেরী-ষ্টিমারে ওঠা, আমিনগাঁওয়ে আবার ফল-ইন, মার্চ করে ক্যাম্পে ঢুকে, হল্ট—রাইট-ড্রেস্—ডিস্মিস্!

ক্ষুধায় পেটে জ্বালা ধরেছে, রাগে সমস্ত শরীর আগুন হয়ে উঠেছে! ছেলেরা গুম হয়ে আছে, কথা কইলেই বুঝিবা বোমার মত ফেটে পড়বে! মশারীর মধ্যে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'কিরে, কেমন সিনেমা দেখলি?' আবার কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল 'কোন রেষ্টুরেণ্টে খেলিরে'?

সিনেমাপ্রত্যাগত ছেলেদের দাঁত কড়মড় করে ওঠে। ইচ্ছে হয় প্রশ্নকারীদের মুখের ওপর একটী ঘুঁষি জমিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেয়! ওরা কি জানে না একটা হাবিলদারকে যদি পাছায় লেলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কেমন সিনেমা দেখা হতে পারে! কোন উত্তর না দিয়ে মগ আর প্লেট নিয়ে তারা লঙ্গরে চলে যায়।

খাওয়ার জিনিষ যা কিছু সবই আলগা পড়ে রয়েছে! কালিপড়া লণ্ঠনটা দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরচ্ছে, আলোটা লালচে হয়ে উঠেছে, টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ত্রিশজন ছেলে সেখানে এসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। একজন বলল, আমি এসে দেখি একশালা কুকুব সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল!

আর একজন বলল, তাহলে নিশ্চয়ই খাবাবে মুখ দিয়েছে!

দূর, মুখ দেবে কেন রে! সেণ্ট্রী ডিউটী দিচ্ছিল!

কয়েকজন হাঁক পাড়ল লঙ্গর-কমাণ্ডারকে। একজন বলে উঠল, অনর্থক চেঁচামেচি করে লাভ কি, কোন কথা কি আর কানে যাবে! গাঁজার টানে এতক্ষণে বোধহয় শালাদের কানে তালা লেগে গেছে! যাও যাদুদের হাত ধরে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে এস।

কোথায় আছে বলনা, শালাদের ঘাড ধরে টেনে নিয়ে আসছি!

কোথায় আবার! ওই আবগারী টেণ্টে। দেখগে যা মদ, গাঁজা খেয়ে সব শালা কাৎ হয়ে পড়ে আছে!

আর অর্ডারলি এন্-সি-ও?

তিনি হয়তো সুবেদার সাহেবের পা টিপছেন!

তাহলে আমরা খাব কি?

খাবে আর কি, বুড়োআঙ্গুল চুষতে চুষতে শুয়ে পড়গে। মেজর সাহেব দয়া করে সিনেমা দেখতে দিলেন আবার খাওয়া!

জনকয়েক গজগজ করতে করতে তাঁবুর দিকে চলে গেল। বাকী যারা আছে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে, খাবার আমাদের দিতেই হবে, নাহলে সব শালা অফিসারকে টেনে এনে হাজির করব! শালারা মদ গিলে আর মাগী নিয়ে পড়ে থাকবে আর আমরা পেটের জ্বালায় ছটফট করব! মুখেতো দেখি সব শালাই গরীবের মা-বাপ্!

একজন বলল, চল শালা গরীবের মা-বাপ মেজর সাহেবের কাছে!

আর একজন দৌড়ে গিয়ে ক্ষিপ্তের মত বাসনগুলোর ওপর বুটশুদ্ধ লাথি মারতে লাগল। লাথির চোটে ভাত রাখার হুইলব্যারোটা উল্টে পড়ে গেল লণ্ঠনটার ওপর। বারকয়েক দপদপ করে উঠে লণ্ঠনটা গেল নিভে। হুড়মুড় করে একরাশ অন্ধকার যেন সমস্ত জায়গাটাকে গিলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন আঁতকে উঠল!

জমাদার সাহেব ছুটে আসেন। ছেলেরা থতমত খেয়ে যায়। ধমক দিলেন জমাদার সাহেব, ব্যাপার কি, রাতদুপুরে হট্টগোল করছ কেন?

একজন উত্তর দিল, আমাদের জন্য কোন খাবার নেই।

জমাদার সাহেব খিঁচিয়ে উঠলেন, তোমরা এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম।

তবে আর কি, আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছ! কে এমন তোমাদের কোলের মাগটি এখানে আছে যে ভাত আগলে বসে থাকবে! যাও, ওই যা আছে কুড়িয়েবাড়িয়ে খেয়ে শুয়ে পড়গে।

একজন রুখে ওঠে, ওতে কুকুরে মুখ দিয়েছে, ওসব খাওয়া চলে না।

জমাদার সাহেব বললেন, না চলে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়।

একটি ছেলে হঠাৎ আর সকলকে ঠেলেঠুলে জমাদার সাহেবের সামনে এসে বলল, কেনই বা আমাদের জন্য খাবার রাখা হয়নি?

জমাদার সাহেব বললেন, কে হে ছোকরা, খুব যে লম্বা লম্বা কথা কইছ দেখছি। সামনে এস তো একবার, দেখি তোমার চাঁদবদনটা!

জমাদার সাহেবের মুখোমুখি পা-ঠুকে দাঁড়াল ছেলেটি। ক্রূর হেসে জমাদার সাহেব বললেন, কি, তোমার কথার জবাব চাই নাকি?

ছেলেটি বলল, নিশ্চয়ই—কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমাদার সাহেব তার গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন।

কয়েকটি মুহূর্তের জন্য ছেলেরা স্তব্ধ হয়ে যায়। তার পরই ঝটা-পটির শব্দ, কয়েকটা গোঙানি, কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি! তারপর জমাদার সাহেবের আর্ত চিৎকার, গার্ড কমান্ডার! গার্ড কমান্ডার!

সবকটা তাঁবু থেকে ছেলের দল পিলপিল করে বেরিয়ে আসে। অনেকগুলো টর্চের আলোয় সকলকেই পরিষ্কার দেখা যায়। জমাদার সাহেবের জামাকাপড়ে কাদা মাখামাখি, মুখময় কাদা লেপা আর গালের কষ বেয়ে রক্তের একটি ধারা পড়ছে গড়িয়ে!

একটু পরেই সুবেদার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে জমাদার সাহেব ঢুকলেন গার্ড-রুমে। কয়েদী চারজন একটা শিলপারের ওপর বসে আছে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে। সুবেদার সাহেব তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে গার্ড-কমান্ডারকে তাড়া করে উঠলেন, এখনো এদের হ্যান্ড-কাফ লাগাওনি! হোয়াট দি ব্লাডি হেল আর ইউ ডুইং?

গার্ড-কমান্ডার থতমত খেয়ে ইরাকদানটার মধ্যে হাতড়াতে থাকে। অন-ডিউটী সেণ্ট্রী প্রাণপণে রাইফেলটা চেপে ধরে আর বেচারা স্পেয়াররা বিছানার ওপর বসে থাকার জন্য ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে! ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে জমাদার সাহেবের ফুলে-ওঠা মুখটার দিকে।

হ্যান্ড-কাফ লাগান হলে সুবেদার সাহেব একজনের চুলের ঝুঁটি ধরে বললেন, বল, কে তোমাদের একাজ করতে শিখিয়ে দিয়েছে?

ছেলেটি অবাক হয়ে সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুবেদার সাহেব স্বরের পর্দা নামিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, তোমাদের কোন দোষ নেই, পেছন থেকে কেউ তোমাদের উস্কিয়ে দিয়েছে।

ছেলেটি আরও ঘাবড়ে যায়। সুবেদার সাহেবের মোলায়েম স্বর আর সহানুভূতিতে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। গ্রামের সাধারণ ছেলে, সরল মনে ভাবে, সুবেদার সাহেব বুঝি তাদের ওপর দয়াপরবশ!

কিন্তু সুবেদার সাহেবের প্রশ্নের জবাব তারা কেউই দিতে পারল না। তারপর, এক একজনকে নিয়ে যাওয়া হল সুবেদার সাহেবের তাঁবুতে।

অতি মোলয়েম স্বরে সুবেদার সাহেব বললেন, তোমরা যে কাজ করেছ তার শাস্তি কি জান? তোমাদের গুলি করে মারা। কিন্তু বাঁচবার পথ এখনও আছে। বল, জয়ন্ত আর অমল তোমাদের কি কি বলেছে?

নির্বাক কয়েদীকে আপ্যায়ন করে নিজের বিছানার ওপর বসতে বলে তার কাঁধে হাত রেখে সুবেদার সাহেব আবার বললেন, জয়ন্ত আর অমল যে একাজ করতে তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই তোমরা ছাড়া পাবে। তার ওপর তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। যদি ছুটী চাও, কালই ছুটী নিয়ে বাড়ী যেতে পারবে! মাইনে বাড়িয়ে দেব আর ইচ্ছে করলে ল্যান্স-নায়েকও হতে পারবে।

ছেলেটি কান্নায় ফেটে পড়ল, আমিতো কেবল ওঁদের চিনি, কিন্তু কোনদিনতো ওনাদের সঙ্গে কথা কইনি স্যার!

জমাদার সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বললেন, তাতে কি হয়েছে! তোমরা চারজনেই যদি বল তা হলেই হবে। তাহলে তোমাদের শাস্তিটা তারাই পাবে আর তোমরা ছাড়া পেয়ে যাবে।

আধঘণ্টা তাদের সময় দেওয়া হল ভেবে দেখবার জন্য। একজন প্রায় রাজি হয়ে অপর তিনজনকে বলল, যদি শুধু ওঁদের নামটা বললেই আমরা ছাড়া পাই, তা মন্দ কি!

পাশে দাঁড়িয়েছিল সেন্ট্রী। সে বলে ওঠে, খবরদার বেইমানি করবি না! জান দিবি তবু ইমান দিবি না!

জয়ন্ত আর অমলকে যখন ফাঁসান গেল না তখন সুবেদার আর জমাদার সাহেব উঠলেন ক্ষেপে। সুরু হল মারধোর। চারজনের আর্ত-নাদে ক্যাম্পের ঘুমন্ত ছেলেদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাদের মধ্যে কেউ বারেকের তরে বিছানার ওপর উঠে বসে, কেউ কেউ বিছানার মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে আর কতক বারেক কান পেতে শুনে আবার পাশ ফিরে শোয়!

পরদিন সকাল দশটায় মেজর সাহেবের কাছে চারজনকে হ্যাণ্ড-কাফ পরা অবস্থায় পেশ করা হল। তাদের দেখেই মেজর সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন! রিভলভারটাকে হোলস্টার থেকে টেনে নিয়ে গর্জন করে ওঠেন, ব্লাডি, আই উইল সুট ইউ!

সুবেদার সাহেব পেশ করলেন, জমাদার সাহেব সাক্ষীর জবানবন্দী

দিলেন। শুনতে শুনতে মেজর সাহেবের আঙগুল কাটা রিভলভারের গ্রিপের ওপর নিসপিস করতে থাকে। জবানবন্দী শেষ হলে মেজর সাহেব তাদের নাকের ডগায় রিভলভারটা নাড়তে নাড়তে বললেন, ব্লাডি, তুম-লোগোঁকো হম আভভি গোলি করেগা! বোলো, ক্যা বলনেকা হ্যায়?

তাদের মধ্যে থেকে একজন যেন কিছু বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু মুখ থেকে কোন কথা বার হয় না, কেবল নীচের ঠোঁটটা কেঁপে ওঠে। মেজর সাহেব তার থুতনিতে একটি ঘুষি জমিয়ে দিয়ে বললেন, বোলো, জলদি!

হ্যাণ্ড-কাফ লাগান হাতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে ছেলেটি তার পাশের ছেলেটিকে আঁকড়ে ধরে কান্নায় ফেটে পড়ে, আমায় মেরে ফেলুন স্যার, খুন করুন, এখনি গুলি করুন! আর পারছি না স্যার!

মেজর সাহেব চিৎকার করে উঠলেন, সাট আপ—রিভলভারটাকে হোল-স্টারের মধ্যে রেখে বললেন, তোমাদের আমি কোর্ট-মার্শাল করব! পাগলা কুকুরের মত তোমাদের গুলি করে মারা হবে!

বিস্ফারিত চোখে চারজন কয়েদী মেজর সাহেবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর অফিসের প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে জমাদার সাহেবের ফুলে-ওঠা গালের ওপর তাদের দৃষ্টি থেমে যায়।

মেজর সাহেব বললেন, নন্দী, টেক দেম টু গার্ড-রুম।

সুবেদার সাহেব হাঁকলেন, এ্যাকিউজড এ্যাণ্ড এসকর্ট।

একটি ছেলে মাথা গুঁজে হঠাৎ মেজর সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে ওঠে, জমাদার সাহেবকে আমি মেরেছি স্যার! রাগে আর খিদেয় একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম! এমন কাজ আর কখনো করব না স্যার, হাজার গালাগাল খেলেও একটি কথা কইব না স্যার! মার খেতে খেতে মরে গেলেও কোনদিন হাত তুলব না স্যার! এবারকার মত আমার প্রাণটা ভিক্ষা দিন! আমার বিধবা মাকে লুকিয়ে আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি! আমি মরে গেলে আমার মা ও মরে যাবে স্যার!

মেজর সাহেব পাইপ ধরাতে ধরাতে হাঁকলেন, নন্দী—

সুবেদার নন্দী ঝুঁকে পড়ে সার্টের কলার ধরে ছেলেটিকে এক হেঁচকায় টেনে তুললেন। অন্য তিনজনের সঙ্গে একলাইনে দাঁড় করিয়ে

দিয়ে হাঁকলেন, এ্যাকিউজড এণ্ড এসকর্ট—টু দি গার্ডরুম—কুইক মার্চ—

সেইদিনই বেলা তিনটের সময় পুরো কোম্পানি ফল-ইন করিয়ে ওই চারজনকে হ্যাণ্ড-কাফ পরা অবস্থায় এনে মাঠের মাঝে দাঁড় করান হল।

মেজর সাহেব বললেন, এই চারজনকে কোম্পানি থেকে আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি। এরা সৈনিক হওয়ার অযোগ্য। যারা সামান্য ক্ষুধার জ্বালায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে তাদের স্থান মিলিটারীতে নেই। আমি চাই ইস্পাতের মত শক্ত মানুষ কিন্তু এরা মেয়েমানুষেরও অধম! কাল রাতে এরা কতবড় অপরাধ করেছে তা তোমরা জান। এদের শাস্তি দিতে হলে গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু এদের মত নপুংসককে সে শাস্তি দিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তাই আমি এদের কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দিলুম।

বক্তৃতা দিয়ে মেজর সাহেব চলে গেলেন। সুবেদার সাহেব চারজন ল্যান্স-নায়েককে হুকুম দিলেন, ওদের সমস্ত জামাকাপড় খুলে নাও।

গার্ড-কমাণ্ডার হ্যাণ্ড-কাফ খুলে নিয়ে চলে গেল। ল্যান্স-নায়েকরা একে একে ওদের বুট, মোজা, জামা খুলে নিল। ওরা চারজন দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পুতুলের মতন। বাকি কেবল প্যাণ্টটা! ল্যান্স-নায়েকরা একটু ইতস্তত করে। সুবেদার সাহেব তাড়া দেন, প্যাণ্ট খুলে নাও।

প্যাণ্টের বোতামে হাত দিতেই একটি ছেলে ল্যান্স-নায়েকটির হাত চেপে ধরে। গালফোলা জমাদার দাসগুপ্ত দৌড়ে গিয়ে এক হেঁচকায় ল্যান্স-নায়েককে সরিয়ে দিয়ে, টানাহেঁচড়া করে প্যাণ্টটা খুলে ফেলেন!

ফল-ইন করা স্যাপারদের মধ্যে থেকে কে যেন চাপা গলায় বলে ওঠে, দূর শালা! চাপা এই স্বর ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি ছেলের কানে কানে! তারা একটু নড়েচড়ে দাঁড়ায়। সমস্ত কোম্পানিটা গুম হয়ে থাকে।

সুবেদার সাহেব মেজাজ আরও চড়িয়ে হুকুম দেন, গলা ধাক্কা মারতে মারতে ওদের ক্যাম্পের বাইরে বার করে দাও!

ল্যান্স-নায়েকরা তাদের পিঠের ওপর হাত রাখতেই চারটি উলঙ্গ পুরুষমানুষ যান্ত্রিক গতিতে চলতে থাকে। সুবেদার সাহেব হাঁক দেন, কোম্পানি—এ্যাটেন—শান— তারপর বলতে সুরু করেন, আশা করি, এ দৃশ্য তোমাদের মনে থাকবে যতদিন তোমরা মিলিটারীতে আছ।

মিলিটারীতে ক্ষমা নেই—একটু থেমে ছেলেদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন। তাড়াতাড়ি হুকুম দেন, কোম্পানি—ডিসমিস—

ডিসমিস হবার পরও ছেলেরা যেন নড়তে পারছে না। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে তারা কেমন যেন জড়সড় হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে একজন দুজন করে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে, কারও মুখে একটি কথাও নেই।

হঠাৎ অনন্ত বলে ওঠে, আমরা এতগুলো লোক চুপচাপ এমন একটা অমানুষিক কান্ড দেখে গেলাম!

পাঁচকড়ি বলল, আমরা দু'চারজনে আর কি করতে পারি বল?

পারতুম পাঁচকড়ি, অন্তত অমলের মত প্রতিবাদও করতে পারতুম।

তাতে আর কি লাভ হত! অমলের মত আর-আই খাটতে হত! কিন্তু এদের অত্যাচারতো বন্ধ হত না!

অমল বলল, আমার একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি আছে, তোমাদের প্রাইভেট জামাকাপড় যা আছে দাও, ওদের দিয়ে আসি।

জয়ন্ত বলে ওঠে, ঠিক বলেছেন অমলবাবু। ক্যাম্পের ছেলেদের কাছ থেকে জামাকাপড় আর তার সঙ্গে কিছু টাকা যদি ওদের হাতে দিয়ে আসতে পারেন, তাহলে মেজর সাহেবের ওই লেকচারের মাপসই জবাব দেওয়া হবে।

পাঁচকড়ি লাফিয়ে ওঠে, ঠিক বলেছ জয়ন্ত। আর ওদের বলে দেব আমাদের দেওয়া জামাকাপড় পরে, পকেটে টাকা ঝনঝনিয়ে যেন ওরা কোম্পানি-অফিসের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যায়!

কোম্পানি যেন শিগগীরই মুভ করবে এমন একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে! আরও এগিয়ে যেতে হবে একথা ভাবতে ছেলেদের বুক কেঁপে ওঠে। সমস্ত বর্মাইতো এখন জাপানের দখলে, আসামের পূর্ব সীমানায় তারা প্রতীক্ষা করছে। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে যে জাপান সিঙ্গাপুর-থেকে মিচিনা দখল করেছে, তার কাছে আসাম আর কতদিন! আর তারা চলেছে সেই পূর্ব সীমান্তে! জাপানের হাতে নাস্তানাবুদ সৈনিক আর নাগরিক ইভ্যাকুয়ীদের চেহারাগুলো বারবার চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

ডিট্যাচমেণ্ট গুটিয়ে ছেলেরা ফিরে আসছে, আউট-ষ্টেশন থেকে

সকলকে উইদড্র করা হয়েছে, বুকিং সমস্ত ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্প আবার জমজমাট। শিবেন বলল, তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রাণটা নিয়ে আর ফিরতে দিল না দেখছি!

খগেন বলে ওঠে, এ শালার যুদ্ধ কি আর খতম হবে না! মস্কো লেনিনগ্রাদ কোনটাইতো ফল্ করল না! উল্টে জার্মানিই এখন পিছু হঠছে! তার মানে যুদ্ধ এখন চলতেই রইল!

সুনীল বলল, জার্মানির জন্যতো আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না। আমাদের ভাবনা জাপানকে নিয়ে। দুদিন বম্বিং করে সেই যে ঘাপটী মেরে বসে গেছে আরতো কোন সাড়াশব্দ শুনছি না। এদিকে এ শালারাও তৈরী হয়ে নিচ্ছে!

সন্তোষ বলল, কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না যে জাপান এসে আমাদের স্বাধীন করে দেবে।

স্বরাজ বলল, আর স্বাধীন হয়ে কাজ নেই, আগে প্রাণটাই বাঁচুক!'

অনন্ত বলল, কিন্তু প্রাণ আর বাঁচবে কোথা থেকে। এ শালারাইতো প্রাণটা বার করে দেওয়ার জোগাড় করেছে! আমার কি মনে হয় জান? এ যুদ্ধের সবকিছুই নির্ভর করছে ইউরোপের ওপর। কিন্তু হিটলার-বাবাতো দেখছি নাজেহাল! সমস্ত ইউরোপ তুড়ি মেরে দখল করে শেষে কিনা রাশিয়ায় একেবারে ন্যাজে-গোবরে হয়ে পড়ল!

জয়ন্ত বলে উঠল, আর ওই রাশিয়ার মাটিতেই হিটলারকে কবরে যেতে হবে! ওখানে জারিজুরি খাটবে না! সমাজতন্ত্রের দেশ, সেখানকার মানুষই আলাদা! প্রত্যেকটা মানুষ জানে, তার নিজের স্বার্থে লড়াই করছে। আমাদের মত ভাড়াটে সৈন্যতো আর নয়!

সুনীল বলল, তার মানে, রাশিয়ার কাছে হিটলার হেরে যাবে?

নিশ্চয়ই! রাশিয়ার জয় হবেই! রাশিয়া যে আজ আর আলাদা একটা দেশ নয়! রাশিয়া আজ দুনিয়ার মানুষের মুক্তির প্রতীক! যে সুখ আর যে শান্তির জন্য আমরা দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি সেই সুখ আর শান্তি তারা গড়ে তুলেছে!

বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে অমল জয়ন্তর কাঁধে একটা টোকা মেরে ডাকল, শুনুনতো, একটু বাইরে আসুন।

জয়ন্ত উঠে এসে বলল, ব্যাপার কি ?

আপনার সঙ্গে কথা আছে, একটু আড়ালে বলতে হবে।

অমলের মুখখানা উত্তেজনায় থমথম করছে। নদীর পাড় থেকে নেমে একেবারে জলের ধারে বসে জয়ন্ত বলল, কি ব্যাপার ?

অমল বারকয়েক আশপাশে দেখে নিয়ে বলল, জানেন, সুবেদার আর জমাদার সাহেব আমাদের দুজনকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিল ওই চার-জন ছেলেকে দিয়ে!

জয়ন্ত হেসে বলল, সেতো ওরা করবেই। এরই জন্যে আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন!

অমল বলল, না, ঠিক তা নয়, আরও খবর আছে। সোহরাব আমাকে আড়ালে ডেকে বলল।

কি বলল ?

ওই চারজন ছেলেকে এরা ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়েছে। ঘটনার দিন রাত্রে সুবেদার সাহেবের মারের চোটে একজনের দাঁত নড়ে যায়, একজনের জিভ কেটে যায় আর একজনের চোখে চোট লাগে—তা ছাড়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষততো হয়ই! পরদিন সকালে মেডিক্যাল এন-সি-ও হাবিলদার ব্যানার্জি ডাক্তার সাহেবের কাছে ওদের দেখায়। ঠিক হয়, পরদিন ওরা হাসপাতালে ভর্তি হবে। এই না শুনে মেজর সাহেবের ভয় ঢুকে যায়। মিলিটারী আইনে কারও গায়ে হাত তোলার অধিকার কোন অফিসারেরই নেই। হাসপাতালে গিয়ে যখন ওরা সব কথা বলে দেবে তখন নাকি হেড-কোয়ার্টার থেকে মেজর সাহেবের ওপর চাপ আসতে পারে। তাই মতলব করে ওদের দিল তাড়িয়ে আর অফিসের কাগজপত্তরে লিখে রেখেছে ডেজার্টার বলে!

জয়ন্ত গুম হয়ে থাকে! বাবেক কেবল 'হুম' করে একটা শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

অমল আরও বলে, আমরা যে ওদের জামাকাপড় আর টাকা পয়সা দিয়েছি তা জানতে পেরে মেজর সাহেব তেড়েফুঁড়ে উঠেছিলেন। সুবেদার সাহেব নাকি তাঁকে ঠাণ্ডা করেন। তবে সুবেদার সাহেব বলেছেন, আমাদের তিনি দেখে নেবেন!

জয়ন্ত উত্তেজনায় ফুলে উঠল, কিন্তু এ সমস্ত কথা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন কেন অমলবাবু! আপনার উচিত ছিল ওদের সকলের সামনে বলা। এদের মুখোস যতই খুলে দিতে পারবেন ততই আমাদের শক্তি বাড়বে। এই যে সোহরাব আপনাকে ডেকে এ সমস্ত কথা বলেছে, কেন বলতে পারেন? বলেছে এইজন্য যে, ও যা ভাবে, ও যা করতে চায় সে কাজ আপনি করছেন আগে।

নয়

কয়েকদিনের মধ্যেই কোম্পানি মুভ করল। বিরক্ত, বিমর্ষ, বিবর্ণ মুখে আবার ছেলেরা কোম্পানির যাবতীয় মালপত্র ওয়াগনে বোঝাই করে। বিছানা কাঁধে নিয়ে, বুকেপিঠে ওয়েব-ইকুইপমেন্ট এঁটে, তালে তাল মিলিয়ে মার্চ করে। কোথায় চলেছে, সে প্রশ্নটা বারম্বার মনকে নাড়া দিলেও প্রথমবারের মত ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে না। যাযাবর এই জীবনের ছাঁচে তারা অনেকখানি ঢালাই হয়ে এসেছে!

ফেরীঘাটে গিয়ে ষ্টীমারে ওঠে। আপার ডেকে উঠে ছেলেরা সার বেঁধে রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ায়। বর্ষার ব্রহ্মপুত্র দুকুল ভাসিয়ে হু-হু স্রোতে নেমে চলেছে। স্রোতের পানে চেয়ে চেয়ে দৃষ্টিবিভ্রম জাগে, কেন ইভ্যাকুয়ী সৈনিকের দল মিছিল করে নেমে আসছে!

কে একজন বলে ওঠে, ওরে, জাহাজটার নাম প্রিন্স-অফ-ওয়েলস!

আচম্বিতে মনটা আঁতকে ওঠে! প্রিন্স-অফ-ওয়েলস! অপরাজেয় প্রিন্স-অফ-ওয়েলস! আর জাপানীরাওতো খুব বেশী দূরে নয়!

পান্ডুতে নেমে নদীর ধারে প্রকান্ড এক মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। একজন হাবিলদার পাংশুমুখ ছেলেদের ওপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, ঘাবড়ো মত জোয়ান, কোম্পানি হিঁয়াই রহেগা।

একটি ছেলে বল্লল, এরই জন্য এত পাঁয়তারা! এই যে এতক্ষণ ধরে 'কোথায় যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি' করে হাঁপিয়ে মরলুম এর জন্য যে হার্টের অসুখ হয়ে যেতে পারে!

আর একটি ছেলে বলল, তা হোক! তা বলেতো হুকুম অমান্য করা যায় না। হেড-কোয়ার্টারের হুকুম, মুভমেণ্টের খবর গোপন রাখতে

হবে। সুতরাং তুমি যদি তাঁবু থেকে পায়খানায় যাও, সেকথা তুমি কাকেও জানাতে পারবে না।

মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে সুরু হল লেকচার। বিষয়টা হল, অবস্থার পরিবর্তন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতটে সমস্ত এলেকা সমরাঙ্গণ বলে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং নদী পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রবেশ করেছে খাস লড়াইয়ের মাঠে—ফিল্ড-সার্ভিসে! নদী পার হওয়ায় তারা হয়ে উঠেছে অগ্রগামি বাহিনী! এখানে তাদের দায়ীত্ব অনেক বেশী। এখন থেকে চলাফেরা করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে, সবদিক নজর রেখে, কথা কইতে হবে একেবারে মেপেজুকে। সিভিলিয়ানদের সঙ্গে মেলা-মেশা করা চলবে না, শত্রুর কান সর্বত্রই পাতা আছে!

একটি ছেলে বলল, শুধু ব্রহ্মপুত্র পার হওয়ায় এত কাণ্ড ঘটে গেল!

তা গেল না? এখান থেকে আর যে পালিয়ে বীরত্ব দেখানর পথ পাবে না! ওই ব্রহ্মপুত্রে ডুবে মরতে হবে!

খুশ-খবরও ছিল এর সাথে। ফিল্ড-সার্ভিসে আসার জন্য স্যাপারবা পাবে মাসে পাঁচটাকা ভাতা, বাড়ীতে চিঠি লিখতে পারবে বিনা ডাক-টিকিটে, মাথা পিছু র‍্যাশন এখন থেকে ডবল!

এই খবরটা দিয়েই কোম্পানিকে ডিসমিস করে দেওয়া হল। খুশীর যে রেশটুকু মনের মধ্যে গুঞ্জণ করতে থাকে তারই সূত্র ধরে ফেটীগ সুরু হয়। ওয়াগন খুলে তাঁবু নামিয়ে কাজ সুরু হয়ে যায়। মেজর সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে স্পেশ্যাল-পার্টি তৈরী করে হুকুম দেন, ম্যায় এক ঘণ্টাকে অন্দর হরেক জোয়ানকে লিয়ে চা রেডি মাঙতা—হুকুমটা এমন-ভাবে দেওয়া হয় যাতে কোম্পানির অধিকাংশ ছেলেরই কানে কথাটা পেঁছায়। ফেটীগ খাটার উৎসাহ যেন আরও খানিকটা বেড়ে যায়। সেই উৎসাহের মুখে ছেলেরা তাদের অজান্তে বারেক ভেবে ফেলে, নাঃ মেজর সাহেব লোকটা মন্দ নয়! প্রাণে মায়া মমতা আছে!

মাঠটা বেশ বড়ই। প্ল্যান হল, মাঝখানে থাকবে প্যারেড-গ্রাউণ্ড আর তার চারপাশে পড়বে তাঁবু। লোকো আর ট্রাফিক তাঁবু খাটান হয়ে গেলে আধঘণ্টার ব্রেক-অফফ। সেই ফাঁকে দেওয়া হল চা আর জ্যাম-বিস্কিট। মেজর সাহেবের জয় জয়কার পড়ে গেল।

পাণ্ডু ক্যাম্পের জীবনে নতুনত্ব কিছু না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ যেন আর একটু বেড়েছে। জায়গা অনেকখানি, তাঁবুও পড়েছে অনেকগুলো, তাঁবু পিছু লোকের সংখ্যাও কম। খাওয়ারও উন্নতি হয়েছে, মানে পরিমানের কড়াকড়ি অনেক কমেছে। জায়গা হিসেবে পাণ্ডু আমিনগাঁওয়ের তুলনায় অনেক ভাল। ওখান থেকে কামক্ষা যাওয়া যায়, গৌহাটি হেঁটেই ঘুরে আসা যায়। ষ্টেশনের ধারে বাজার, ষ্টেশনের ওপর ভাল চায়ের ষ্টল, বাজারের পাশেই রেলওয়ে-কলোনি। ক্যাম্পের সামনে রাস্তা ধরে দক্ষিণ মুখে কিছুটা হাঁটলেই বর্দ্ধিষ্ণু এক গ্রাম।

এখানে এসে টেকনিক্যাল ডিউটীর ওপর চাপ পড়েছে আরও বেশী। কোম্পানির দুই-তৃতীয়াংশ ছেলে নিজেদের ক্যাটেগরীর কাজে বহাল হয়েছে। কাজেই অবশিষ্ট ছেলেরা কোয়ার্টার-গার্ড ডিউটী থেকে লঙ্গরখানায় আলুছাড়ান ফেটীগ পর্যন্ত সমস্ত কাজই করে চলে।

কিন্তু আকস্মিকভাবে আর অতি সঙ্গোপনে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল কোম্পানিতে। জুলাই মাসের শেষ তারিখে মেজর রায় হঠাৎ কোম্পানি থেকে চলে গেলেন। চলে মাঝে মাঝে এর আগেও তিনি গিয়েছেন, আবার দু'একদিনেব জয়-ট্রিপের পর ফিরে এসেছেন। কিন্তু এবার আর ফিরলেন না। যেমন নিঃশব্দে মেজর রায় চলে গেলেন তেমনি নিঃশব্দে এলেন এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেজর। কোম্পানির ছেলেরা মেজর রায়কে না দেখে যতটা অস্বস্তি বোধ করেছে, তার চেয়ে বেশী অস্বস্তি বোধ করেছে পরদিন মেজর ব্রাউনকে দেখে।

শেষ পর্যন্ত কোম্পানি-অফিসের হাবিলদার-ক্লার্করা ঘটনার ওপর আলোকপাত করল। ক্রীপস-প্রস্তাব কংগ্রেস সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, দেউলিয়া ব্যাঙ্কের ওপর ফাঁকা-চেক ভারত গ্রহণ করবে না! এর ফলে ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে পড়েছে, যে কোনদিনই ভারতবাসীর বিক্ষোভ ফেটে পড়তে পারে। মেজর রায়ের অপসারণ নাকি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত! একে মেজর রায় বাঙালী, তার ওপর কোম্পানির অধিকাংশ ছেলেও বাঙালী! তাই ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ মেজর রায়কে সরিয়ে নিয়েছে। বিদ্রোহী বাঙালী জাতকে বৃটীশ সরকার বিশ্বাস করে না!

কোম্পানীর জীবনে এটা একটা রাজনৈতিক ঘটনা! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এ ব্যাপার জড়িত। কিন্তু এমন দিশেহারা ছেলেরা আর কোনদিন হয়নি! যে মেজর রায় বৃটীশের নীতিতে অত্যাচার আর নির্যাতন চালিয়ে এতগুলো মানুষকে ক্রীতদাসের পর্যায়ে এনে ফেলেছে, এ হেন বিশ্বস্ত অনুচরকেও বৃটীশ বিশ্বাস করে না!

ছেলেরা এই যেন প্রথম উপলব্ধি করে, মেজর রায় ছিলেন একজন বাঙালী! বাঙালী বলতে যে বিশেষ ধরণের চরিত্রকে বোঝায় তার কোন আভাষতো এই সুদীর্ঘ দিনের মধ্যে তারা পায়নি! তারা দেখেছে, মেজর রায় ছিলেন শুধুই একজন অফিসার! মিলিটারী আইনে বৃটীশ-অফিসার! যার কাজ হচ্ছে বেয়ণটের ডগায় আনুগত্য আদায় করা!

বিস্মিত বিমূঢ় ছেলের দল ভেবেছে, এ হেন মেজর রায় বিদ্রোহ করতে পারেন এ সন্দেহ যারা করেছে তারা আবার কোন জাতের লোক! মেজর রায় বিদ্রোহ করবেন কার বিরুদ্ধে?

৯ই অগষ্ট ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে আলোড়ন আনল তার প্রতিঘাত সৈনিকজীবনে বিরাট এক সমস্যার সৃষ্টি করল! জাতীয় নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করায় সৈনিকদের মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সংগঠন তাদের মধ্যে নেই! অত্যাচারে, নিষ্পেষণে তাদের জীবনকে দলে-পিষে দিয়েছে সামরিক কর্তৃপক্ষ, সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গেও তাদের নেই কোন যোগাযোগ। তাই পথ তারা জানে না তাদের বিক্ষোভকে প্রকাশ করার। জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষের দল রুদ্ধ-ক্রোধে ফুলে ওঠে নিস্ফল আক্রোশে ঠোঁট কামড়ে ধরে, হতাশায় মুহ্যমান হয়ে যায়!

ক্রীপস-মিশন সৈনিকদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। তারা যে অনাথের মত বৃটীশের খপ্পরে এসে পড়েছে, উপায় খুঁজে না পেয়ে অত্যাচার আর নির্যাতন সহ্য করে চলেছে, এই শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একটী মাত্র রাস্তা তারা দেখেছিল একটী জাতীয় সরকারের মধ্যে! জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের কলঙ্কিত এই সৈনিকের পোষাক গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠবে! মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা তারা পাবে।

কিন্তু ঘটনার গতি যেভাবে ঘুরে চলেছে তাতে তাদের সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। খবর এসেছে, কামপুর ষ্টেশনে এক জনতা মিলিটারী ষ্টেশন-মাষ্টারকে মেরে জখম করেছে! নওগাঁয় একটা মিলিটারী-ক্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে! গৌহাটীর রাস্তায় কয়েকজন সৈনিক লাঞ্ছিত হয়েছে!

এই খবরের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পের আবহাওয়া যায় বদলে। সমস্ত ক্যাম্প এলেকা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। কোম্পানির ওপর ব্যারাক্-কন্‌ফাইনমেন্টের হুকুম হয় জারি। ক্যাম্প-ডিফেন্সের জন্য ফ্লাইং-গার্ড মোতায়েন হয়ে যায়। ছোট ছোট ডিট্যাচমেন্টগুলো তুলে এনে বড় ডিট্যাচমেন্টগুলোয় রিইনফোর্সমেন্ট পাঠান হয়! কাম্পে পি-টি, প্যারেড সবই বন্ধ। তাঁবুর বাইরে ছেলেরা বড় একটা যায় না! সারাদিন গুম হয়ে বসে থাকে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে! কেবল ভাবে আর ভাবে! সে ভাবনার যেন আর শেষ নেই! এই দোটানার মাঝে তারা কি কববে? দেশের লোক তাদের শত্রু মনে করছে! আর দেশের যারা শত্রু তারা তাদের ব্যবহার করছে দেশের লোকের বিরুদ্ধে! কিন্তু দেশের দুয়ারে ফ্যাসিস্ট বর্বর থাবা মেলে রয়েছে বসে!

সুনীল বলে উঠল, ওঃ শেষ পর্যন্ত এই কপালে ছিল! শেষে কিনা সত্যিসত্যিই দেশের শত্রু হলাম!

পাঁচকড়ি প্রতিবাদ করে, শত্রুতো আর আমরা হইনি, ওরা শুধু শুধু আমাদের শত্রু মনে করছে।

শিবেন বলল, শত্রু ছাড়া আর কি! সারা ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ চলেছে তখন আমরা বৃটীশের হুকুমে তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছি!

জয়ন্ত বলল, এতো বিদ্রোহ হচ্ছে না, এ হচ্ছে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ! ভারতবর্ষটা বৃটীশের দেশ নয়, আমাদের দেশ!

খগেন বলল, ঠিকইতো। আর বৃটীশকে যদি কাবু করতে হয় সেতো আমরাই পারি। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে সে কাজ করলেইতো হত। তা না আমাদের পুড়িয়ে মেরে দেশ স্বাধীন হচ্ছে! কেন আমরা কি বৃটীশবাচ্চা নাকি?

পাঁচকড়ি ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে সকলকে চুপ করতে ইশারা করল। জমাদার দাশগুপ্ত তাঁবুতে ঢুকে বললেন, কিহে, কিসের মিটিং হচ্ছে?

পাঁচকড়ি বলল, মিটিং না স্যার! এই একটু গল্প-গুজব করছি!

এদিকওদিক একটু দেখে নিয়ে জমাদার সাহেব চাপা গলায় বললেন, শুনেছ, কলকাতায় ভীষণ কাণ্ড হচ্ছে। কংগ্রেসীদের সঙ্গে মিলিটারীর রীতিমত লড়াই সুরু হয়ে গেছে। এইভাবে আর কিছুদিন চলে, তাহলে আর জাপানকে ঠেকায় কে! কিন্তু জাপান যে কেন বর্মা দখল করে চুপচাপ বসে রয়েছে, বুঝি না! এইতো মৌকা! এই মৌকায় চটপট এসে ঢুকে পড়ুক! তাহলেতো সব ঝামেলাই চুকে যায়!

জয়ন্ত কি একটা বলার জন্য মুখিয়ে ওঠে, পাঁচকড়ি তার হাতটা চেপে ধরে। জমাদার সাহেব বললেন, আজ তোমাদের আটজনের নাইট-ডিউটী। ভাল করে ডিউটী দিও কিন্তু! এখানকার হালচাল তেমন ভাল নয়, অনেক রকম সন্দেহজনক খবর এসেছে!

শিষ দিতে দিতে জমাদার সাহেব বেরিয়ে গেলেন। পাঁচকড়ি জয়ন্তকে বলল, তুমি চট করে অমন মাথা গরম কর কেন! ও শালা কুত্তাকে ওসব কথা বলে লাভ কি?

জয়ন্ত ফুঁসে উঠল, দেখ একবার মজাটা! এখানে দেশশুদ্ধ লোক জাহান্নমে যাক তাতে ও'র কিছু এসে যায় না! ও'র যত ভরসা জাপানের ওপর! জাপান যেন শ্রীগৌরাঙ্গের চেলা হয়েছে আর মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, বর্মায় প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছে! এদেরই মত সব লোক আজ আমাদের মত মানুষের বৃটীশ-বিদ্বেষের সুযোগ নিচ্ছে! ও ভাবছে, জাপান ভারতে ঢুকলেই মোসাহেবি করে মেজর কি কর্ণেল হয়ে যাবে!

রাত দুটো থেকে চারটে ক্যাম্পের উত্তর-পূর্ব কোণে পাঁচকড়ির ফ্লাইং-গার্ড ডিউটী। রাইফেলটাকে স্লিং-আর্ম করে সে টহল দিচ্ছে। তার কাছে আছে দশরাউণ্ড গুলি, পাঁচরাউণ্ড লোড করা আর পাঁচরাউণ্ড পাউচ্-এ। তাদের ওপর ঢালা হুকুম, দিনের বেলায় পঞ্চাশ গজ দূরে হল্ট করান আর রাতের বেলায় পঞ্চাশগজের মধ্যে কাকেও দেখলে বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি করা।

ঘুম থেকে উঠে এসেছে পাঁচকড়ি, চোখে তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। আশপাশে বারকয়েক চেয়ে দেখল, একটা খুঁটিও নেই যে তাতে হেলান দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নেবে। বিরক্ত হয়ে জোর কদমে খানিকটা টহল

দিতে থাকে। ঘুমের আমেজটা কাটিয়ে নেওয়াই ভাল!

টহল দেওয়ার মাঝখানে কান খাড়া করে হঠাৎ পাঁচকড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। যেন চাপা একটা ফিসফিসানির শব্দ ভেসে আসছে! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কান পেতে! নাঃ, তেমন কিছু নয়, বোধহয় মনের ভুল! রাইফেলের ম্যাগাজিনে একটা চাপড় মেরে আবার টহল দিতে থাকে। আবার সে থমকে পড়ে! সত্যিই যেন অনেকগুলো লোকের চাপা স্বর ভেসে আসছে পূর্বদিক থেকে! নিশুতি অন্ধকার রাত, জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। কেবল দূর থেকে ওয়াগনের ঠোকাঠুকি আর ইয়ার্ড-পাইলটের হুইসিল্ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। কিন্তু তারই মাঝে সত্যিই যেন অনেকগুলো লোকের চাপা স্বর দূরে একটা জায়গায় জমে আছে! তার কপালটা কুঁচকে ওঠে, শরীরটা শিরশির করতে থাকে!

ক্যাম্পের সামনে প্রায় একশ'গজ ফাঁকা জায়গা, তারপর ইয়ার্ড! সব ক'টা লাইনে ওয়াগন ভর্তি। পাঁচকড়ির সন্দেহ হয়, ওই ওয়াগনগুলোর পেছন থেকে ভনভন শব্দটা ভেসে আসছে। রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মাজল্ মাটির দিকে নামাল। বুড়ো আঙুলে সেফটীক্যাচ্ ঠেলে দিয়ে বোল্ট পেছনের দিকে টানল। একটা রাউন্ড ছিট্‌কে পড়ল মাটীতে। হাঁটু গেড়ে বসে রাউন্ডটা কুড়িয়ে নিয়ে ম্যাগাজিনের মধ্যে পুরে দিল। নিল-ডাউন পজিশনে রাইফেল ধরে বাঁ চোখ বুজে, ডানচোখে 'ফোর-সাইটকা নক্ ঔর্ ব্যাকসাইট্‌কা ইউ' কিছুই দেখতে পেল না। অন্ধকারে সমস্তই একাকার হয়ে গেছে!

হঠাৎ পাঁচকড়ির মনে হয়, সত্যিই যদি লোকগুলো আক্রমণ করে! পাঁচরাউন্ড গুলিতে সে কি অতগুলো লোককে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে! ডানহাতে পাউচটা টিপে দেখে, আরও একটা চার্জার ভর্তি গুলি রয়েছে। কিন্তু ওই অতগুলো লোক যখন তেড়ে আসবে তখন কি আর সে লোড করার সময় পাবে! বাকী পাঁচরাউন্ড লোড করে নিলে কেমন হয়?

আগুনের একটা শিখা দেখে পাঁচকড়ি চমকে দুপা পেছিয়ে যায়। আগুনটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, টকটকে লাল আগুন আর তার কুণ্ডলি পাকান কালো কালো ধোঁয়ায় ইয়ার্ডের আলোটা ঢেকে যাচ্ছে। পাঁচকড়ির পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে।

কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম মিশে গিয়ে একটী ধারা হয়ে নেমে আসছে, বড় একটা ফোঁটা হয়ে ঝুলছে নাকের ডগায়। মাথার মধ্যে অনাদ্যন্ত রবে দপদপ করে চলেছে। হাতের চেটোয় সে তার সমস্ত মুখটা মুছে নিয়ে হ্যাটটা পেছনে ঠেলে দিল।

ওয়াগনের পেছনে সেই চাপাস্বর হঠাৎ চিৎকারে ফেটে পড়ল। পাঁচকড়ি রাইফেল কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখল। ব্যাকসাইটের মধ্যে দিয়ে ফোরসাইটের নক্ এবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। অনেকগুলো লোক গোটাকুড়ি মশাল হাতে জমা হয়েছে। তাদের রণধ্বনি ফেটে পড়ল, বৃটীশ—ভারত ছাড়।

পাঁচকড়ির হাত কেঁপে ওঠে। 'গুলজারিকে বিচেবিচ ছে বজে' থেকে রাইফেলের মুখ সরে যায়! তার শিথিল হাতের ওপর রাইফেলটা কাৎ হয়ে যায়! কেমন করে এদের ওপর সে গুলি চালাবে! এরা যে দেশভক্ত, ভারতের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রতিটী ভারতবাসীর শত্রু বৃটীশকে উচ্ছেদ করতে!

আবার চিৎকার উঠল, বৃটীশ—ভারত ছাড়! লোকগুলি জ্বলন্ত মশাল উঁচু করে দুরন্ত বেগে দৌড়ে আসছে। উন্মত্তের মত মশাল-গুলো মাথার ওপর তুলে ধরে প্রচণ্ড বেগে ঘোরাচ্ছে।

পাঁচকড়ি আবার রাইফেল মজবুত করে ধরেছে, বাটের ওপর তার উত্তপ্ত গাল চেপে ধরে নিশানা নিচ্ছে। আর বেশী দূর নয়, বড়জোর পঞ্চাশগজ! ক্যাম্পে পাঁচ'শ ছেলে ঘুমোচ্ছে! তার হাতে তাদের নিরাপত্তার ভার তুলে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! তারাতো দেশের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য মিলিটারীতে ভর্তি হয়নি! দেশেগাঁয়ে পেট চলেনি, সহরে চাকরি জোটেনি, বৃদ্ধ বাপ-মার মুখে অন্ন দিতে পারেনি, স্ত্রী পুত্র, ভাই বোনদের পেট ভরে খাওয়াতে পারেনি—তাই তারা আজ মিলিটারীতে!

রাইফেলের গ্রিপে পাঁচকড়ির হাত আরও চেপে বসেছে, বাটটা কাঁধের ওপর ঠেসে ধরেছে, পয়েন্ট-অফ-ব্যালান্সে তার হাত স্থির হয়ে গেছে, কেবল ট্রিগারের ওপর তর্জনিটা কাঁপছে!

পাঁচকড়ি চিৎকার করে ওঠে, হল্ট—এতজোরে চিৎকার সে বোধহয়

তার জীবনে আর কোনদিন করেনি। মশালের আগুন তখনো সেই উন্মত্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। আকাশবাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই একটী মাত্র রণধ্বনি, বৃটীশ—ভারত ছাড়!

পাঁচকড়ির শরীর টলছে। নিঃশ্বাস সে এবার বন্ধ করেছে, ট্রিগারের ফার্ষ্ট-প্রেসার নেওয়া হয়ে গেছে। তার কানে ক্যাম্পের পাঁচ'শ ছেলের অসহায় আর্তনাদ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। চোখ বুজে পাঁচকড়ি ট্রিগার দাবালে! বোল্ট টেনে আবার ট্রিগার দাবালে! আবার বোল্ট টানলে! আবার ট্রিগার দাবালে! আবার! আবার!

কোয়ার্টার-গার্ডের পাগলা-ঘন্টী তখনও বেজে চলেছে। ক্যাম্পের সমস্ত ছেলে মাঠের মাঝে ফল-ইন করে দাঁড়িয়ে আছে। গার্ড-ষ্ট্যান্ড-টু পজিশনে কোয়ার্টার-গার্ডের কোণে কোণে সেন্ট্রীরা খাড়া হয়ে গেছে। ফায়ার-ফাইটিং-পার্টি ফায়ার-এক্সটিনগুইজার নিয়ে অন-গার্ড পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াটার-ফেটীগের দল নদীর ধারে গিয়ে প্রাণপণে হ্যাণ্ড-পাম্প চালাচ্ছে।

সুবেদার নন্দী আর তিনজন অফিসার রিভলভার নিয়ে পাঁচকড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাঁচকড়ির চোখের ওপর মশালের আলোগুলো তখনো ঘুরছে! নেবুলার মত ঘুরছে! কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে!

কয়েকদিন পরের ঘটনা। আবহাওয়াটা যেন অনেক সরল হয়ে এসেছে! কোম্পানির স্বাভাবিক জীবন ধীরে ধীরে ফিরে আসছে!

সেদিনের ডাক এসে পেঁাচেছে। ছেলেরা অফিসের আশপাশে ঘুরঘুর করছে, কখন অর্ডারলি এন-সি-ও চিঠির বাণ্ডিলটা নিয়ে বেরিয়ে আসবে! একখানি চিঠির প্রত্যাশায় সমস্ত মনটা তাদের আকুলিবিকুলি করতে থাকে। তাদের ফেলে-আসা জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের ওইতো একটী মাত্র গ্রন্থি! চিঠির মধ্যেকার দুটো স্নেহের কথা, দুটো সহানুভূতির কথা, তাদের হিতাহিতের জন্য কারও আকুল আকুতি, তাদের পথ চেয়ে কারও অধীর প্রতীক্ষা—ওইটুকুই সৈনিকজীবনের পাথেয়! চিঠিই তাদের মানবীয় জীবনের সম্বল।

ডাক বিলি হয়ে গেছে। যাদের চিঠি এসেছে তারা খুশীতে ভরপুর

হয়ে একান্তে গিয়ে চিঠি পড়তে বসেছে। যাদের আসেনি তারা মুখ ভার করে শুয়ে পড়েছে! চোখ বুজে কপালের ওপর হাত রেখে ভাবছে বাড়ীর লোক কেন তার প্রতি এমন নির্মম! তাকে কি আর তাদের কোন প্রয়োজনই নেই! অভিমানে তাদের বুকের মধ্যেটা গুমরে গুমরে ওঠে।

অমল পেয়েছে একখানা চিঠি। চিঠিখানা পকেটে রেখে সে অন্য সমস্ত কাজ শেষ করেছে একে একে। শত কাজের মধ্যে বারবার সে বুক পকেটের ওপর চাপ দিয়ে খামখানাকে অনুভব করেছে। থেকে থেকে আনমনা হয়ে ভেবেছে, কে লিখেছে—বাবা? বিমল? কমল? মিনি? রিণি কি তার এঁ্যাকাবাঁকা অক্ষর দিয়ে একখানা কাগজ ভরে দিয়েছে! চোখের ওপর ভেসে উঠেছে তাদের ছোট্ট গৃহখানি! আনাচে-কানাচে তার কতইনা স্মৃতি মাখান! বারবার তার চোখে জল এসেছে!

সব কাজ সেরে ব্যারাকে ফিরে বিছানা পেতে শুয়ে অমল হাত-পা ছড়িয়ে দিল, এইবার সে চিঠিটা পড়বে। একথা ভাবতেই যেন মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে। তাহলে সে এখনো বেঁচে আছে! তার জীবনকে ঘিরে আছে আরও অনেক লোক! খামখানা সে খুলে ফেলল--

পূজনীয় মেজদা,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাইনি। তোমার জন্য ভেবে ভেবে আমরা পাগল হয়ে যাব নাকি! এখানে যে সমস্ত কান্ড হচ্ছে, তা দেখেতো আর স্থির থাকা যায় না। মিলিটারীরা যে অত্যাচার করছে সেতো আর সহ্য করা যায় না।

তুমি মিলিটারীতে কেন গেলে মেজদা! তোমার জন্য লজ্জায় বাবা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। ছোড়দার বন্ধুরা বাড়ী বয়ে এসে যা-তা বলে গেল! সেই-না শুনে রিণিটা কেঁদে-কেটে অস্থির হচ্ছে। ওরাতো জানেনা, তুমি কেন মিলিটারীতে গিয়েছ।

এখানে রোজ মারামারি হাঙ্গামা লেগেই আছে।, কত ছেলে যে মিলি-টারীর গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে, তার যেন আর ইয়ত্তা নেই। দেশশুদ্ধ লোক তোমাদের বিশ্বাসঘাতক বলছে। মিলিটারী দেখলেই তাদের ওপর ইট-পাটকেল মারছে। এরকম হলে তুমি কি করে বাঁচবে মেজদা?

তুমি মিলিটারী থেকে চলে এস মেজদা। লোকে তোমাকে শুধুশুধু গালাগালি দেবে, এ আর আমরা সইতে পারছি না। রিণিটা পাশে বসে

কাঁদছে আর বলছে, মেজদাকে পালিয়ে আসতে লিখে দে দিদি! আবার বলছি, মেজদা তুমি চলে এস—এমন মিলিটারীতে তুমি থেকনা। তোমার জন্য আমরা পথ চেয়ে রইলুম—

ইতি

তোমাব আদরের বোন

মিনি আর রিণি

অমলের চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে। চিঠিটার আখরগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, তার মধ্যে মিনি আর রিণির মুখদুটি যেন ভসছে! অমলের মনে হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, আদরের বোন! সত্যিই বড় আদরের!

হঠাৎ ফোঁপানির একটা শব্দে অমল চমকে ওঠে। শিবেন উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মাথা গুঁজে কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। খগেন উঠে গিয়ে শিবেনের পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বলল, কি হয়েছে শিবেন?

শিবেন তার চিঠিটা খগেনের হাতে দিয়ে বালিশের ওপর মুখ চেপে ধবল। খগেন চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে চলল। ধীরে ধীরে তার মুখটও ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। বাকী সকলে তার মুখের ভাব লক্ষ্য করছে।

অমল জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি খগেন?

শিবেনের বন্ধুর চিঠি! খগেন পড়তে সুরু করে, গত ১২ই অগষ্ট বিকেলবেলা তোর মা সুখেনকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পাঠান, কোথায় যেন সেদিন তোদের নেমতন্ন ছিল। বাড়ীর লোকের কাপড়-চোপড় পরা হয়ে গেছে, সুখেনেরও সাজগোজ হয়ে গেছে। হেদুয়ার মোড়ে যায় ট্যাক্সি ডাকতে। ঠিক সেই সময় একটা ট্রামে একদল লোক আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ আর মিলিটারীতে লোকগুলোকে তাড়া করে। বাচ্চা ছেলে সুখেন ধুতি পরে তেমন দৌড়তে পারে না। নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের মোড়ে লোকের ঠেলাঠেলিতে কাপড়ে পা আটকে পড়ে যায়। একটা সার্জেন্ট সেই অবস্থায় তার পিঠের ওপর পর পর চারটে গুলি করে। তারপর পাড়াশুদ্ধ লোক সুখেনকে কোলে করে নিয়ে যায় তোদের বাড়ীতে। জানিস শিবু, তোর মা কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেন নি!

খগেন চুপ করল। আর সকলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শিবেনকে সান্ত্বনা দেবে! কিন্তু কি বলবে শিবেনকে!

পাঁচকড়ি ছিল চুপচাপ চোখ বুজিয়ে শুয়ে। হঠাৎ সে আপন মনে বিড়বিড় করে উঠল। অমল তার পাশে গিয়ে বলল, তুমি চুপ কর পাঁচকড়ি, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

পাঁচকড়ি তেড়ে উঠল, কেন আমি চুপ করব? আমরা বুঝি দেশের লোক নই! মিলিটারীতে ঢুকেছি বলে দেশের শত্তুর হয়ে গেলুম?

অমল পাঁচকড়ির কপালে হাত রেখে বলল, আর কথা বল না।

পাঁচকড়ি চেঁচিয়ে উঠল, কথা বলব না মানে! চোখ বুজলেই যে জ্বলন্ত মশালের সেই আলোগুলো তাড়া করে আসে! আর সেই ছেলেটির চীৎকারে কানে যেন তালা ধরিয়ে দেয়! আর ওই শালা লেফটেনান্ট-গুলো কিনা আমার পিঠ চাপড়ে বলল, সাবাস, দিস্ ইজ্ এ গ্যালাণ্ট সোল্জার! আমার কি ইচ্ছে হয়েছিল জান, ম্যাগাজিনের বাকী গুলি-গুলো দিই চালিয়ে ওই শালা কুকুরগুলোর ওপর! কিন্তু আমি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, না?

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে কি সে মনে করবার চেষ্টা করে, তারপর হঠাৎ অমলের একটা হাত চেপে ধরে বলে, আচ্ছা অমল, আর ছ'মাস আগে আমিওতো ওদেরই একজন ছিলাম আর আজ কিনা ওরা আমাকে শত্রু মনে করে! কিন্তু আমরা কি শিবেনের ভাইকে গুলি করে মারার জন্য মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি? বল? তুমিই বল!

বিছানা থেকে পাঁচকড়ি উঠে পড়তে চায়। অন্য ছেলেরা বিমর্ষ মুখে তার দিকে চেয়ে থাকে। অমল জোর করে তাকে শুইয়ে রাখে, খগেন ওয়াটার-বটল থেকে জল নিয়ে তার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেয়, অনন্ত হ্যাট দিয়ে তার মাথায় হাওয়া করতে থাকে।

এরই ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে সুবেদার সাহেব এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ওপর প্রথম চোখ পড়ে খগেনের। খগেন বলল, পাঁচকড়ি আবার সেই রকম ক্ষেপে উঠেছে স্যার! আর শিবেনের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ওর ছোটভাই পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

সুবেদার সাহেব শিবেনের পাশে বসে পড়েন। শিবেন উঠে বসে

মুখে হাত চাপা দেয়। সুবেদার সাহেব ক্ষণেকের জন্য অস্বস্তি বোধ করেন। তারপর শিবেনের পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, এই হল, পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত শিবেন! তুমি আমি এর কি বিহিত করতে পারি!

বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলে সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে তাকায়। সুবেদার সাহেব চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,কই, শিবেনের চিঠিটা দেখি?

খগেন চিঠিখানা সুবেদার সাহেবের হাতে দিল। চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করতে করতে সুবেদার সাহেব বললেন, চিঠিটা পড়ে আমি ব্যাটম্যানের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি—শিবেনের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, শিবেন, তোমার আজ ছুটী, বিকেলের প্যারেড মাফ!

সেদিন রাতে রোল-কলে নতুন কোম্পানি-অর্ডার জারি হল, এখন থেকে কোম্পানির ছেলেদের সমস্ত চিঠি যা তারা বাড়ী থেকে পাবে, সেগুলোও সেন্সর করা হবে!

দশ

কেটে গেছে দেড়টী মাস। অগষ্ট আন্দোলনের শেষ রেশটুকুও থেমে গেছে। পাঁচকড়ি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে, শিবেন আবার সহজ জীবনে ফিরে এসেছে, অমল তার মনের হতাশাকে কাটিয়ে উঠেছে।

জার্মানরা মস্কো দখল করতে পারেনি! লেনিনগ্রাদের দিকে আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারেনি! এবার তারা ঢুঁ মারছে ককেসাসের দিকে! ইম্ফল অবরোধ করে জাপান সেই একইভাবে বসে রয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এই মন্দাভাব কোম্পানিতে এনেছে অলস মন্থর একটা আমেজ!

মেজর ব্রাউনের দৌলতে তাঁবুতে তাঁবুতে বাঁশের মাচা হয়েছে! খেলাধূলার হরেক রকম ব্যবস্থা হয়েছে! ছেলেদের জন্য ষ্টেটস্‌ম্যান আর ফৌজি-আকবর নেওয়া হচ্ছে! গানবাজনার জলসা সপ্তাহে অন্তত একবারও হচ্ছে! চার্জ-সীটের সংখ্যা কমেনি কিন্তু কয়েদীর সংখ্যা কমেছে! আর-আই না দিয়ে তিনি সাধারণ ভাবে মাইনে কেটে নেন। ছেলেরা মনে করে আর-আই'এর বদলে মাইনে কাটা নতুন মেজর সাহেবের দয়ালুতা!

দুর্গাপূজা উপলক্ষে কোম্পানিতে দুদিন ছুটী, অষ্টমী আর বিজয়ার দিন। অমল তাঁবুর মধ্যে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

মেজর ব্রাউন ছুটীর দিন সিভিলিয়ান পোষাক পরার অনুমতি দিয়েছেন। জনকয়েক ছেলে আর কিছুক্ষণ আগে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে রেলওয়ে-কলোনির পূজামণ্ডপে গেছে। তাদের পোষাক-আসাক দেখে অমলের মনটা কেমন যেন আনচান করে ওঠে। বারবার তার মনে হয়, মিনি আর রিণির জন্য পূজোর জামাকাপড় কেনা হয়েছে কি?

পাঁচকড়ি আর অনন্ত তাঁবুর মধ্যে ঢুকল। পাঁচকড়ির আছে একটা সিভিলিয়ান-সার্ট, সেইটাই সে খাকি ফুল-প্যান্টের ওপর চড়িয়ে নিয়েছে।

অমলকে শুয়ে থাকতে দেখে অনন্ত বলল, তোমার কি হল অমল?

পাঁচকড়ি বলল, আর কি, বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে!

অমল উঠে বসে বলল, সত্যিই একটু মন-কেমন করছে। বাবা কিছুতেই পূজোর সময় কাকেও বাইরে যেতে দিতেন না। এই বোধহয় প্রথমবার পূজোর সময়ে বাড়ীর বাইরে রইলুম।

অনন্ত আর পাঁচকড়ির মুখটাও ক্ষণেকের জন্য করুণ হয়ে ওঠে। পাঁচকড়ি সামলে নিয়ে বলল, গুলি মার ওসব সেণ্টীমেণ্টাল ব্যাপারে, তার চেয়ে জমাটী একটা আড্ডা জমিয়ে নরক-গুলজার করা যাক!

অনন্ত বলল, সুনীলতো সেই সকালে বিল্বমঙ্গলটীর মত নদী পার হয়ে তার চিন্তামণির সন্ধানে গেছে।

অমল বলল, তবুওতো সে একটা কিছু করছে। কিন্তু আমাদের কি!

তাহলে কি আমরা তিননম্বর গেটের পথ ধরব নাকি?

তা আমি বলছি না কিন্তু আমাদেরও কিছু একটা করা উচিত, বড় নির্জীব হয়ে পড়ছি!

কিন্তু কি করতে চাও তুমি?

পাঁচকড়ি বলল, দাঁড়াও, ওদের সকলকে ডাকি, মতলব একটা চট করে ফেঁদে ফেলা যাবে—তাঁবুর বাইরে গিয়ে সে নাম ধরে হাঁকডাক সুরু করে দিল। একে একে এল খগেন জয়ন্ত আর শিবেন।

তাঁবুর মধ্যে ওরা ঢুকতেই অনন্ত বলে উঠল, এই পূজোতে একটা কিছু উৎসব আমাদের করতেই হবে।

শিবেন বলল, এটা কি আর উৎসব করার জায়গা! এখানে বসে শুধু মরণের দিন গোণা চলে!

জয়ন্ত ধমক দিয়ে ওঠে, আঃ শিবেন, এমন করলে আর বাঁচবে কদিন! দেখ, বাঁচার দায়ীত্বটা আমাদেরই, কাজেই তার রসদ আমাদেরই জোগাড় করে নিতে হবে।

শিবেন বলল, কর তাহলে, আমি কিন্তু তেমন জোস্ পাচ্ছি না।

পাঁচকড়ি বলল, তাহলে একটা থিয়েটার কর।

জয়ন্ত বলল, অত সময় কই! তার চেয়ে একটা বিজয়া সম্মিলনী করা যাক। বিজয়ার দিন একটা ভোজ আর ছোট্ট একটা ষ্টেজ বেঁধে ভ্যারাইটী শো। কোম্পানির ছেলেরা যে যা জানে, নাচ গান আবৃত্তি কমিক ম্যাজিক সবই সেইদিন দেখাবে।

কিন্তু চাঁদা আর কত উঠবে! দেবেতো শুধু হিন্দুরা।

জয়ন্ত বলল, কেন! মুসলমানরাও দেবে। আমরা তো আর ফুল-বিল্বিপত্তর নিয়ে পুজো করতে যাচ্ছি না! আমরা করতে চলেছি সমস্ত কোম্পানিকে নিয়ে একটা উৎসব, বিজয়াটা তার উপলক্ষ্য মাত্র।

অনন্ত বলল, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটী বাঁধবে কে?

জয়ন্ত বলল, কেন, আমরা। এখনই তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে আমাদের মতলবটা জানাব। তাঁবুর লোকেরা তাদের একজন করে প্রতিনিধি ঠিক করবে। সেই প্রতিনিধিরাই সমস্ত ব্যবস্থা করবে।

পাঁচকড়ি বলল, কিন্তু এর মধ্যে কোন এন-সি-ও নেওয়া হবে না।

খগেন সমর্থন করে, কোনমতেই না। ওরাতো কাজের চেয়ে মাতব্বরীই করবে বেশী আর শেষ পর্যন্ত দেবে ভণ্ডুল করে!

অমল বলল, আমরা কজনে এখানে বসে এই রকম একটা নিয়ম খাড়া করতে পারি না। যদি কোন এন-সি-ও'কে কোন তাঁবু তাদের প্রতিনিধি করে পাঠায় তাহলে আমরা তাকে মেনে নিতে বাধ্য।

জয়ন্ত বলল, তার চেয়েও একটা বড় কথা আছে অমলবাবু। এন-সি-ও মাত্রেইতো আর আমাদের শত্রু নয়। লান্স-নায়েক দত্ত বা মেডি-ক্যাল এন-সি-ও হাবিলদার ব্যানার্জি হাবিলদার মুখার্জির জাতের মানুষ নয়। কাজেই, মাতব্বরী বা ভণ্ডুল করার মতলব না নিয়ে যারাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে আমরা নিশ্চয়ই তাদের নেব।

সমস্ত ক্যাম্পে একটা সাড়া পড়ে গেছে। সকলেই এই উৎসবে

রাজি! তাদের মহা উল্লাস, মরা গাঙে আবার যেন জোয়ার এসেছে! চাঁদা উঠতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে চাঁদার অংক বাড়তে থাকে। তাঁবুতে তাঁবুতে কবিতা মুখস্থ চলেছে, সিলেক্টেড-সীন আর কমিকের রিহার্শাল চলেছে। ম্যাজিশিয়ান বৃদ্ধ গোপমশাই তাঁর আনুষঙ্গিক জোগাড়ের চেষ্টায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গানের রিহার্শাল দিচ্ছে একটা তাঁবুর মধ্যে, 'জন গণ মন' কোরাস গানে ক্যাম্পটা মুখর হয়ে উঠেছে।

জয়ন্ত অমলকে বলল, এই হচ্ছে সুযোগ অমলবাবু, দিন এদের ধরে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে। যত রকমের বেড়া এখানে আছে, লোকো ট্রাফিকের বেড়া, শিক্ষিত অশিক্ষিতের বেড়া, মাইনের তারতম্যের বেড়া, ধর্মভেদের বেড়া, এমন কি র‍্যাঙ্কের বেড়া সব ভেঙে খান্-খান্ করে দিন।

লাঙ্গরীদের ছুটী দিয়ে 'বড়-খানা'র জন্য রান্নাজানা ছেলেদের নিয়ে একটা দল হল। ভ্যারাইটী-শোয়ের ষ্টেজ বাঁধা আর তার সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য হল একটী দল। বাজার থেকে খাবার ও অন্যান্য জিনিষপত্তর কিনে আনার জন্য একটা দল, চাঁদা তোলার একটা দল, খাওয়ার সময়ে পরিবেশন করার জন্য একটা দল। ভ্যারাইটী শোয়ের অভিনেতাদের অন্য সমস্ত কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হল। সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করার জন্য ভার পড়ল অমল জয়ন্ত আর অনন্তর ওপর। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, জনকয়েক এন-সি-ও ছাড়া ক্যাম্পের প্রায় সবছেলেই একটা না একটা কাজে লেগে গেছে। ছেলেরা নিজেরাই দলে দলে গিয়ে মোটা মোটা স্লিপার কাঁধে করে আনছে সমস্ত ক্যাম্পটাকে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলেছে। কোথায় কি করতে হবে না হবে তারা নিজেরাই আলোচনা করে স্থির করছে আর সেই অনুযায়ী কাজ করে চলেছে।

অমল দেখে আর ভাবে কোম্পানির নিত্যনিয়মিত ফেটীগওতো এই একই পর্যায়ের কাজ, অথচ কোম্পানি-ফেটীগের সময়ে ছেলেরা তার সবটাই ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। আর আজ! তারা সমস্ত দরদ ঢেলে দিয়ে দৈত্যের মত কাজ করে চলেছে!

অনন্ত এসে খবর দেয়, জনকয়েক হাবিলদার আর নায়েক চাঁদাতো দিচ্ছেই না উপরন্তু অন্য এন-সি-ও'দের ভাঙানর চেষ্টা করছে। অমল

মুষড়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত একটা গন্ডগোল কি তাহলে হবেই!

জয়ন্ত বলল, এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই অমলবাবু। কোম্পানির সাধারণ ছেলেদের ওপর বিশ্বাস রাখুন, আমাদের উৎসব সফল হবেই! ওদের এই বিরোধীতার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ওদের মুখোস পড়বে খসে আর আমাদেরও মোহমুক্তি ঘটবে।

সন্ধ্যের কিছু পরে একটী ছেলে এসে খবর দেয়, সুবেদার সাহেবের ঘরে দেখলাম মিটিং বসেছে। জমাদার সাহেব, হাবিলদার মুখার্জি, নায়েক চ্যাটার্জি আরও যেন কে কে রয়েছে। লুকিয়ে আমি শুনলুম, আমাদের বিজয়া সম্মিলনী সম্বন্ধে কি যেন বলাবলি করছে।

ছেলেটীকে অমল চিনতে পারল না। জয়ন্ত বলল, এখন থেকে দেখবেন এমন অনেক অচেনা ছেলে এমনি ভাবে নানান খবর নিয়ে ছুটে আসবে। তারাও সজাগ আছে, এ উৎসব যে তাদেরই!

রোল-কলে জমাদার আর সুবেদার সাহেব দুজনেই এসেছেন। সুবেদার সাহেব বিজয়া সম্মিলনী সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ দিয়ে মেজর সাহেবের মহানুভবতার লম্বাচোড়া প্রশস্তি গেয়ে চুপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জমাদার সাহেব বললেন, কারও কিছু বলবার থাকলে বলতে পার।

নায়েক চাটুয্যে বলল, আমার স্যার একটা কথা বলবার আছে!

সুবেদার সাহেব অনুমতি দিলেন, ঠিক হ্যায়—বল।

অমলের মনে পড়ে সেই ছেলেটীর রিপোর্ট। তাহলে এরা ষড়যন্ত্র করে এসেছে বিজয়া সম্মিলনীর ওপর আঘাত হানতে!

নায়েক চাটুয্যে বলল, কোম্পানিতে যে বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে তার কে যে কি করছে তা আমরা কেউই জানি না। অথচ দেখছি সকলের কাছ থেকেই চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। এটাতো আর কারও ঘরোয়া ব্যাপার নয়! এর জন্য কোন কমিটি হয়েছে কিনা তাও আমরা জানি না। মিলিটারীতে থেকে একটা কাজ যদি ডিসিপ্লিনের সঙ্গে না করতে পারি, তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি থাকতে পারে!

রোল-কলের মধ্যে থেকে একটা স্বর বলে ওঠে, আপনি কত চাঁদা দিয়েছেন মশাই!

নায়েক চাটুয্যে বলল, চাঁদা দেওয়ার জন্য আমি এখনো তৈরী।

কিন্তু যার-তার হাতে আমি চাঁদা দেব না।

সুবেদার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের চাঁদার টাকা কার কাছে জমা হচ্ছে?

কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠল, অমলবাবুর কাছে।

জমাদার সাহেব খেঁকিয়ে ওঠেন, বাবু-টাবু এখানে চলবে না। কেন ব্যাপার বলতে কি লজ্জা করে নাকি?

সুবেদার সাহেব অমলকে সামনে ডাকলেন। অমলের কানে কানে জয়ন্ত ফিসফিস করে বলে দেয়, সাবধান অমলবাবু, ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়েছে! মনে রাখবেন আপনি হচ্ছেন কোম্পানির সবকয়টী ব্যাপারের প্রতিনিধি!

অমলকে সুবেদার সাহেব বললেন, আমি কোন কৈফিয়ৎ তলব করছি না। কোম্পানির ছেলেরা জানতে চায় বিজয়া সম্মিলনী সম্বন্ধে কি কি বন্দোবস্ত তুমি করেছ।

অমলের বুকটা কেঁপে ওঠে, তার গলাব স্বর কেমন যেন বুজে আসে। রোল-কলের মধ্যে থেকে কে একজন বলে ওঠে, বলুন অমলবাবু আমরা আছি আপনার পেছনে!

ছেলেটীর কথাগুলো অমলের কাছে বড় আপনার বলে মনে হয়, যেন তারা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে বল পেয়ে অমল বলতে সুরু করে, বন্দোবস্ত আমি কিছুই করিনি, করেছে কোম্পানির ছেলেরা। প্রত্যেক তাঁবু থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটী কমিটি হয়েছে। সেই কমিটি আমার ওপর ভার দিয়েছে চাঁদার টাকা রাখার, ভ্যারাইটী শোয়ের ভার দিয়েছে অনন্তর ওপর আর খাওয়াদাওয়া ও অন্য সমস্ত কাজের ভার দিয়েছে জয়ন্তর ওপর।

জমাদার সাহেব খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বাঃ, বেশ পাকা-পোক্ত ব্যবস্থাটী হয়েছেতো! তিনটীই দেখছি বাছাই করা চীজ'!

রুদ্ধ আক্রোশে সমস্ত রোল-কল একবার যেন ফুঁসে উঠল।

নায়েক চাটুয্যে বলল, আসলে ওই তিনজন যা খুশী তাই করছে। আর ওই কমিটি হচ্ছে ও'দের লেজুড়ের দল। আমি প্রস্তাব করছি, সুবেদার সাহেবকে প্রেসিডেণ্ট করে আর তিনজন হাবিলদার, দুজন

নায়েক, একজন ল্যান্স-নায়েক আর পাঁচজন স্যাপার নিয়ে এই রোল-কলেই একটা কমিটি গঠন করা হোক।

জমাদার সাহেব বললেন, সুবেদার সাহেবকে প্রেসিডেন্ট করতে কারও আপত্তি আছে নাকি?

রোল-কল সমস্বরে ফেটে পড়ল, আমরা যা করেছি তার ওপর আর কোন রদবদল চলবে না!

সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার সাহেব হাঁকলেন, রোলকল, ডিস্‌মিস্‌—

বিজয়া সম্মিলনীর পরদিনই অমলকে লাইনে বুক করা হল! সুবেদার সাহেব হঠাৎ বুঝতে পেরেছেন, অমলের ক্যাটেগরী যখন গার্ড তখন সেকাজ তার শেখা উচিত!

অনন্ত অমলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, এইবার তাহলে সুবেদার সাহেব আমাদের ভয় করতে সুরু করেছেন!

ষ্টেশনে পেঁছে অমল দেখে তাদেরই কোম্পানির মনু সেই ট্রেণের ওয়ার্কিং-গার্ড। মনু বলল, তাহলে আপনাকেও লাইনে পাঠালে!

অমল বলল, তাইতো দেখছি। বোধহয় আমি একটু বেশী মাত্রায় ভয়াবহ হয়ে উঠেছি!

সেতো হয়েছেনই! ওরা অত সেজেগুজে এল প্রেসিডেণ্ট হবে বলে আর কোম্পানিশুদ্ধ ছেলে কিনা ওদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল!

ব্রেক-ভ্যানের এককোণে মালপত্তর নামিয়ে রেখে মনু আবার বলল, কিন্তু যাই বলুন, ওদের মুখে বেশ করে চুণকালি দিয়েছেন। বিজয়া সম্মিলনী যা করেছেন তাতে আপনারই সুবেদার হওয়া উচিত আর ও শালাদের ধরে ধরে ঝাড়ুদার বানিয়ে দেওয়া উচিত।

অমল বলল, যাক ওসব কথা। এখন আমাকে কাজকর্ম শিখিয়ে দিন। শুধু ওই সুবেদার আর জমাদার সাহেবের আক্রোশে আজ পর্যন্ত ব্রেক-ভ্যানই চোখে দেখিনি! আর আপনারা সেই ইভ্যাকুয়েশনের সময় থেকে রীতিমত গার্ডগিরি করছেন! আমার কি কম আফশোষ!

মনু বলল, সেদিন গার্ডগিরি না করেছেন বেঁচে গেছেন! ওঃ, সে কি অমানুষিক কষ্ট! এক একটা ষ্টেশনে দিনের পর দিন পড়ে থাকা,

না খাওয়া, না স্নান, না ঘুম, কেবল শুনুন গোঙানি আর কাতরানি! আর সে কি মড়া-পচার দুর্গন্ধ! সেদিন কি আর গার্ডগিরি করেছি! গার্ডগিরি করছি আজকাল, অনেক মজা আছে লাইনে!

অমল জিজ্ঞেস করে, কি রকম!

চলুন, সবই হাতেনাতে দেখতে পাবেন—ব্রেকভ্যান থেকে নেমে কাপলিং পরখ করতে করতে ওরা এগিয়ে চলল ইঞ্জিনের দিকে। মনু বোঝাতে লাগল, গার্ডের কাজের মধ্যে বরাৎটাই হল সব। যতক্ষণ এ্যাকসিডেণ্ট না হয় ততক্ষণ সকলেই পাকা গার্ড! কিন্তু একটি এ্যাকসিডেণ্ট হলে বোঝা যায় গার্ড সাহেবের দৌড়!

ভ্যাকুয়াম ওয়াগন ক'খানা গুণে নিয়ে মনু বলল, দেখুন না, সারা ভারতবর্ষের যত মিটার-গেজের ওয়াগন এনে জড় করেছে এই আসামে। ভ্যাকুয়াম দিয়েছে মাত্র আটখানা! এই রকম পাহাড়ী দেশে ওই আট-খানা ভ্যাকুয়াম দেওয়া আর না দেওয়া একই কথা! তা বলে ট্রেণ নিতে আপত্তি করার উপায় নেই! যদি আপনি আইন দেখিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন অমনি এদিক থেকে আসবে সিভিলিয়ান ষ্টেশনমাষ্টার হাঁপাতে হাঁপাতে আর ওদিক থেকে আসবে আর-টি-ও চোখ রাঙাতে রাঙাতে! বুঝলেন না ব্যাপারটা, কোন দুখ-দরদ নেই! যেখানে মানুষই মরছে হাজারে হাজারে, সেখানে খানকযেক ওয়াগন নষ্ট হলে এদের ভারী এল-গেল!

ইঞ্জিনের পাশে ওরা এসে পড়েছে। মনু হেঁকে ওঠে, ওহে দাউদ, আমাদের অমলবাবুও আজ থেকে লাইনে বেরিয়েছেন!

দাউদ খাঁ ইঞ্জিন থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, তাই নাকি! অমলকে দেখতে পেয়ে বলল, সে ভালই করেছেন! একটু চা খাবেন নাকি অমল-বাবু? উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, ওরে চাঁদ মিয়া, অমলবাবুকে চা দে রে। মগটা গরম জলে ভাল করে ধুয়ে নিস বুঝলি।

অমল বলল, আমার বরাৎ দেখছি ভালই! সবইতো কোম্পানির লোক! তা তুমি আমাকে কাজ-কমমো শিখিয়ে দিও দাউদ।

দাউদ ইঞ্জিন থেকে নেমে এসে বলল, সে আর আমাকে বলতে হবে না, এই জিজ্ঞেস করুন না মনুবাবুকে। আমিতো আব ওপেন-মার্কেটের

লোক নই! আমি হচ্ছি খাস রেলের লোক। শালা লোকো-ফোরম্যান লোভ দেখিয়ে ফুসলে-ফাসলে মিলিটারীতে দিল ঢুকিয়ে। এখানকার কারবার-সারবার যে এরকম, এ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম, তাহলে কোন শালা বৌ-ছেলেমেয়ে ছেড়ে এ শালাদের খপ্পরে এসে পড়ত!

ক্ষণেকের জন্য দাউদ চুপ করে থাকে। বোধহয় তার বেসামরিক জীবনের দৃশ্য, তার বৌ-ছেলেমেয়ের মুখগুলো তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে! গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবিষ্টভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আবার বলতে থাকে, ভালই করেছেন অমলবাবু! শুনেছি ক্যাম্পে আপনার ওপর খুব জুলুম করে! ভাল মানুষকেতো ও শালারা বরদাস্ত করবে না! যত শালা চুকলিখোর দেখুন ওদের খুব পেয়ারের লোক! ভালই করেছেন লাইনে বেরিয়ে, এখানে অনেক মজা পাবেন।

চাঁদ মিয়া অমলকে চা দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে অমল বলল, কত দিন লাগবে দাউদ, কাজ শিখতে?

দাউদ বলে উঠল, কত দিন! আপনার মত লিখাপড়া-জানা লোকের আবার দিন লাগে নাকি। বলেন, কত মিনিট? আর আমার সঙ্গে যদি যান তাহলেতো এখুনি চার্জ নিতে পারেন। এ কাজের আর শিখবেন কি! ব্রেক-ভ্যানে বিস্তারা লাগিয়ে শুয়ে পড়বেন, লামডিঙে পৌঁছে আমি আপনাকে টাইমগুলো বাতলে দেব, জার্নালে সেইগুলো বসিয়ে দিয়ে মাষ্টারের ঘরে ফেলে দিয়ে আসবেন। ব্যাস, আপনার কাম খতম!

অমল আশ্বস্ত হল। ডিউটীতে আসার আগে তার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। দাউদ মনুকে বলল, তালিমটালিম কিছু দিয়েছ নাকি?

মনু বলল, তুমি ওস্তাদ-লোক থাকতে আমি আর কি তালিম দেব! আমারতো হাতেখড়ি তোমারই কাছে। তুমি নাহয় ততক্ষণ তালিম দাও, আমি এর মধ্যে খবরাখবর করে আসি।

দাউদ ফুটপ্লেটের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে অমলকে বলল, বুঝলেন না দু'চার পয়সা রোজগারতো চাই, এই মাইনেতে কি আর পোষায়! সবই যদি আমি খেয়ে ফেলব তাহলে আর ঘরে আমার ছেলে বৌ খাবে কি! তার ওপর এমনি হয়েছে এ শালার দেশ, একবার লাইনে বেরলে অন্তত দশটি টাকা খরচা!

অমল বলল, এত খরচ কিসের! র‍্যাশনতো দিয়েই দিয়েছে!

ও র‍্যাশন সোলজার হয়ে খাওয়া চলে কিন্তু লাইনে বেরিয়ে ড্রাইভার বা গার্ড সাহেবের খাওয়া চলে না! লাইনে আমাদের একটা ইজ্জৎ আছে। ও র‍্যাশনতো আমরা ভিখারিকে দিয়ে দিই। তার ওপর এটা-সেটা খরচতো আছেই।

এটা-সেটা আবার কি!

এই ধরুন না, আগুনতাতে ষোলঘণ্টা আঠারঘণ্টা থাকতে হবে, এক-আধ পাঁট না টানলে কাজই করা যায় না। তা শালার জংলী দেশে বিলেতিতো পাওয়াই যায় না আর দেশী যা বানায় তা আমাদের কলকাতার ধেনোর কাছে একেবারে ঘোড়ার মুত!

কিন্তু এত টাকা পাও কোথায়?

সব এই গাড়ীতেই আছে অমলবাবু। কষ্ট করে কেবল নোটগুলো গুণে নিতে হয়, তা না-হলে ওই সিভিলিয়ান-মাষ্টারগুলো ঠিক দু'এক-খানা কম দিয়ে দেবে!

মনু ফিরে এল। দাউদ জিজ্ঞেস করল, হল নাকি কিছু?

মনু বলল, তেমন সুবিধে নয়। সবই খুচরোর খদ্দের। পানিখাটিতে দুবস্তা চিনি, ডিগারুতে চারবস্তা চাল আর জাগী রোডে আটবস্তা আটা। একটু থেমে অমলকে বলল, রেট জানেন তো?

দাউদ বলল, রেট আর কি! যেদিন যেমন দাঁও জোটে। তবে চিনি এখন পঁচিশ, আটা—বার আর চাল—আট। ড্রাইভার আর গার্ডে আধা-আধি বখরা। তবে আজ হবে তিনভাগ।

অমলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আঁতকে উঠে বলে, না না দাউদ, আমার ভাগ চাই না।

দাউদ আর মনু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকে হাসে। মনু অমলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, সে পরে যা হয় করা যাবে, এখন চলুনতো ব্রেকে, টাইমতো প্রায় হয়ে এল।

ব্রেক-ভ্যানের মধ্যে ঢুকে অমল অবশের মত বসে পড়ে, তার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওয়াগন ভেঙে মাল বিক্রী করা, এরই নাম উপরি রোজগার! মনুর হিসেব মত মোট যা মাল বিক্রী হবে তা থেকে

আসবে একশ'আশি টাকা! তার মানে, তার ভাগে ষাটটাকা! ষাট টাকা! মিলিটারীতে ঢুকেছিল সে ছাপ্পান্নটাকায়, জুন মাস থেকে বেড়েছে পাঁচটাকা ফিল্ড-সার্ভিস-ভাতা আর সেপ্টেম্বর থেকে দুটাকা বেসিক-পে, মাসে মোট তেষট্টিটাকা। আর এই এক ট্রিপে ষাটটাকা'!

মনু বলল, আরে মশাই আপনি যে দেখছি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন!

অমলের চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে বিমলের একটার পর একটা চিঠি, 'মাত্র পঞ্চাশটাকায় কোন থৈ পাওয়া যাচ্ছে না আমি। জিনিসপত্তরের দাম যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে কোনমতেই কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না! প্রতিমাসেই মোটা টাকা দেনা পড়ে যাচ্ছে। আরতো সংসার চলে না ভাই, যে কোন উপায়েই হোক আর কিছু বেশী পাঠাবার চেষ্টা কর।'

অমল ভাবছে, এই ষাটটাকা যদি সে বাড়ীতে পাঠায় তাহলেই কি সংসার চলবে! মিলিটারীতে ভর্তি হওয়ার সময়েও সে ভেবেছিল চাকরি পেলেই সংসারের অভাব মিটবে! কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছে তা সম্ভব হয়নি, তার মাইনের টাকায় সংসার চলছে না! আরও টাকা চাই! কিন্তু কোথায় পাবে সে টাকা! গাড়ী ভেঙে চাল আটা চিনির বস্তা বিক্রী করে অর্থাৎ চুরি করে! চোখ ফেটে অমলের জল আসে। এই কি সে চেয়েছিল জীবনে! এই ভাবেই কি সে বাঁচতে চেয়েছিল! চুরির টাকা দিয়ে ভাই বোনকে মানুষ করতে চেয়েছিল! বিয়ে-থা করে সুখে ঘরকন্না করার এই কি চেহারা! বিমর্ষ চোখদুটো তুলে মনুর মুখের দিকে তাকায়।

মনু বলল, উপায় কি বলুন, বাঁচতেতো হবেই। আর একাজ করে চলেছে আর-টি-ও'র মেজর থেকে রেলের কুলি পর্যন্ত। আপনি একা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে করবেন কি বলুন?

তবুও অমলের মনে হয় এই টাকা নেওয়ার ব্যাপারেওতো আরও খানিকটা সৎ হওয়া যায়। মনুকে বলল, না, সে কথা আমি ভাবছি না। বলছিলাম কি তিনভাগ কেন? হওয়াতো উচিত পাঁচভাগ! ফায়ারম্যান দুজনেরওতো ভাগ থাকা উচিত!

মনু হেসে উঠল, আপনি যে দেখছি রীতিমত সাম্যবাদী হয়ে উঠলেন মশাই! টাকাগুলো যদি সব বিলিয়েই দেব তাহলে আমিইবা এত মাথা ঘামাতে যাব কেন আর ঝুঁকিইবা নেব কেন! আপনি কি

ভাবছেন, দাউদকে কি ঠিক হিসেব দিয়েছি নাকি? দাউদও তেমনি দুটো-একটা করে টাকা দিয়ে ফায়ারম্যানগুলোর মুখ বন্ধ করে রাখবে। হ্যাঁ, তবে সমান-সমান ভাগ হবে আপনাতে আমাতে। বুঝলেন না, কাকে কাকের মাংস খায় না!

এগার

উত্তর-আফ্রিকায় আমেরিকান সৈন্য অবতরণের খবর ছেলেদের মনে আবার যেন নতুন করে ভাববার খোরাক জুগিয়েছে। জাপান সেই একইভাবে ইমফলের দরজায় বসে আছে। আর বৃটীশও যেন তার জন্য কোন উদ্বেগই বোধ করে না। ছেলেদের বারবার মনে হয়েছে, জাপান যদি আসামে একটা ঠেলা দেয় তাহলে আসামের অবস্থাও হবে বর্মার সামিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের হীরো আমেরিকা যখন যুদ্ধে নেমেছে তখন হেস্তনেস্ত একটা হবেই!

অনন্ত বলল, এইবার যেন মনে হচ্ছে, যুদ্ধটা তাহলে শেষ হবে!

পাঁচকড়ি বলল, আমেরিকা নর্থ-আফ্রিকায় নেমে কচু করবে! বৃটীশ বাছাধনরাতো রোমেলের হাতে নাকানিচোপানি খাচ্ছে!

কিন্তু জার্মানিরও জারিজুরি ফুরিয়ে এসেছে! বাহাদুরী আছে বলতে হবে রাশিয়ার, ঘায়েলতো প্রায় করে এনেছে! আর এই শালা বৃটীশ এমন হারামি, চুপ করে বসে মজা দেখছে! কেন, ওরা কি একটা সেকেণ্ড-ফ্রণ্ট খুলতে পারে না! তা-না আসলে হচ্ছে শয়তানি। রাশিয়াও ঘায়েল হোক আর জার্মানিও ঘায়েল হোক, আর উনি মারবেন ওস্তাদের মার শেষরাত্তিরে! কিন্তু এসব ফন্দি-ফিকির আর ধোপে টেঁকবে না! সৈন্য সে যে দেশেরই হোক না কেন, আমাদের মতই তাদের অবস্থা! এই রকম একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে মানুষ কতদিন জীবন কাটাতে পারে! এইবার তারাই দেবে লড়াই বন্ধ করে!

খগেন বলল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক অনন্ত, এ শালার যুদ্ধ থামুক আর যেন পারছি না!

পাঁচকড়ি বলল, কিন্তু জার্মানি যদি রাশিয়ার হাতে ঘায়েল হয়, তাহলে এ শালা বৃটীশতো বহাল-তবিয়তে থেকে যাবে! তবে আর এত-

বড় যুদ্ধটা হয়ে লাভ কি হল!

অনন্ত বলল, লাভটা এই হল যে ভারতবর্ষের কুড়িলক্ষ লোক যুদ্ধের সমস্ত কায়দা শিখে নিল। এই যুদ্ধ থামার সঙ্গে সঙ্গে তারাই পারবে এ শালাদের পিটিয়ে পগার-পার করতে!

সত্যিই যেন নতুন একটা কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দিন দিন বদলে যাচ্ছে পাণ্ডুঘাটের চেহারা। দিকে দিকে এ্যাণ্টী-এয়ার-ক্রাফট পোষ্ট তৈরী হচ্ছে, দুটো নতুন ফেরীঘাটের কাজ সুরু হয়েছে, পাণ্ডু থেকে পলাশবাড়ীর রাস্তা অনেকখানি এগিয়ে গেছে, পদ্মা-মেঘনা ষ্টীমার-সার্ভিসের বড় বড় ষ্টীমারগুলো এসে জড় হচ্ছে পাণ্ডুঘাটে। রেল-চলাচল বেড়েই চলেছে, ফেরীঘাটে পারাপার সারাদিনই লেগে আছে। রেলপথে আসছে সৈন্য, নতুন নতুন তাজা সৈনিকের দল আর আসছে ঘোড়া খচ্চর ওয়াগনে বোঝাই হয়ে। জলপথেও আসছে সৈন্য, দিশী বিলিতী সব রকমই! আর আসছে ষ্টীমার বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র, সে যে কত রকমের, কত ধরণের, তার আর লেখাজোখা নেই! এই আসার আর বিরাম বিশ্রাম নেই! ঠিক যেন ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের মত!

ছেলেরা সরলভাবেই বুঝে নিয়েছে এইবার একটা কিছু ঘটবেই! লড়াই সুরু হবে নতুন করে। কিন্তু তারা করবে কি! নতুন পরিস্থিতিতে তারাও নতুন করে ভাবছে, এই দুনিয়াজোড়া অঘটনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কি! দিনে-রাতে কাজে-অবসরে চলতে থাকে এই একই চিন্তার রোমন্থন। তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝলক দিয়ে ওঠে সৈনিকজীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার ছোট্ট একটি আশা!

কোম্পানিতেও দেখা দিয়েছে কর্মচাঞ্চল্য! মেজর ব্রাউন কোম্পানি উজাড় করে প্রতিটি ছেলেকে পাঠাচ্ছেন রেলের কাজে। পাণ্ডু থেকে চাপারমুখ, প্রতিটি ষ্টেশনে ট্রাফিক-ষ্টাফ পোষ্টেড হয়ে গেছে। লোকোর প্রতিটি লোক ড্রাইভার থেকে টিনস্মিথ পর্যন্ত কাজে বহাল হয়ে গেছে। ক্যাম্প খাঁ-খাঁ করছে, প্যারেড-গ্রাউণ্ডে ঘাস বড় হয়ে উঠেছে, তাঁবুর আশপাশে আগাছা স্বাধীনভাবে বেড়ে চলেছে! নিরুৎসাহ সুবেদার সাহেব লঙ্গরখানা তদারক করেন আর জমাদার সাহেব সুইপারদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প সাফাই করিয়ে বেড়ান!

সুনীল খবর আনে, জাপান শিগগীরই ইমফল আক্রমণ করবে!

পাঁচকড়ি ক্ষেপে ওঠে, তা আমরা কি ঘণ্টাটা করব! গার্ড সাহেবের লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে কি তাদের থামিয়ে দেব!

আহা-হা, শোন না বলি, জাপান ইমফল আক্রমণ করলেই সিভিলিয়ান স্টাফরা কেটে পড়বে। তখন আমাদেরই সমস্ত ম্যাঁও ধরতে হবে।

ম্যাঁও আর আমাদের ধরতে হবে না! তার আগেই এ শালারা মিঁউ-মিঁউ করতে করতে আসাম থেকে কেটে পড়বে। আর আমরা তখন বীরত্বের সহিত ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দেব!

খগেন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, শুনেছ?

পাঁচকড়ি বলল, কি শুনব?

ভেবেছিলে বুঝি মনের আনন্দে রেলের কাজ করবে? তুমি ঝাণ্ডা নাড়বে আর সুনীল 'টরে টক্ক' করবে! ওসব হচ্ছে না যাদু! জাপানীদের হাতে মরতে হবে ঝাঁকেঝাঁকে তাই আমাদের থাকতে হবে সামনে, তা না হলে ওঁরা 'হিরোয়িক রিট্রিট' করবেন কেমন করে! খবর রাখ কিছু? কাল থেকে চাঁদমারী সুরু হচ্ছে!

কয়েকজনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অস্ফুট আর্তনাদ, চাঁদমারী!

জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোলে চারিদিকে লাল নিশান পুঁতে সুরু হল চাঁদমারী! সকাল আটটায় যারা ডিউটীতে যাবে তারা চাঁদমারী সেরে যাবে। আর আটটায় যারা নাইট ডিউটী থেকে ফিরবে তারা চাঁদমারী সেরে ক্যাম্পে ফিরবে। নাইট-ডিউটী ফেরৎ ক্লান্ত নিদ্রাতুর ছেলেরা টলতে টলতে চাঁদমারীতে আসে। মোট কথা, কোম্পানির প্রত্যেকটি লোককে স্বহস্তে পাঁচরাউন্ড করে গুলি ছুড়তেই হবে!

চাঁদমারী সুরু হল। ষাটগজ দূরে টারগেট। ছেলেরা উপুড় হয়ে শুয়ে বাঁহাতের কণুইটা মাটির ওপর রাখে। বাঁহাতের পাতার ওপর পয়েন্ট-অফ-ব্যালান্স রেখে ডানহাতের মুঠোয় রাইফেলের গ্রিপ মজবুত করে চেপে ধরে। দুহাতের জোরে কাঁধের ওপর বাট ঠেসে ধরে তার ওপর ডানগাল রাখে। বাঁচোখ বুজে ব্যাকসাইট'এর ইউ'এর মধ্যে দিয়ে ফোরসাইট'এর নক্ আর টারগেটের বুল সমান্তরাল করে নেয়। টার-গেটের ওপর মন কেন্দ্রীভূত করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ট্রিগারের ওপর

তর্জনি রেখে অপেক্ষা করে ফায়ার-অর্ডারের। জমাদার সাহেব পাশে বসে হাঁক পাড়েন, সামনে তুমহারা জাপানী দুষমন—ঠিকসে নিশানা লেও!

লেফটেনাণ্ট প্যান্সি হুকুম দেন, য়েনেমি এ্যাট্ ইওর ফ্রন্ট, ফাইভ রাউণ্ডস্—রিপিট্—ফায়ার্—

মুহূর্তের জন্য ছেলেদের মনের কোণে ঝলক দিয়ে ওঠে, যারা আজ তাদের এই যুদ্ধের মধ্যে টেনে এনেছে, যারা আজ জুলুমে আর জবর-দস্তিতে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে, তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেত এই গুলির ঝাঁক!

চাঁদমারী শেষ করে অনন্ত ষ্টেশনে যায় ডিউটীতে। সিভিলিয়ান এ-এস-এম জিজ্ঞেস করে, অনন্তবাবু আপনার বাড়ী কোথায়?

কলকাতায়। কেন?

একটা বড় দুঃসংবাদ আছে তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

দুঃসংবাদ! আমার?

ঠিক আপনার কিনা বলতে পারি না। কিন্তু কলকাতায় যাদেরই বাড়ী তাদের সক্কলের!

আহা মশাই, ভণিতা ছেড়ে ব্যাপারটা কি তাই বলুন না!

জানেন, কাল দুপুরে জাপানীরা কলকাতায় বোমা ফেলেছে!

অনন্ত সীট থেকে লাফিয়ে ওঠে, এ্যাঁ! বোমা! কলকাতায়?

এ-এস-এম বলল, হ্যাঁ।

ক্ষণেকের জন্য অনন্তর হাত-পা অবশ হয়ে যায়, ধপ করে আবার সে টুলটার ওপর বসে পড়ে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ভারী হয়ে আসে, ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর।

একটু পরে চোখ তুলে সে তাকায় এ-এস-এম'এর মুখের দিকে। সে বেচারী ফ্যালফ্যাল করে অনন্তর মুখের দিকে চেয়ে আছে, নিজেকে যেন মস্ত অপরাধী মনে করছে এমন একটা খবর দেওয়ার জন্য। আর অনন্তর দৃষ্টি চলেছে রকেটের মত ছুটে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে আসাম ছাড়িয়ে বাঙলায়! বাঙলার সোনার মাটি মাড়িয়ে সবুজ গাছের ছায়ায় ছায়ায় গিয়ে পৌঁচেছে কলকাতার পিচঢালা ঝকঝকে তকতকে রাস্তায়! রাস্তার পর রাস্তা পার হয়ে তার এঁদো ঘুণধরা বাড়ীর সামনে। হঠাৎ

তার দৃষ্টি থমকে যায়! ঘাড়-মাথা গুঁজে এঁদো ঘুণধরা বাড়ীটা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে! তার মা দাদা বৌদিরা! এরা কি কেউ বেঁচে নেই! বাঁচার মত অবসর কি এরা কেউই পায়নি? তাদের জীবনের কোন আভাষতো সে পাচ্ছে না! একটা গোঙানির শব্দওতো ওই ধ্বংসস্তূপ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে না! তাহলে কি সব শেষ! এই মানুষগুলো যারা আর কিছুক্ষণ আগেও বেঁচে ছিল, কয়েকদিন আগেও যারা তাকে চিঠি লিখেছে পুনর্বার বিয়ে করতে, বুক ভরে চেয়েছে সুখ-শান্তিতে ঘর করতে তারা আজ কেউ নেই! জাপানীরা বোমা ফেলে সব শেষ করে দিলে! মুছে দিলে তাদের সমস্ত আশাআকাঙ্খা এই পৃথিবী থেকে!

ঝট করে অনন্ত উঠে পড়ে হনহন করে হাঁটতে থাকে ক্যাম্পের দিকে। ছুটী তার চাই-ই। কোম্পানি থেকে ছুটী যদি না দেয় তাহলে সে আজই ফোর-ডাউন আসাম মেলে পালিয়ে যাবে! বাড়ী সে যাবেই। যাদের নিয়ে তার জীবন, যাদের জন্য সে বেঁচে আছে তাদের মরা-বাঁচা সে নিজের চোখে দেখবে!

ষ্টেশন পার হয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে অনন্ত চলেছে। হঠাৎ সে থেমে যায়। কিন্তু লীলাও কি বাঁচবে না এই বোমার হাত থেকে। সারা কলকাতা সহরই কি জাপানীবা বোমায় বোমায় গুঁড়িয়ে দেবে! কিন্তু লীলাতো আর ও-বাড়ীতে থাকে না। তার সঙ্গেতো লীলার আর কোন সম্পর্ক নেই! কোর্টে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে! তবুও লীলা বাঁচুক। হয়তো কোনদিন সে লীলার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারবে, হয়তো পারবে আবার লীলাকে ফিরিয়ে আনতে, হয়তো আবার তার জীবন সুরু হবে শান্তির একটি নীড়ের মধ্যে। করুণভাবে সে মিনতি জানায়, আহা লীলা বাঁচুক! লীলা বেঁচে থাক!

ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে দেখে সমস্ত ছেলে ফল-ইন করেছে মাঠের মধ্যে। প্যারেড-ফল-ইন নয়। যে যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায়, কেউ লুঙ্গি পরে খালি গায়ে! কেউ হাফ-প্যাণ্ট পরে খালি পায়ে! কেউ ফুল-ইউনিফর্মে খালি মাথায়! তাকে দেখতে পেয়ে সুবেদার সাহেব করুণস্বরে ডাকলেন, অনন্ত, এখানে এস!

ছেলেদের সামনে দাঁড়িয়ে মেজর ব্রাউন বলছেন, কলকাতায় বোমা পড়েছে, এখবর তোমরাও শুনেছ আর আমিও শুনেছি। বাড়ী যাওয়ার ছুটী তোমরাও চাইছ আর আমিও চাইছি। কিন্তু কে আজ কাকে ছুটী দেবে! আমি কার কাছে ছুটী চাইব! কলকাতায় আমারও বাড়ী। পার্ক ষ্ট্রীটের এক ফ্ল্যাটে থাকে আমার স্ত্রী, মাই বিউটিফুল এ্যান্ড ডিয়ার ওয়াইফ! আর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে! আমি এখনই তাদের কাছে ছুটে যেতে চাই। আমি শুধু একজন মিলিটারী-অফিসার নই, আমিও একজন মানুষ! একজন পিতা! কিন্তু কেমন করে আমি যাব! আমরা যদি আমাদের পোষ্ট ছেড়ে চলে যাই, তাহলে জাপানীরা সমস্ত ভারতবর্ষটাকে বর্মা বানিয়ে ফেলবে! সেই জন্যই আমরা আজ ছুটী পেতে পারি না। আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে আমার যাওয়া নিরর্থক হবে। আর যদি তারা বেঁচে থাকে দ্যাটস ওয়েল এ্যান্ড গুড! লেট আস হোপ সো!

ক্যাম্পের ছেলেরা ধীরে ধীরে যে যার তাঁবুতে ফিরে যায়। আর অনন্ত যান্ত্রিক গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ষ্টেশনের দিকে চলতে থাকে!

ক্যাম্পের ছেলেদের চাঁদমারী শেষ হলে আসতে থাকে ডিট্যাচমেন্টের ছেলেরা একেবারে পাততাড়ি গুটিয়ে। এইভাবে চলে আসার পেছনে যে সংকেত রয়েছে ছেলেরা তা বুঝতে পারে। জল্পনাকল্পনায় তেমন আর উৎসাহ জাগে না, এ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চকতার বুলিও কেউ কপচায় না। তারা জানে, তারা চলেছে আরও এগিয়ে! কলকাতায় বোমা-পড়া থেকে ছেলেরা আন্দাজ করতে পারে যুদ্ধ পরিস্থিতি। কেবল বারবার ভেসে ওঠে তাদের চোখের ওপর ইভ্যাকুয়েশনের দৃশ্য! যুদ্ধ-দানবের যাঁতাকলে দলে-পিষে-গুঁড়িয়ে যাওয়া মানবতার রক্তাক্ত ছবি!

মেজর ব্রাউন রোল-কলে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন কোম্পানি মুভ করছে মণিপুর রোডে! আসাম-বর্মা সীমান্তের স্নায়ুকেন্দ্র, বিরাট রেল-হেড! সেইখানে কোম্পানিকে পূর্ণ দায়ীত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

মণিপুর নামটাই কেমন যেন ভয়াবহ! মণিপুরে জাপানীরা বম্বিং করেছে, মণিপুর থেকে অসংখ্য ইভ্যাকুয়ী সমস্ত আসামে ছড়িয়ে রয়েছে!

আজও, তারা তাদের গৃহে ফিরে যেতে পারেনি। মণিপুর রাজ্যের রাজধানি ইমফল থেকে বারমাইল দূরে কাঙলাটোঙবিতে জাপানীরা ঘাঁটী গেড়ে বসে আছে!

ক্যাম্পের ধারে সাইডিং-লাইনে কোম্পানির জন্য রেক প্লেস হল ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই মালপত্র বোঝাই করল। রোল-কলের পর মা থেকেই গাড়ীতে উঠল। ট্রেণ ছাড়ল সতেরটা-পঞ্চান্ন মিনিটে। চাপারমু পোঁছতে বাজল রাত প্রায় দশটা। খানা খাওয়ার জন্য গাড়ী প্লেস হ সাইডিঙে। সমস্ত কোম্পানির জন্য পুরি-মাংস আর টিনের ফল মেজর ব্রাউন অফিসারদের সঙ্গে করে ছেলেদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়া ঠাট্টা-রসিকতা করেন, আরও মাংস পুরি নেওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করেন

খগেন বলল, ব্যাপার কি! কেমন যেন নতুন নতুন ঠেকছে!

পাঁচকড়ি বলল, তাই বটে। আমরা হচ্ছি লাথির-ঢেঁকি! লাথি বদলে চড় মারলে মনে হয় বুঝিবা হাত বুলচ্ছে।

অনন্ত বলল, আসল কথা কি জান? এখন যে গলায় পা পড়ে তাই সকলে দয়ার অবতার! কাজ উদ্ধার হলেই নিজমূর্তি ধরবে।

লামডিঙে ভোর হল। হুকুম এল, ফল-ইন ফর ফ্রেশ-এয়ার!

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, ও বাবা, যাইযে! এ আবার কি হলরে!

ট্রেণ-পিকেটরা বলল, প্ল্যাটফরমে নেমে যে যার ইচ্ছামত ঘুরে ফি বেড়াও, কিছুক্ষণের মধ্যেই চা দেওয়া হবে।

চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আর জ্যাম দেওয়া হয়েছে। ছেলেরা দল বে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ যেন তাদের ওপর মাতব্বরী করার নেই! প কড়ি আবার বলে ওঠে, এ যে একেবারে রামরাজত্ব ব'নে গেল রে!

অফিসাররাও ছেলেদের সঙ্গে লাইন দিয়ে চা নিয়েছেন, ঘুরে ঘ ছেলেদের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন। অমলদের দলটার সামনে এ লেফটেনাণ্ট প্যান্সি হেসে জিজ্ঞেস করেন, মিলিটারীতে ঢুকে নিশ্চ তোমরা দুঃখিত হওনি?

সুনীল বলল, নেভার স্যার।

প্যান্সি সাহেব আরও কাছ ঘেঁষে এসে বললেন, বাড়ীতে নিশ তোমরা এমন ব্রেকফাষ্ট খেতে না?

খগেন চাপা গলায় বলে ওঠে, ওরে শালা, মনে করেছে কি! আমরা কাঙালী নাকি?

জয়ন্ত বলল, না স্যার, সেইজন্যইতো আর্মিতে ভর্তি হয়েছি!

প্যান্সি সাহেব বললেন, কেবল এই জন্য! আর কোন কারণ নেই?

না, বাড়ীতে খেতে পাইনি, কোন চাকরি যোগাড় করতে পারিনি, তাই স্যার আমরা মিলিটারীতে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছি।

প্যান্সি সাহেবের মুখের হাল্কাভাব সরে যায়, চোখ কুঁচকে জয়ন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেন ইউ ওন্ট ফাইট দি জ্যাপস্?

জয়ন্ত হেসে বলল, কারও বিরুদ্ধে লড়ে জীবন দেওয়ার জন্য আমরা মিলিটারীতে ভর্তি হইনি। আমরা মিলিটারীতে এসেছি নিজে বেঁচে বাড়ীর লোককে বাঁচাতে!

প্যান্সি সাহেব তেড়ে ওঠেন, দেন ইউ আর এ ফিফ্‌থ্‌ কলামনিষ্ট!

জয়ন্ত বলল, এ্যাজ ইউ প্লিজ টু থিঙ্ক স্যার।

প্যান্সি সাহেবের হাত নিসপিস করতে থাকে, উত্তেজিতভাবে এদিক-ওদিক চাইতে থাকেন। অনেক ছেলে এসে জড় হয়েছে। জমাদার দাশগুপ্তকে দেখতে পেয়ে প্যান্সি সাহেব ডাক দেন, জমাদার সাব, কাম্ হিয়ার— জমাদার সাহেব কাছে আসতেই জয়ন্তকে দেখিয়ে ফেটে পড়েন, এ্যারেষ্ট হিম! হি ইজ এ ফিফ্‌থ্‌ কলামনিষ্ট!

জমাদার সাহেব খুশীতে দাঁত বার করে বললেন, দিস ইজ দি রিবেল গ্রুপ স্যার—জয়ন্তকে দেখিয়ে, এ্যান্ড দিস ইজ দি রিং-লিডার—জয়ন্তর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, চল তাহলে!

হঠাৎ অমল ঠেলেঠুলে সবার সামনে এসে বলে উঠল, এই কারণে যদি জয়ন্তকে এ্যারেষ্ট করা হয় তাহলে আমাদেরও এ্যারেষ্ট করা উচিত!

জমাদার সাহেব থতমত খেয়ে যান, প্যান্সি সাহেবও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। এদিক-ওদিক থেকে আরও ছেলে এসে জড় হয়েছে। পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, ব্যাপারটা কি!

জমাদার সাহেবের পাশের ছেলেটি বলে ওঠে, মামার বাড়ী আর কি!

মণ্ডলিকা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে। প্যান্সি সাহেবের মুখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে আর জমাদার সাহেবের মুখটা ফ্যাকাশে মেরে যাচ্ছে।

মেজর ব্রাউন কোথা থেকে এসে ঠেলেঠুলে কুণ্ডলিটার মাঝখানে ঢুকে বললেন, হোয়াটস দি ম্যাটার প্যান্সি?

প্যান্সি সাহেব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বললেন। সমস্ত শুনে মেজর ব্রাউন হো হো করে হেসে উঠলেন, হি ইজ রাইট প্যান্সি, দ্যাটস দি রিয়াল ইণ্ডিয়ান সেণ্টিমেণ্ট— জয়ন্তর পিঠ চাপড়ে বললেন, সাব্‌বাস! দ্যাটস লাইক এ ব্রেভ বয়!

প্যান্সি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন। হতভম্ব ছেলের দল কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তাদের দিকে। তাঁদের পেছন পেছন চলেছে জমাদার দাশগুপ্ত ভয়-পাওয়া কুকুরের মত পেছন দিকে চাইতে চাইতে!

পাঁচকড়ি আপন মনে বলে ওঠে, নাঃ, ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়! এ যেন কেমন কেমন ঠেকছে!

মণিপুর রোড ষ্টেশনটা যে জায়গায় সে জায়গাটার নাম ডিমাপুর। মণিপুর রাজ্যে যেতে হলে মণিপুর রোড ষ্টেশনে নেমে পাহাড়ী রাস্তায় মোটরে যেতে হয় ১৩২ মাইল। সমস্ত ডিমাপুর জায়গাটার মধ্যে বসতি বলে কোন বালাই নেই, আছে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু মিকির আর মিরি উপজাতীয়দের বস্তি। তাদের কাছে সভ্যতর জীবনের কোন সংবাদ আজও পৌঁছায়নি।

ডিমাপুর সহর গড়ে উঠেছে রেল ষ্টেশনটিকে কেন্দ্র করে। বৃহৎ ষ্টেশন, লোকো-সেড, গুডস-সেড, কয়েকটা সাইডিং লাইন, এই ছিল যুদ্ধপূর্ব ষ্টেশন। তারই গা ঘেঁষে বাজার, যুদ্ধপূর্ব যুগে এই বাজারটি ছিল ইমফলের ব্যবসায়ীদের যাত্রীনিবাস। এখানে ছিল কয়েকটি খাবারের দোকান, গোটাকয়েক দেশী হোটেল আর রাত্রিবাসের জন্য মাঠকোঠার ওপর ঘর। তখনকার দিনে ব্যবসায় ছিল চাল চিঁড়ে সুপারি তাঁতের রকমারি কাপড়ের চালানি কারবার। জলের দরে জিনিস কিনে আনত ইমফল থেকে আর এখানে বসে চালান দিত কলকাতায়। যুদ্ধের দাপটে সে কারবারে ঘুণ ধরে গেছে। তাই তারাই এখন মনোহারি দোকান খুলে সৌখিন রেস্তোরাঁ চালু করে সৈনিকদের পকেটকাটার ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছে। দোকানগুলো চলে মিলিটারী আইনের আওতায়

অর্থাৎ ডিমাপুর বেস'এর এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ-কমান্ডান্টকে উপযুক্ত সেলামী দিতে পারলেই একটি লাইসেন্স আর ডিমাপুর বাজারে একটি লাইসেন্স মানে রাতারাতি বড়লোক !

ডিমাপুর এখন মিলিটারী এলেকা! কাজেই নাগরিক জনসংখ্যা যা-ও বা কিছু ছিল তারা পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে। সমস্ত ডিমাপুরটাই মিলিটারীতে ঠাসা। রোজই নতুন নতুন কোম্পানি আসছে, তারাই বনবাদাড় কেটে সাফ করে ক্যাম্প ফেলছে। এর ফলে অসংখ্য নতুন রাস্তা হয়েছে, জায়গায় জায়গায় তাঁবুর বদলে কাঁচায়-পাকায় ব্যারাক তৈরী হয়েছে। ডিমাপুর একটি ক্যান্টনমেণ্টে পরিণত হয়েছে।

ডিমাপুরে পেঁছে কোম্পানি ষ্টেশনের দুধারে ছেঁচাবেড়ার রেলওয়ে-কোয়ার্টারে গিয়ে উঠল। ষ্টেশনের পেছনে পাকা কোয়ার্টারগুলোয় উঠল বি-ও-আর'রা। অফিসাররা উঠলেন পি-ডব্লিউ-ডি বাঙলোয়। কোম্পানির অফিস হল ষ্টেশনের আপার-ক্লাস-ওয়েটিং-রুমে।

দ্বিতীয় দিনেই সিভিলিয়ানদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া সুরু হল। বিরাট ষ্টেশন, তার তিনটে ভাগ—মেইন-ইয়ার্ড, ইষ্ট-ইয়ার্ড আর ওয়েষ্ট-ইয়ার্ড। মেইন-ইয়ার্ডে চলে যাতায়াতি ট্রেণ, ইষ্ট-ইয়ার্ডে র‍্যাশন ক্লোদিং ক্যান্‌টীন্‌-গুডস এ্যামুনিশন ইত্যাদি খালাস করা হয়। ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডের আবার চারটে ভাগ—ওয়েণ্ট-ইয়ার্ড ওয়েষ্ট-ট্রুপস-সাইডিং মার্সালিং-ইয়ার্ড আর সাইডিং-লাইন। সাইডিং লাইনে প্রথমে পড়ে তিনটে পেট্রল-সাইডিং তারপর জিরো-সাইডিং, তারপর ডেড্ বডি-সাইডিং, তারপর রেষ্ট-ক্যাম্প সাইডিং আর লাইন শেষ হয়েছে হসপিট্যাল-সাইডিঙে।

কোম্পানির ছেলেরা খুব খুশী। তাঁবু ছেড়ে ঘরে থাকা এটাইতো একটা অভাবনীয় ব্যাপার! তার ওপর সকলেই করে স্বাধীনভাবে রেলের কাজ! দায়ীত্ব সমস্তটাই তাদের, এমন কাজে উৎসাহ আসে! একেবারে দায়ীত্ব দিয়ে তাদের কাজে বহাল করে দেওয়া হয়। যে কাজ জানে না সে প্রাণের দায়ে কাজ শিখে নেয়, নইলে ট্রেড-পে কাটা যাবে!

মোটামুটি কাজ যখন চালু হয়ে গেছে তখন হঠাৎ একদিন জয়ন্তর

ডাক পড়ল কোম্পানি অফিসে। সোহরাব এসে হাঁক দেয়, জয়ন্তবাবু, মেজর সাহেব আপনাকে ডাকছেন!

অনন্ত যেন চমকে ওঠে, মেজর সাহেব ডাকছেন! জয়ন্তকে?

পাঁচকড়ি সোহরাবকে জিজ্ঞেস করল, কেনরে, জানিস নাকি কিছু?

আমিতো ঠিক বলতে পারছি না!

সুনীল বলল, মেজর সাহেবের মেজাজটা কেমন দেখলি রে?

সোহরাব বলল, এ শালার মেজাজতো দেখি সব সময়েই ভাল।

জয়ন্ত অফিসঘরে পোঁছতে মেজর সাহেব হেসে তাকে কাছে ডাকলেন, সামনের চেয়ারে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তার ডিউটী আছে কিনা। তারপর সুরু করলেন খোস গল্প, এটা—সেটা! নিজেই জানতে চাইলেন তার মিলিটারীপূর্ব জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি, তার বাড়ীতে কে কে আছেন, তাঁদের মধ্যে কে কি করেন, সংসার কেমনভাবে চলে।

তারপর আলোচনার ধারাটা মোড় ঘোরে। ক্রীপস-প্রস্তাব যে কংগ্রেসের গ্রহণ করা উচিত ছিল সে কথা মেজর ব্রাউন বেশ জোর দিয়ে বললেন। অগষ্ট-আন্দোলনের ফলে এই বিবাট লণ্ডভণ্ডের জন্য কংগ্রেসই দায়ী। সাধারণ ভারতীয়দের মনোভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লার্মাডিঙে জয়ন্ত যা বলেছিল, সে কথা আরও একবার তিনি সমর্থন করলেন। এতক্ষণে যেন জয়ন্তর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে আসে।

সিগারেট অফার করে মেজর ব্রাউন জয়ন্তর নির্ভীকতার প্রশংসা করে বললেন, আই লাইক ব্রেভ মেন্! আই ওয়াণ্ট টু নো দেম্!

এতক্ষণে জয়ন্ত মেজর সাহেবের সামনে টাইপ-করা কাগজটার দিকে লক্ষ্য করে। মুভমেণ্ট অর্ডার! তার সমস্ত শরীরটায় কাঁটা দিয়ে ওঠে! ওঃ, এরই নাম বৃটীশ শাসন! মুখ তুলে জয়ন্ত মেজর ব্রাউনের মুখের দিকে চাইল। সহাস্য মুখে তিনি কাগজটা জয়ন্তর দিকে এগিয়ে ধরলেন। তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে জয়ন্ত কাগজটা ভাঁজ করতে লাগল।

মেজর সাহেব বললেন, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ইন ইট?

ইয়েস স্যার, আই এ্যাণ্টিসিপেটেড ইট লং এগো! খট্ করে পা দুটো জোড়া করে জয়ন্ত স্যালিউট করল।

হেসে মেজর সাহেব প্রত্যাভিবাদন জানালেন।

বার

নাইট-ডিউটীর পর বত্রিশঘণ্টা রেষ্ট। অমল আর পাঁচকড়ি ডিউটী থেকে ফিরে কোনরকমে একখানা করে পুরি আর একমগ চা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুনীল হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে অমলকে ঠেলাঠেলি সুরু করে দিল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে অমল বলল, কি হয়েছে! এ্যাঁ!

সুনীল বলল, ভয় নেই! জাপানীরা বোমা ফেলেনি, স্লিট-ট্রেঞ্চে যেতে হবে না। একটা সুখবর দিতে এসেছি।

পাঁচকড়িও উঠে পড়েছে, বিরক্তিভরে বলল, চটপট বল মাইরী! আর জবালাসনি, একটু ঘুমোতে দে।

সুনীল বলল, অমল আজই ছুটীতে যাচ্ছে। যাতায়াতের সময় ছাড়া বাড়ীতে থাকবার একুশদিন ওয়ার-লিভ!

পাঁচকড়ির ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে, এ ছুটী কি শুধু অমলের জন্য?

সুনীল বলল, না। আজ যাচ্ছে কুড়িজন আবার আসছে হপ্তায় যাবে আরও কুড়িজন, এইভাবে প্রতিসপ্তাহে যাবে কুড়িজন করে।

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, বলিস কিরে! এযে দেখছি ফাঁসির খাওয়া! এর পরই কি শূলে চড়াবে নাকি!

সুনীল চলে গেলে অমল আর পাঁচকড়ি আবার শুয়ে পড়ল। নরম একটা খুশীতে অমলের মনটা শিরশির করছে। পাশ ফিরতে ফিরতে পাঁচকড়ি বলল, তুমি আর ছুটী থেকে ফিরে এস না অমল!

অমল হেসে বলল, এমন কথা আর কোনদিন মুখেও এন না।

বিকেল সাড়ে-ছটায় থ্রি-থার্টি-ডাউনে অমল উঠে বসল। ড্রাইভার লাইন-ক্লিয়ার পেয়ে হুইসিল দিয়েছে। অমল ঘাড়টা বাড়িয়ে দেখতে থাকে গার্ড সিগন্যাল দিচ্ছে কিনা। পাঁচকড়ি অমলের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, সকালে যা বলেছিলুম মনে রেখ।

গাড়ী ছাড়ল। জুনমাসের গরম, সমস্ত শরীরটা যেন ভেপসে উঠেছে। অমল জামার বোতাম ক'টা খুলে দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে বসে। গায়ে ফুরফুর করে হাওয়া লাগছে, খুশীতে মনটাও যেন ভেসে চলেছে। গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়, যাত্রীর অধিকাংশ সৈনিক। দু'চারজন যে সিভিলিয়ান রয়েছে তারা ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে। অমল প্রতিটি

সৈনিকের মুখের দিকে চেয়ে ভাবে তারাও বোধহয় তারই মত ছুটীতে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে পাঁচকড়ির কথা! পাঁচকড়ির সহানুভূতি আর মমতা যেন তার মনটার ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে!

ট্রেণ চলেছে, গাড়ীতে মৃদু দোলানি লাগছে, অমলের শ্রান্ত অবসন্ন মনটাও ঝিমিয়ে আসছে। মৃদু খুশীর হাসিতে ঠোঁটটা কুঁচকে উঠছে, তাহলে সে সত্যিই বাড়ী যাচ্ছে! ওঃ কতদিন পরে! হিসেব করে দেখে, পনেরটি মাস তার কেটে গেছে সৈনিকজীবনে!

ভোর বেলায় পেঁছিল পাণ্ডুতে। ফেরী পার হয়ে উঠে বসে পার্বতীপুরের গাড়ীতে। আমিনগাঁও ষ্টেশন, ছবির মত তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই ইভাকুয়ীদের ভীড়। সেই ওয়েটীং-রুমের চালা, সেই বাজার! আর তাদের ক্যাম্পের সেই মাঠটার অবস্থা কি! ব্রহ্মপুত্র আজও সেই বিস্তীর্ণ, সেই একই গতিতে হুহু করে নেমে চলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার জীবনও বহে চলেছে! মনে পড়ে তার ভাবপ্রবণ মনের সেই যুগের কথা! ভেবেছিল তার সদিচ্ছা আর সেবা দিয়ে দুর্গত মানুষের দুঃখ মোচন করবে! হাসি পায় তার নিজের কথা ভেবে। মনে পড়ে সেই মানুষগুলোর কথা যারা এত দুঃখ কষ্টেও মরতে চায়নি। আচ্ছা, তারা গেল কোথায়!

, লালমনিরহাট থেকে যেন দৃশ্য পরিবর্ত্তন হতে থাকে। অগনন লোক লাইনের দুধারে জমা হয়েছে, চলন্ত ট্রেণের পাশে পাশে দৌড়দৌড়ি করছে! ট্রেণ থেকে ছুড়ে দেওয়া একপ্যাকেট বিস্কিট বা একটা পয়সার জন্য তারা মারামারি কাড়াকাড়ি করছে! অমল যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এই তাহলে দুর্ভিক্ষের চেহারা! ক্যাম্পে বসে তারা শুনেছে দুর্ভিক্ষের কথা, আলোচনাও করেছে, সাহায্য পাঠানর ব্যবস্থাও করেছে—কিন্তু মনেতো তাদের কোন দাগ কাটেনি!

ঈশ্বরদী ষ্টেশনে গাড়ী থামে আটমিনিট। অমল গাড়ী থেকে নামতে সাহস পায় না, মিলিটারী দেখলেই বুভুক্ষিতের দল ছেঁকে ধরে! দেয়ালে হেলান দিয়ে কোণ-ঠেসে সে বসেই থাকে। জানলার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসে একখানি নিরাভরণ বিশীর্ণ হাত। মুখ বাড়িয়ে অমল দেখতে পায় লম্বা একটি অবগুণ্ঠন! নীরব নিথর সে হাতখানা নড়ে না, কোন

ইঙ্গিতও জানায় না, থেকে থেকে কেবল কেঁপে কেঁপে ওঠে!

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, চারিদিক থেকে আঁধার আসছে নেমে। অন্ধকারের খাঁজেখাঁজে কঙ্কালসার মানুষগুলো যেন তাদের শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমল কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে! এতগুলো মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছে! নির্লজ্জের মত হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে! ওঃ বুভুক্ষিত মানুষের কি কদর্য চেহারা!

অমলের পাশের ভদ্রলোকটি একঠোঙা খাবার নিয়ে খেতে সুরু করেছিলেন। প্রসারিত হাতখানা দেখে ঠোঙাটা সামলে রেখে বলে ওঠেন, আঃ একটু শান্তিতে দুটো দানা পেটে দেওয়ারও যো নেই! জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানেই আপনি একদানা খাওয়ার জিনিস বার করবেন সেইখানেই এদের কঙ্কালসার হাত ঠিক হাজির হয়েছে!

ব্যাগ থেকে একটি টাকা বার করে অমল সেই হাতটির ওপর ফেলে দিল। হাতটা আচমকা কুঁচকে উঠে ধীরে ধীরে সরে গেল। ভদ্রলোক অমলের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকেন! সে দৃষ্টির সামনে অমল কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, ভাবলেন বুঝি একটা টাকা দিয়ে বিরাট দেশের কাজ করে ফেললেন?

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমল ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভদ্রলোক বলে চলেছেন, আপনাদের আর কি! আছেন মজায় গভর্ণমেন্টের হোটেলে! খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, নষ্ট করছেন, পচাচ্ছেন—তবুও একটি দানা চাল এদিকে আসতে দেবেন না। মনে করেছেন কি আপনারা? আপনাদের মত শত্তুরদের খাওয়ানর জন্য দেশশুদ্ধ লোক উজাড় হয়ে যাবে?

অমল কেমন যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে। তার মনে পড়ে, প্রতিদিন তাদের কোম্পানিতে অন্ততঃ পঞ্চাশজনের ভাত-ডাল নষ্ট হয়।

ভদ্রলোক তখনও আপন মনে গর্জাতে থাকেন, ওঃ, ভারী মিলিটারী মেজাজ দেখাচ্ছেন! যেন ওই একটা টাকাতেই মানুষটা বেঁচে যাবে!

অমল ভদ্রলোকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। মুহূর্তের জন্য সে চোখ বুজোয়। চকিতে তার মনে পড়ে, বিমলতো বারবার তাকে টাকা বাড়াতে লিখেছে! তাহলে বাড়ীর অবস্থা কি?

শিয়ালদায় পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে

রাস্তায় এসে পড়তেই অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের পোষাকের দিকে বারেক চেয়ে আপন মনেই বলে ওঠে, নাঃ এ পোষাকে ট্রামে-বাসে যাওয়া চলতেই পারে না! যদি চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!

সোজা অমল একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। বাড়ী পেঁছে গলির মুখে নেমে ত্রস্ত দৃষ্টিতে আশপাশে নজর করে দেখে। গলির মধ্যে কয়েক পা ঢুকে সে চমকে ওঠে! কি যেন একটা তালগোল পাকিয়ে পাঁচিলের ধারে নড়াচড়া করছে! অমল সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, কে?

দুটো ছেলে পাঁচিলের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ায়। একটী বোধহয় বছরআষ্টেক আর অপরটী তার চেয়েও ছোট। ছোটটা বড়টাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে! অমল বলল, কিরে, কি চাস?

বাবু একটু ফ্যান! কাল রাত্তির হতে কিছু খাইনি বাবু!

তোদের বাড়ী কোথায়?

বাড়ী বাবু জয়নগর। বাপ-মা আমাদের হেরিয়ে গেছে বাবু!

অমলের সঙ্গে ছেলেদুটী চলতে থাকে! বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে বিমল দরজা খুলে একটু ফাঁক করে উঁকি মারে। অমলকে দেখেই বলে, চটপট ভেতরে চলে আয়—একটা পাল্লা খানিকটা খুলে ধরে।

অমল পেছন দিকে চেয়ে বলে, আমার সঙ্গে দুটো বাচ্চা—

বিমল এক হেঁচকায় অমলকে ভেতরে টেনে নিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল, খেঁকিয়ে উঠল অমলের ওপর, এটা তোমার মিলিটারী ক্যাম্প নয়, ওসব নবাবী এখানে চলবে না!

অমল ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। রিণি দৌড়ে তার কাছে এল বটে কিন্তু তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল না! বিমল আর একটী কথাও বলছে না! মিনি সামনে এসে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবার রান্নাঘরে চলে যায়! ননীগোপালবাবু আর কমল বাড়ীতে নেই।

অমল কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে! তার মনে হচ্ছে, সে যেন এখানে অবাঞ্ছিত। জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে অমল চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, রিণি অনেক রোগা হয়ে গেছে! মিনিও তাই! বিমলের কপালের ওপর রেখাগুলো যেন কেটে কেটে বসেছে!

মিনি চাপা গলায় বিমলকে ডাকল, বড়দা এদিকে শোন—ফিসফিস

করে কি যেন সব বলতে থাকে!

কিছুক্ষণ পরে বিমল হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, আমাকে কি তোরা পাগল না করে ছাড়বি না!

অমল ঠাকুমার সামনে গিয়ে বসতেই তিনি চোখ কুঁচকে ঝুঁকে পড়লেন, কে র‍্যা—নজর করে দেখে বললেন, ওমা, অমি যে! কতক্ষণ এসেছিস? ছুঁড়িগুলো আমাকে খবর দেওয়াটাও দরকার মনে করে না। বুঝলি দাদা, আমাকেতো এরা গেরাহ্যিই করে না, মনে করে দাসিবাঁদী কি একটা! আমারও যেমন কপাল! পোড়া দুর্ভিক্ষে এত লোক মরছে আর আমি যেন হয়েছি যমের অরুচি—হঠাৎ চুপ করে আবার হেঁকে ওঠেন, অরে অ মিনি!

কিছুক্ষণ মিনির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তারপর আবার সুরু করেন, দেখলিতো দাদা, ডাকলে একটা সাড়া পর্যন্ত দেয় না। ডেকে ডেকে মরে গেলেও সাড়া দেবে না, ওদের গেরাহ্যিই নেই!

মিনি এসে বলল, বল কি বলছিলে।

বলি শোননা ইদিকে, আমার কাছে আয়—

মিনি ঠাকুমার পাশে বসে। ঠাকুমা চাপা গলায় বলেন, আজ তোদের কি হচ্ছে? ভাত চড়েছে, না সেই পিন্ডি! ছেলেটাকে কি করে সেই পিন্ডি বেড়ে দিবি! এ্যাদ্দিন বাদে ছেলেটা বাড়ী ফিরল তাকেতো তাবলে ওই পিন্ডি বেড়ে দেওয়া যায় না! দেখনা, অমির কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিমলকে পাঠা না, কিছু চাল যদি জোগাড় করতে পারে!

বাড়ীর মধ্যে অমলের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে! তাকে বাদ দিয়ে এরা সমস্ত জল্পনাকল্পনা করে, তার অজান্তেই বিলিব্যবস্থা হয়ে যায়, তাকে এড়িয়ে আড়ালে-আবডালে ফিসফিস করে। বাড়ীর আর তার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যবধান খাড়া হয়ে গেছে! অমল মিনিকে বলেছে, আমাকেওতো কিছু কিছু বলতে পারিস।

মিনি উত্তর দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারনা কেন মেজদা! তোমায় বলে লাভ কি। আর দুদিন বাদেতো তুমি আবার চলে যাবে।

অমল আরও কুণ্ঠিত হয়েছে আরও বিব্রত বোধ করেছে, তার জন্য

সব ব্যাপারেই একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করার চেষ্টা দেখে। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু খাওয়ার সময় যখন ননীগোপালবাবু তার সামনে বসে খাওয়া দেখেন তখন তার চোখ জ্বালা করে ওঠে! পিতার সেই সস্নেহ চাহনি যেন তার সমস্ত দেহটাকে লেহন করে বেড়ায়!

বাড়ীতে অমল একটু কমই থাকবার চেষ্টা করে। ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়। দেখে কনট্রোলের লাইন! মনে পড়ে তার ইভ্যাকুয়ীদের ট্রেণে ওঠার দৃশ্য। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সেই একই সংগ্রাম! কোনমতে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে ধরে রাখার জান্তব প্রয়াস!

চল্লিশ টাকা দাম দিলে যত খুশী চাল পাওয়া যায়! অথচ ন্যায্য দামে চাল পাওয়ার জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের লোক ছুটে এসেছে সহরে। কনট্রোলের দোকানের পাশে ফুটপাথের ওপর দিনের পর দিন হাজারে হাজারে লোক শুয়ে থাকে, রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, অকস্মাৎ একদিন মরে যায়! এওতো সেই ইভ্যাকুয়ীদের মত বাঁচবার জন্য পালিয়ে আসতে গিয়ে রাস্তায়, ট্রেণে, ওয়েটিং-রুমে মরার মত! তাহলে এই দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধ একই ব্যাপার! দুয়েরই সেই একটিমাত্র পরিণতি! হাজারে হাজারে মরা!

পাড়ায় পাড়ায় বসেছে লঙ্গরখানা! পাড়ার ছেলে-মেয়েরা প্রাণ ঢেলে খাটছে। তারাই রান্না করছে, তারাই পরিবেশন করছে। গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে-আসা মানুষগুলোকে তারা চাইছে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে কেউ বমি করতে সুরু করে, কারও কলেরা হয়। এই লঙ্গরখানাগুলোও কি বিনা পয়সায় চা-বিতরণকারী ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ডের মত একই জাতের মহানুভব প্রতিষ্ঠান!

অমলের মনে প্রশ্ন জাগে, এই লঙ্গরখানায় চাল আসে কোথা থেকে! লঙ্গর বসিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের খিচুড়ি খাওয়ানোর মত চাল যদি দেশে থাকে তবে দুর্ভিক্ষ হয় কেমন করে!

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে অমল একটা লঙ্গরখানার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফুটপাথের ওপর শালপাতা পেতে বসে গেছে বুভুক্ষিত মানুষের দল। চিৎকার করছে তারা ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে। বালতিতে খিচুড়ি নিয়ে পরিবেশন করছে কর্মি ছেলেমেয়ের দল। একটী মেয়ে

খিচুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। এক বৃদ্ধার পাতে খিচুড়ি দিতেই সে খপ করে মেয়েটীর কাপড় চেপে ধরে বলল, আর একটু দাও মা।

মেয়েটী বলল, আর নিও না বুড়িমা, বেশী খেলে অসুখ করবে।

বৃদ্ধা রেগে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে, অসুখ করবে? না খেয়ে খেয়ে জোয়ানমদ্দ মানুষগুলো ধড়ফড়িয়ে মরে যাচ্ছে আর তুমি বলছ কিনা বেশী খেলে অসুখ করবে!

পাশের লোকেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন চিৎকার করে ওঠে, এই বুড়ি হারামজাদি, ছেড়ে দে না মা-ঠাকরুণকে! তুইতো মরবিই, তোর সঙ্গে আমরাও মরব নাকি?

বৃদ্ধা কিছুতেই মেয়েটীর কাপড় ছাড়তে চায় না, একটানা বলে চলে, আর একটু দাও!

মেয়েটী আরও খানিকটা খিচুড়ি বৃদ্ধার পাতে দেয়। তবুও বৃদ্ধা তাকে ছাড়ে না, আবার বলে, আরও একটু দাও!

ওদিকে লাইনে হৈচৈ পড়ে গেছে, একজনতো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে বৃদ্ধাকে মারতে! অপর একটী কর্মি মেয়েটীর হাত থেকে বালতিটা নিয়ে বলল, আমি বাকীটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি বুড়িকে বোঝান!

মেয়েটী বৃদ্ধার সামনে বসে বলে, আজকে একটু কম করে খাও, কাল বেশী খেও। অনেকদিন পরে প্রথমেই বেশী খেলে অসুখ করবে!

আজ তিনদিন কিছু খাইনি মা! আমার দুদুটো জোয়ানমদ্দ ছেলে মরে গেল, বড় ছেলের বৌটা যে কোথায় গেল কে জানে! আর ওই ড্যাকরা মিনষে মধু ঘোষ তার ঘরে দু'শ মন চাল তালা বন্ধ করে রেখেছে! বলে টাকা-টাকা সের! টাকা কোথায় পাব মা!

বৃদ্ধা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মেয়েটী তাকে ঠেলা দিয়ে বলে, তুমি খেয়ে নাও বুড়িমা।

বৃদ্ধা আবদারের সুরে বলে, আর একটু দেবেতো?

দেব বৈকি, তোমাদের খাওয়ানর জন্যইতো এই ব্যবস্থা। কত বড় বড় লোক রয়েছেন এর পেছনে, যত চাল লাগবে সবই তাঁরা দেবেন!

বৃদ্ধা কুতুহলি হয়ে ওঠে, হ্যাঁগো মা, সহরে বুঝি অনেক চাল আছে?

মেয়েটী বলে, তা আছে বৈকি। কিন্তু ভীষণ দাম!

কিছুক্ষণ বৃদ্ধা মেয়েটীর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর এদিকওদিক চাইতে চাইতে তার নিজের পাতের দিকে নজর পড়ে যায়। হঠাৎ সে থাবা-থাবা খিচুড়ি মুখে পুরতে থাকে।

অমল ধীরে ধীরে সরে যায়। কিছু দূরে গিয়ে আবার সে থমকে পড়ে। সহরে অনেক চাল আছে! কিন্তু কোথায়? পয়সার অভাবে লক্ষলক্ষ মানুষ মিলিটারীতে ঢুকে যুদ্ধের মাঠে মরছে! আর চালের অভাবে লক্ষলক্ষ মানুষ তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে এসে সহরের রাস্তায় মরছে! অথচ প্রচুর পয়সা আছে মিলিটারী বিভাগ চালাবার মত আর প্রচুর চালও আছে লঙ্গরখানা চালাবার মত! কিন্তু কোথায় আছে এই পয়সা আর চাল?

ট্রেণ থেকে নামতেই অমলের সঙ্গে দেখা হল পাঁচকড়ির। পাঁচকড়ি দৌড়ে এসে অমলকে জড়িয়ে ধরে বলল, তাহলে সত্যিই ফিরে এলে।

অমল হেসে বলল, ফিরবনাতো কি কেটে পড়ব মনে করেছিলে?

ভেবেছিলাম এই নরকপুরিতে আর বুঝি ফিবরে না।

তাও আজ আব সম্ভব নয় পাঁচকড়ি, সে রাস্তাও এরা মেরে দিয়েছে!

কি রকম?

একুশদিনের মধ্যে বাড়ীতে প্রায় দশদিন ভাত খেতে পাইনি। কচুব ডাঁটা থেকে সুরু করে ছাতু বেশম খুদ্ যা জুটেছে তাই দিয়ে পেট বোঝাই করেছি। বাড়ীতে ভাত যেদিন হয় সেদিন সকলে খায় বেলা তিনটের সময়! এক খাওয়ায় দুবেলার কাজ হয়ে যায়।

পাঁচকড়ি বলল, তাহলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ লেগেছে বল! তাই আজ-কাল বাড়ী থেকে যে সমস্ত চিঠি পাই তার আধখানাই এরা সেন্সর করে কেটে দেয়, পাছে আমরা সেখানকার সঠিক খবর জানতে পারি! তোমাদের বাড়ীতেই যখন এমন অবস্থা তখন না-জানি আমাদের চেয়েও যারা গরীব তাদের অবস্থাটা কি!

অমল ধীরে ধীরে বলতে থাকে কলকাতার অবস্থা—যা সে দেখেছে, যা সে বুঝেছে, সবই একে একে। শুনতে শুনতে পাঁচকড়ি ক্ষেপে ওঠে, আর এ শালারা আমাদের কিছু জানতে দিচ্ছে না।

এইটাইতো এদের কায়দা। ওঃ, সিভিলিয়ানরা যে আমাদের কি সাংঘাতিক ঘৃণা করে সে নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না।

পাঁচকড়ি গুম হয়ে খানিকটা চুপ করে থাকে।

অমল বলল, তারপর, এখানকার হালচাল কি তাই বল?

হালচাল! চমৎকার। একেবারে নিঃসাড়ে জবাই হচ্ছি!

তার মানে!

জয়ন্তর কথা বর্ণে বর্ণে ফলতে সুরু করেছে!

আর একটু খুলে বল পাঁচকড়ি।

পাঁচকড়ি বলল, তাহলে চল ওয়াই-এম-সি-এ ক্যানটীনে, বসে কথা কওয়া যাবে। ষ্টেশনের চেহারা দেখেই বোধহয় বুঝতে পারছ আমরা এখন আর কোয়ার্টারে থাকি না? ক্যাম্প হয়েছে ওয়েষ্ট ইয়ার্ডের পেছনে!

দুমগ চা নিয়ে একটা টেবিলে ওরা বসল।

তাহলে শোন এবার—চায়ের মগে একটা চুমুক দিয়ে পাঁচকড়ি বলল, এই শালা মেজর ব্রাউন হচ্ছে পাক্কা একটী মিছরির ছুরি! মেজর রায় মারতেন হাতে আর ইনি মারছেন ভাতে! ধুড়াধুড় মাইরী ট্রেড-পে কেটে নিচ্ছে! একটা কিছু খুঁত পেলে হয়! সেদিনতো শিবেনের আঠাশদিনের ট্রেড্-পে কেটেছে। আসলে ব্যাপারটা কি জান, কোয়ার্টার-গার্ড দিলে যে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তাই আর-আই না দিয়ে কাটে ট্রেড-পে। ড্রাইভার দাউদ খাঁর একমাসে ছাপ্পান্নদিনের ট্রেড-পে কেটেছে। মাইনের দিন পাঁচ-দশটাকার বেশী আর কোন মিঁয়াকে নিতে হচ্ছে না।

অমল বলল, তারপর!

তারপর আর কি, চলেছে ত্যানা-না-না করে। ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা খবর আছে। শালা কেলে-মাণিক ঘাড় থেকে নেমেছে!

অমল বলল, তার মানে!

তার মানে ও-শালা আর এ কোম্পানিতে ফিরছে না। কি একটা ব্যামো ধরেছিল তার জন্য গিয়েছিল হাসপাতালে। সেখান থেকে দিয়েছে ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে। কাজেই আমাদের স্কন্ধ থেকে উনি নামলেন!

কি অসুখ করেছিল?

সে অত খোঁজ রাখে কে! শালার অসুখ করেছিল বলেইতো আমা-

দের ঘাড় থেকে নামল। আমরা তাতেই খুসী।

অমল বলল, যাঃ পাঁচকড়ি, মনকে অত সংকীর্ণ কর না।

পাঁচকড়ি টেবিলের ওপর চাপড় মেরে বলল, তুমি বলছ কি অমল! ওই শালা কেলে-মাণিকের যখন অসুখ করেছে তখন ক্যাম্পশুদ্ধ ছেলে ওর মৃত্যুর জন্য মানত করেছে! ওর মত একটা নরকের কীট বাঁচল কি মরল তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না।

যাক, তারপর আর কি খবর বল?

জমাদার দাসগুপ্তের জায়গায় এখন কাজ করছে হাবিলদার-মেজর রামকিষণ আর হাবিলদার-মেজরের কাজ করছে হাবিলদার মুখার্জি। এই আর এক শালা হারামি! ওঃ, সুবেদার সাহেবকে কি খোসামোদটাই না করছে! জুতো পালিশ থেকে মাথার উকুণ পর্যন্ত বেছে দিচ্ছে!

অমল খিলখিল করে হেসে ওঠে, যাঃ তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ!

মোটেই না! সে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। নেড়ি কুত্তা-গুলোকে পুষলে সেগুলো যেমন করে, এ-শালা সুবেদার সাহেবের সঙ্গে ঠিক সেই রকম করছে। তুমি বল কি, ও-শালা সুবেদার সাহেবকে এমন বাগিয়ে নিয়েছে যে জমাদার রামকিষণের কোন পাত্তাই নেই! সে বেচারা আমাদের কাছে এসে দুঃখ করে।

অমল বলল, তাহলে কোম্পানির অবস্থা বেশ কাহিল বল?

সে আর বলতে। জয়ন্তকে ভাগাল, তোমাকেও দিল ছুটী। সেই মৌকায় ওই-শালা হাবিলদার মুখার্জি উঠে পড়ে লেগে গেল আমাদের পেছনে। আজ একে ডাকে, কাল ওকে ডাকে, আর সকলকেই খোঁটা দেয় তোমাদের চেলা বলে! কখনও ল্যান্স নায়েক করে দেওয়ার লোভ দেখায়! আবার কখনও শাসায়, কেউ ট্যাঁ-ফু করেছতো কোম্পানি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব! আমারতো মনে হচ্ছে তোমাকেও বেশী-দিন আর এ কোম্পানিতে রাখছে না।

ক্যাম্পে ফিরে অমলের প্রথম কাজ হল হাবিলদার-মেজরের কাছে রিপোর্ট করা। হাবিলদার-মেজরের একটা আলাদা তাঁবু। সেই তাঁবুর সামনে গিয়ে দাড়াতেই হাবিলদার-মেজর মুখার্জি অভ্যর্থনা করলেন, আরে অমলবাবু যে! আসুন, আসুন।

অমল রাহ্‌ধারিটা এগিয়ে দিয়ে বলল. আমি ফিরেছি থ্রি-টোয়েন্টি-নাইন আপ'এ।

আরে বস একটু! কলকাতা থেকে আসছ, খবর-টবর শুনি! আমার কি ছাই আর ছুটীতে যাওয়া হবে!

তার দিকে এগিয়ে দেওয়া ক্যাম্প-টুলটার পাশে অমল দাঁড়িয়ে রইল। হাবিলদার-মেজর মুখার্জি বললেন. ঠিক এই জন্যই আমি হাবিলদার-মেজর হতে চাইনি। ছেলেরা আগে তবুও আমার সংগে গল্পগুজব করত কিন্তু আজকাল আমাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়! কিন্তু আমি কি করব বলতো ভাই। আমার সংগে গল্প করার হুকুমতো আর দিতে পারি না। আমি কলকাতার খবর জানতে চেয়েছিলাম এ্যাজ এ ফ্রেন্ড!

অমল টুলটার ওপর বসে পড়ল! হাবিলদার-মেজর বললেন. আমারও বাড়ী কলকাতায়, ভাবনা চিন্তা আমাদেরওতো হয়!

অমল বলল. খবর আর তেমন বিশেষ কি! চাল বাজার থেকে একেবারে উবে গেছে, চল্লিশটাকার কমে একদানাও পাওয়া যায় না। গ্রাম-থেকে-আসা হাজার হাজার লোক রোজই মরছে।

হাবিলদার-মেজর বললেন. তাব'লে ওই ভিখিরিগুলোকে সহরে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয়নি. যদি লুটপাট সুরু করে!

কিন্তু ওরাতো দেখলুম না খেয়ে ধড়ফড়িয়ে মরে যাচ্ছে তবু একটা দোকান থেকে একদানা চালও লুট করছে না!

কেন বলতো?

লুট করবার মত ক্ষমতা যে আর ওদের নেই। ওর'তো জানে না ওদেরই গোলার ধান লুঠে নিয়ে সহরের কালোবাজার তৈরী হয়েছে! ওরা সহরে এসেছে বাঁচবার আশায়! ভেবেছে যেখানে এত বড় বড় লোক বাস করে সেখানে পেঁাছতে পারলে বাঁচার একটা বন্দোবস্ত হবেই।

হাবিলদার-মেজর মাঝখান থেকে বলে উঠলেন. যাক. এসব লেকচার যেন আবার ছেলেদের কাছে ঝেড় না!

অমলের মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। বলল, তার মানে!

মানে বুঝে আর দরকার নেই। একটা কথা বলে রাখি, তোমারই

ভালর জন্য! তুমি একজন শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে, বুঝেসুঝে যদি চল' তাহলে এই কোম্পানিতেই তোমার অনেক উন্নতি হতে পারে! রাহধারিটার ওপর খসখস করে সই করে দিয়ে বললেন, রাহধারিটা অফিসে জমা দিয়ে ট্রাফিক-অফিসে রিপোর্ট করবে।

ঝট করে উঠে পড়ে অমল বাইরে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে, মাথার মধ্যে যেন দপদপ করছে। তাঁবুতে ফির তেই খগেন বলল, কি অমল, তোমার পুরনো বন্ধু কি বলল?

অমল বলল, আমার পুরনো বন্ধু!

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মুখার্জি সাহেব। তোমার বন্ধু নয়! তোমাকে প্রথম কোয়ার্টার-গার্ড দেখিয়েছিলেন! যাক্, কি বললেন, তাই বল

বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা আজও তিনি দেখালেন। দেখলাম আ ভালর জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বললেন বুঝেসুঝে চল এই কোম্পানিতেই নাকি আমার অনেক উন্নতি হতে পারে!

স্বরাজ বলল, আরে যেতে দ'ও ও-শালার কথা! ওতো সকলকে উন্নতির পথ দেখাচ্ছে। যাক, রিপোর্টিংটা সেরে এস আর অকাদাকে চেপে ধরবে ডিউটী তোমাকে দেওয়া চাইই!

অমল বলল, তা অকাদাকে বলে কি হবে?

বল কি হে, অকাদাইতো এখন আমাদেব ফাদার-মাদার! টেকনি-ক্যাল-ডিউটীর ইন-চার্জ হাবিলদার!

অমল আবার প্রশ্ন করল, অকাদা আবার হাবিলদার হল কবে!

খগেন বলল, সবই হয় যদি এলেম থাকে। অকাদা যে এখন অফি-সারদের কল্পতরু! হাঁস মুরগি ডিম মদ থেকে সুরু করে দেশী মেয়ে পর্যন্ত তিনি সাপ্লাই করছেন!

কোম্পানি অফিসে রাহধারি জমা দিয়ে অমল ট্রাফিক-অফিসে ঢুকল। অকাদা একটা কাগজ সামনে রেখে বিরিঞ্চিবাবার মত বসে আছেন। ছেলেরা এই ডিউটী-ডায়াগ্রামটীকে বলে অকাদার গোলকধাঁধা! অফি-সারদের সামনে তাঁকে বলে হাবিলদার চ্যাটার্জি, সামনাসামনি বলে দাদা আর নিজেদের মধ্যে অকাদা! অকা কথাটী তাঁর নাম অক্ষয়ের অপভ্রংশ।

অমল টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, দাদা আমি এসেছি।

অকাদা তদবস্থ থেকেই বাঁহাতটা তুলে চুপ করতে বললেন। কিছু-ক্ষণ সেইভাবে থাকার পর গোলকধাঁধার কয়েকটা জায়গায় গোটাকয়েক বিন্দু বসিয়ে বললেন, তুই এসেছিস ভাই, বড় ভাল সময়ে এসেছিস। আর একটা দিন যদি দেরী করতিস তাহলে কিছু করতে পারতুম না!

অমল বলল, কেন দাদা!

দাঁড়া ভাই, একটু চুপ কর—বলেই খসখস করে একটা খাতার ওপর খানিকটা লিখে চললেন। লেখা শেষ করে খাতাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে ভাই একটা সই করে দে।

কিসে সই করব দাদা?

এই দেখনা, ইষ্ট-ইয়ার্ডে তোকে লার্ণিং-ডিউটিতে লাগিয়ে দিলুম।

এইতো সকালে ফিরলুম দাদা, একটু রেষ্টও দেবেন না?

ওইতো তোদের দোষ ভাই! ভাল করতে গেলেই তোরা উল্টো বুঝবি। ওদিকে কি হচ্ছে তা জানিস?

কোনদিকে!

সুবেদার সাহেব চেষ্টা করছে তোকে স্পেয়ার রাখবার! তাহলেই নের সাধে তোকে দিয়ে ফেটীগ খাটিয়ে নেবে। এদিকে কোম্পানিশুদ্ধ ছলে আমাকে শাসিয়ে রেখেছে, দাদা, অমল ফিরলেই সংগে সংগে তাকে ডিউটী দেওয়া চাই। নে ভাই, তুই সইটা একবার করে দে—আমি এক্ষুণি গিয়ে বড় সাহেবকে দেখিয়ে রাখব। তাহলে আর কোন মিঁয়ার ট্যাঁ-ফু করতে হবে না!

তের

দ্বিতীয়-সিফটে অমলের ডিউটী, বেলা একটা থেকে রাত ন'টা। হাবিলদার-মেজরের তাঁবুর সামনে পনের মিনিট আগে সকলে ফল-ইন করে। হাবিলদার-মেজর দেখেন তাদের ইউনিফর্ম ঠিকভাবে পরা হয়েছে কিনা, সংগে ফার্ষ্ট-ফিল্ড-ড্রেসিং, এ্যান্টি-ইনসেক্ট-ক্রীম আর ষ্টীল-হেলমেট নিয়েছে কিনা। পরিদর্শন শেষ করে তিনি মার্চ-অফফ করিয়ে দেন, টু ইওর ডিউটীজ, কুইক্ মার্চ!

ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডে পৌঁছে ডিউটীওয়ালারা ভাগ ভাগ হয়ে যায়। অনন্ত

বলল চল অমল, আমরা লোকো-শেডের পাশ দিয়ে যাই—আর সকলের কাছ থেকে একটু তফাৎ হয়ে গিয়ে অনন্ত বলল, জান অমল, লীলা আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে!

অমল বলল, তুমি কি চিঠি লিখেছিলে নাকি?

এক-আধখানা নয়, অন্তত দশ-বারখানা। দিনতিনেক হল, তার কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি। এখনও সে আমাকে আমলই দিতে চায় না!

হঠাৎ অমলের মনে পড়ে যায় আমিনগাঁও-ক্যাম্পের পাশে বস্তির সেই মেয়েটীর কথা, তার জীবনের প্রথম নারী! তার অমন আকুল চাওয়াকে সেই মেয়েটীও আমল দেয়নি! যেন আপন মনেই অমল বলে ওঠে, জান অনন্ত, মেয়েরা পুরুষদের মোটেই বিশ্বাস করে না!

অনন্ত থমকে দাঁড়ায়, তাহলে কি লীলাও আমাকে বিশ্বাস করবে না?

অমল অনন্তর পিঠে হাত রেখে চলতে চলতে বলল, তুমি যে বিশ্বাস-যোগ্য সেটা প্রমান করতে হবে অনন্ত, তার জন্য সময় লাগবে!

মেইন-ইয়ার্ডে ওরা এসে পড়েছে। একজন আমেরিকান সৈনিক রীতিমত দৌড়ঝাঁপ করছে। নিজেই সে কাপলিং খুলছে, সিগন্যাল দিচ্ছে, পয়েন্ট বানাচ্ছে। অমল অবাক হয়ে বলে, ওই আমেরিকানটা আবার এখানে কি করছে?

অনন্ত বলল, ও যে আমাদেব ড্যান, আমেরিকান ইয়ার্ড-মাষ্টার!

আমাদের কোম্পানিতে আমেরিকানরাও পোষ্টেড হয়েছে নাকি?

তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি! যেখানে দেখছ আমেরিকার দেওয়া প্রতিটী জিনিষের ওপর নির্ভর করে বৃটীশ আজ কোনরকমে যুদ্ধ চালাচ্ছে, সেই আমেরিকানরা কিনা আসবে আমাদের কোম্পানিতে!

তবে!

তবে আর কি! ওরা আছে জন-বার এই মণিপুর রোড ষ্টেশনে আর ওদের ওপর আছে একজন লেফটেনান্ট। এই কজনের কাছে আমাদের কোম্পানির টিকিটী বাঁধা। ওদের সামনে আমাদের প্রভুরাতো গড়ুরপাক্ষিটী হয়ে আছেন, আমরাতো কোন দাসস্য দাস!

এ আবার কবে থেকে হল?

এইতো এই মাসের গোড়া থেকে। বাঙলা আর আসামের সমস্ত

রেলওয়ে এখন ও'দেরই তাঁবে। আমেরিকান ডব্লিউ-ডি ইঞ্জিন কিছু কিছু এসে পড়েছে, ওয়াগনও নাকি শিগগীরই আসছে। এক কথায়, আসাম ফ্রন্টে লড়াই ওরাই চালাবে!

অমল বলল, তার মানে গোদের ওপর বিষফোঁড়া!

অনন্ত স্বর নামিয়ে বলল, সেদিন শুনছিলুম, বৃটীশ নাকি আমেরিকার কাছে বাঙলা আর আসাম লীজ দিয়ে দিয়েছে!

ষ্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে অনন্ত বলল, তোমারতো লার্ণিং-ডিউটী অমল, একফাঁকে ষ্টেশনে এস আমেরিকানদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। ভারী মিশুক আর সরল এরা!

ইয়ার্ড-ফোরম্যান স্বরাজ কাজ সুরু করে দিয়েছে ইষ্ট-ইয়ার্ডে। একটা লাইনের সমস্ত ওয়াগনগুলোকে সর্টিং করছে—খালি ওয়াগন আর রকমারি লোড বাছাই করে পাশাপাশি তিন-চারটে লাইনে ছড়িয়ে ফেলছে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সর্টিং লক্ষ্য করতে করতে অমলের নজর পড়ল একটী বৃটীশ সৈনিকের ওপর। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে একটা ওয়াগনের পাশাপাশি দৌড়দৌড়ি করছে! অমল তার ভাবগতিক দেখে বলে ওঠে, ব্যাটা যেন ক্যাসাবিয়াঙ্কা!

স্বরাজ বলল, দাওয়াই পড়লে আর ক্যাসাবিয়াঙ্কা হবে না!

অমল বলল, কি রকম!

ব্যাটা এসে আমার ওপর তম্বিগম্বি করছিল ওর ওয়াগন আগে প্ল্যাটফরমে প্লেস করতে হবে। আমি অমনি মোক্ষম দাওয়াই ছেড়ে দিলুম, যাও আমেরিকান ইয়ার্ড-মাষ্টারের কাছ থেকে সান্টিং-অর্ডার করিয়ে আন। আর কি, সাপের মাথায় বিষবড়ি! সুড়সুড় করে গিয়ে এখন ওয়াগন সামলাচ্ছে।

তা সামলাবার কি আছে!

আছে বৈকি। আমরা যে ব্লাডি-ইণ্ডিয়ান, যদি চুরি করি! খাস্ বিলিতি সোলজারদের জন্য এদের একখানা বই আছে, তার নাম 'আওয়ার এম্পায়ার'। তোমায় বলব কি অমল সে বইখানা যদি পড় তোমার মাথায় খুন চেপে যাবে! ইণ্ডিয়ান মাত্রেই চোর জোচ্চোর গাঁটকাটা এই সব আর কি! সেইসব পড়ে ও'র দিব্যজ্ঞান হয়েছে, কাজেই

উনি ওঁর বাবার সম্পত্তি সামলাচ্ছেন!

অমল বলল, তার জন্যতো আর ওই লোকটী দায়ী নয়! ওদের গভর্ণমেন্ট যেমনটী ওকে বুঝিয়েছে ও ঠিক তেমনটী বুঝেছে। আচ্ছা, আমি ওকে বুঝিয়ে বলে আসছি।

তোমার যে ওর জন্য দরদ উথলে উঠল! মরুক না শালা লালমুখো!

অমল যেতে যেতে বলল, দেখিই না কি বলে!

কিছুক্ষণ বাদে অমল ফিরে এল। স্বরাজ জিজ্ঞেস করল, কি বলে শালা, এখনোতো দৌড়দৌড়ি করছে!

আর করবেও—অমল সঙ্গে সঙ্গে বলল, ওর অফিসার নাকি ধারে-কাছে কোথাও আছে। সে যদি দেখে ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তাহলে আর ওর রক্ষে থাকবে না!

স্বরাজ বলে ওঠে, তবে যে শুনি ওরা স্বাধীন জাত!

তার নমুনাতো চোখেরই ওপর দেখতে পাচ্ছি। স্বাধীন যদি হত তাহলে কি আর ঘরবাড়ী ছেড়ে মরতে আসত এই সাতসমুন্দুর-তের-নদীর পারে!

ঘন্টাখানেক পরে একফাঁকে অমল ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হয়। এ-এস-এম'এর ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে ড্যান হাত-পা ছুড়ে প্রচুর হাঁক-ডাক করছে। অমল অনন্তকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি?

অনন্ত বলল, ব্যাপার গুরুতর। ওঁদের রেড-ক্রস ভ্যান আসবে বেলা চারটেয়। বেলা দুটোর মধ্যে ওঁর ইষ্ট-ইয়ার্ডের পাঁচনম্বর লাইন ক্লিয়ার চাই। ক্যাম্প থেকে ফেরার সময় দেখেছে লাইনটা ক্লিয়ার নেই। আর যাবি কোথায়!

অমল বলল, রেড-ক্রস ভ্যান! কেন, কারও অসুখ করেছে নাকি?

কারও মানে! ওদের সক্কলের। আর অসুখ! মারাত্মক অসুখ। একসপ্তাহ হয়ে গেল, আর কি মোরেল ঠিক থাকে! তাই মেজাজ খারাপ।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলুম না! রেড-ক্রস ভ্যানের সঙ্গে মোরেল'এর সম্পর্কটা কোথায়?

এ রেড-ক্রস হল আমেরিকান-রেড-ক্রস! এই গাড়ীটীতে আছে একটী বগী, তার মাঝখানে একটা হল আর তার দুপাশে দুটো বেডরুম।

এর মধ্যে থাকেন দুটী আমেরিকান মেয়ে, তাঁরা সপ্তাহে একবার করে এইসব ডিট্যাচমেণ্টগুলোয় আসেন এদের মোরেল তাজা রাখতে! প্রথমে ওই হলটায় হবে সিনেমা, তার মানে রাজ্যের যত উলঙ্গ মেয়ের ছবি! তারপর সারারাত ধরে ওই মেয়ে দুটোকে নিয়ে যা কাণ্ড চলবে তা না দেখলে তুমি ধারণাই করতে পারবে না! শালারা আছে বেশ—মদ মেয়ে-মানুষ চকোলেট আর চিউং-গাম্ এই নিয়ে যেন নেশার ঘোরে আছে!

ব্লক-ইনষ্ট্রুমেন্টের ঘন্টা বেজে উঠল। অনন্ত হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে গেল। অমল ড্যানকে লক্ষ্য করতে থাকে। ড্যান তখন সান্টিং-জমাদারকে বোঝাচ্ছে, হম আমেরিকান, ইওর ফ্রেণ্ড! নট এ ফাকিং বৃটীশার্!

সান্টিং-জমাদার কাজ বুঝে চলে যায়। ড্যান হিপস-পকেট থেকে মদের বোতল বার করে ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দেয়, চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে একটা চকোলেট-স্লাব চিবোতে সুরু করে। বাইরে থেকে আর একজন আমেরিকান এসে ড্যানের সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

লাইন-ক্লিয়ার দিয়ে অনন্ত বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা ঠেলা দিয়ে অমলকে দেখায়, ওই হল লিউটীনান্ট মুর, ওইযে ড্যানের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে!

অমল দেখল, ড্যান সেই একইভাবে টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে মাথাটা এলিয়ে লেফটেনান্ট মুরের সঙ্গে কথা কইছে! জিজ্ঞেস করল, ড্যানের র‍্যাঙ্ক কি?

প্ল্যাটফরমে এসে অনন্ত বলল, মামুলি একজন প্রাইভেট। ওরা অফিসারদের সঙ্গে এইরকম সহজভাবে কথা বলে, তা সে যত বড় অফিসারই হোক না কেন! তুমি জাননা অমল, কথায় কথায় আমরা অফিসারদের স্যালিউট করি বলে ওরা আমাদের কি ভীষণ ঠাট্টা করে!

থ্রি-থার্টি-ডাউন ইন করতে আর মিনিটদশেক বাকী, লেফটেনান্ট প্যান্সির ব্যাটম্যান একটা সুটকেশ এনে অনন্তকে বলল, সাহেব এই গাড়ীতে লামডিং যাবে, সুটকেশটা গাড়ীতে তুলে দেবেন।

অনন্ত ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার বয়ে গেছে! কেন সাহেব নিজের

সুটকেশটাও বইতে পারেন না নাকি? ভারী আমার নবাবপুত্তুর রে! অমলকে বলল, জান অমল, কিন্তু আমেরিকান অফিসারদের দেখবে, তারা তাদের নিজের মাল নিজেরাই বয়!

গাড়ী ইন করলে পয়েন্টসম্যানের হাতে লাইন-ক্লিয়ার দিয়ে অনন্ত বলে দিল, ড্রইভারকে বলে দাও রাইট-টাইমে স্টার্ট করতে—অমলকে বলল, যাওনা ভাই গার্ডকেও একটু বলে দাও, না-হলে শুধুশুধু লেট করবে আর আমাকে দিতে হবে কৈফিয়ৎ। জানইতো মেজর ব্রাউনের সামনে একবার দাঁড়ালেই নিদেনপক্ষে তিনদিনের ট্রেড-পে!

অমল ফিরে এসে দেখল লেফটেনান্ট প্যান্সি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, মুখখানা তার লাল টকটক করছে। অনন্ত লেফটেনান্ট প্যান্সির সেই সুটকেশটা হাতে করে ফ্যাকাশে মুখে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে! সমস্ত ঘরটা যেন থমথম করছে। হঠাৎ ড্যান চীৎকার করে উঠল, হেই, লিভ্ দ্যাট ফাকিং লাগেজ দেয়ার!

লেফটেনান্ট প্যান্সি বাজখাঁই গলায় হুকুম দিলেন, লে আও!

অনন্ত একপা এগিয়েছে। ড্যান আবার চেঁচিয়ে উঠল, হি ওন্ট ক্যারি ইওর্ লাগেজ্! ইউ ব্লাডি বৃটীশার্স, ইউ ওয়ান্ট টু উইন্ দি ওয়ার্ এ্যাট্ দেয়ার্ কস্ট, এহ্!

লেফটেনান্ট প্যান্সি হাতদুটো বারবার মুঠো করছেন আর খুলছেন। অনন্ত ঠকঠক করে কাঁপছে, তার হাতে সুটকেশটা দুলছে। ড্যান সমানে গজগজ করছে আর মুচকে হাসছে। লেফটেনান্ট প্যান্সি নিজের শরীরের ওপর একটা ঝাঁকানি দিয়ে হাঁকলেন, কাম্ অন্ এ-এস-এম, কুইক—ঝড়ের বেগে তিনি ষ্টেশন-রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনন্তও টলতে টলতে সুটকেশটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ড্যান হিপস-পকেট থেকে মদের বোতলটা টেবিলের ওপর ঠুকে বসিয়ে হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠল।

খগেন লাইন থেকে ফিরেছে, কাঁচা পয়সা কিছু রোজগারও হয়েছে। পাঁচকড়ি আর অমলকে বলল, চল একটু ঘুরে আসা যাক।

কোম্পানির ছেলেদের কাছে একমাত্র আকর্ষণের বস্তু ওই বাজারটী

অর্থাৎ খাবারের দোকানগুলো। ডিসিপ্লিনড খানা খেয়ে খেয়ে যখন ছেলেরা প্রায় ক্ষেপে ওঠে তখন চলে যায় ওই বাজারটীতে। কোন একটী শুভদিনে সারামাসের হাতখরচের টাকাটী ওই খাবারের দোকান-গুলোতে উজাড় করে দিয়ে, আফশোষ করতে করতে ফিরে আসে।

পাঁচকড়ি বলল, চল তবে ষ্টেশনটা একটু ঘুরে যাই, থ্রি-থার্টি ডাউন আসবার সময় হয়েছে।

অমলের বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে! অনন্তর সেই অপমানের দৃশ্য তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে। বলল, ষ্টেশনে আবার কি হবে!

তেমন কিছু নয়। একটু ঘুরেফিরে বেড়ান আর কি। তবুও দু'দশটা অচেনা মুখ দেখতে পাওয়া যাবে।

ক্যাম্প ছেড়ে পথে বেরিয়ে খগেন বলল, আচ্ছা অমল, এই আমেরি-কানদের তোমার কেমন লাগে?

অমল বলল, কেন, মন্দ কি!

খগেন বলে উঠল, ওরা কি বলে জান? ইণ্ডিয়ানস আর বেগারস! দুর্ভিক্ষের সময় এসে হাজির হয়েছে কিনা তাই দেশশুদ্ধ মানুষকে ভিক্ষে করতেই দেখছে! ওরা যেন বড় বেশী করুণার চোখে দেখে!

পাঁচকড়ি বলল, কিন্তু বৃটীশদের যা ঘৃণা করে কি বলব! একটা বৃটীশ দেখলেই যেন ক্ষেপে ওঠে!

অমল বলল, তাতে আর আমাদের লাভটা কি?

ষ্টেশন-রুমে এসে ঢুকতেই আমেরিকান ইয়ার্ড-মাষ্টার হেষ্টিংস অভ্যর্থনা জানাল, হেই জো, কাম্ অন্, লেটস্ হ্যাভ্ সাম্ বীয়ার— হেষ্টিংসের টেবিলের ওপর ডজনখানেক বীয়ার্-ক্যান্ সাজান। তার থেকে একটা তুলে নিয়ে খগেনকে বলল, দিস্, ফ্রম্ আওয়ার্ ষ্টেট্স!

খগেন বলল, আই ডোন্ট ড্রিঙ্ক!

হেষ্টিংসতো হেসে লুটোপুটি খাওয়ার দাখিল! কিছুক্ষণ পরে চোখ কপালে তুলে বলল, ওঃ যিসাস্ ক্রাইষ্ট অল্মাইটী! দিস্ ইজ্ নো ব্লাডি ওয়াইন্! দিস্ ইজ্ বীয়ার্ জো!

খগেন আবার জানাল সে বীয়ারও খায় না। হেষ্টিংস খগেনের হাতটা ধরে টেনে টেবিলের ধারে নিয়ে গিয়ে তার চোখের সামনে একটা

বীয়ার-ক্যান ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, দিস্ ইজ্ নো ফাকিং ইংলিশ বীয়ার্ মাই বয়, দিস্ ইজ্ আমেরিকান্ বীয়ার্—ফ্রম আওয়ার ষ্টেট্স্!

পাঁচকড়ি বলে উঠল, তবে আর কি, ওর তুল্য জিনিষ আর ভূভারতে নেই! শালারা আমেরিকান আমেরিকান করেই ম'ল।

সুনীল ছিল ডিউটীতে, বলল, আরে খেয়ে ফেল, নাহলে আমাদের অসভ্য মনে করবে। আর ওই একটা ক্যানে নেশা হবে না।

হেষ্টিংস পকেট থেকে জ্যাক-নাইফ বার করে প্রতিটী টীনে দুটো ফুটো করে এক-একজনের হাতে দিতে লাগল। এদিকওদিক চেয়ে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা খানিকটা করে খেয়ে টীনগুলো বাইরে ফেলে দিল! হেষ্টিংস্ একটার পর একটা গলাধকরণ করে চলল। গোটা ছয়েক শেষ করার পর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বলল, হাউ ডু ইউ লাইক্?

ওরা ঘাড় নেড়ে কাষ্ঠ-তারিফ জানাল। হেষ্টিংস্ মহাখুসী, আরও বারতিনেক আমেরিকান বীয়ারের মহিমা কীর্তন করে বলল, হাউ ডু ইউ লাইক্ দি ইয়াঙ্কস্?

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, কি বাবা এখন থেকেই পটাতে সুরু করেছ! বৃটীশকে সরিয়ে মসনদে বসবার তালে আছ নাকি!

হেষ্টিংস বলল, সিওরলি! উই ওয়ান্ট টু বি ফ্রেণ্ডস্!

অমল খগেনের হাতে টান দিয়ে বলল, চল, আর কেন?

খগেন পাঁচকড়িকে ডাকে। পাঁচকড়ি আপন মনে গজগজ করতে থাকে, ফ্রেন্ডতো সব শালাই!

হেষ্টিংস খগেনকে ধরে ফেলে বলল, হোয়ার আর ইউ গোইং জো?

খগেন বলল, বাজার। উই কেম্ ফর মার্কেটিং।

হেষ্টিংস হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ওদের তিনজনকে জড়িয়ে ধরে চলতে চলতে বলল, লেট্স গো এ্যান্ড ইট্ সামথিং!

খগেন বলে ওঠে, মাতালের পাল্লায় পড়ে ভ্যালা বিপদ হল দেখছি!

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মেইন-ইয়ার্ড পার হয়ে ওরা চারজনে বাজারে ঢুকল। চলতে চলতে হেষ্টিংস্ বলল, আই ডোন্ট লাইক্ দিস্ প্লেস্! উই কান্ট গেট্ গ্যাল্স্ হিয়ার্!

খগেন চাপা গলায় বলল, তাতো লাইক করবেই না আর কলকাতায় কি কান্ডটাই না করে বেড়াচ্ছে! দুর্ভিক্ষের ঠেলায় মানুষ মরছে না খেয়ে আর এ শালারা মেয়েদের নিয়ে মজা লুটছে!

পাঁচকড়ি হেষ্টিংসকে বলল, হোয়াট্ এ্যাবাউট্ ইওর্ স্টেট্স্?

ইয়াঃ এনাফ্ ইন্ আওয়ার ষ্টেটস্! ইন্‌ভাইট্ এ গ্যাল্ ফর্ ড্রিঙ্ক্, টেক্ হার্ টু সিনেমা অর্ ডান্স—সি ওন্ট মাইন্ড!

খগেন আঁতকে ওঠে, আরেঃ বাপস্, বলে কি হে! এরা কি এখনও বর্বরযুগে বাস করে নাকি!

পাঁচকড়ি বলল, আমারতো তাই মনে হয়। সেদিন হ্যারী তার বৌয়ের ফটো দেখাচ্ছিল। আমারতো মাইরী আক্কেল গুড়ুম!

খগেন বলল, কেন, কি রকম ফটো?

একেবারে উলঙ্গ হয়ে নানান ভঙ্গিতে প্রায় দশ-বারখানা ফটো! প্যারিস্ পিকচারও তার কাছে হার মেনে যাবে!

অমল হেষ্টিংসকে জিজ্ঞেস করল, দেন্ হোয়াই হ্যাভ্ ইউ কাম্ হিয়ার্ লিভিং সাচ্ এ হ্যাপ্পি লাইফ্?

হেষ্টিংস্ অসহায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ কুঁচকে বলল, হোয়াট্ ক্যান্ উই ডু! উই আর্ টু সেভ্ ইণ্ডিয়া ফ্রম্ দি জ্যাপ্‌স্!

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, ওঃ মার চেয়ে দেখছি মাসির দরদ বেশী!

চীনা রেস্তোরাঁটার সামনে এসে হেষ্টিংস্ বলল, লেট্‌স্ হ্যাভ্ চাইনীজ্ ডিসেস্—কয়েক ধাপ সে এগিয়ে গেল। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল! ওদের চোখ রেস্তোরাঁর দেয়ালে একটী বোর্ডের ওপর আটকে গেছে।

হেষ্টিংস্ রেস্তোরাঁর রোয়াকে উঠে ডাকল, হেই জো, কাম্ অন্!

খগেন বলল, নো হেষ্টিংস্, উই ওন্ট!

দৌড়ে রাস্তায় নেমে এসে খগেনের একটা হাত ধরে হেঁচকা মেরে হেষ্টিংস্ বলল, হোয়াই! হোয়াটস্ দি ম্যাট্‌টার!

খগেনের কান পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে, লজ্জায় আর অপমানে তার চোখে জল এসে গেছে, মুখখানা থমথম করছে। নীরবে সে বোর্ড-খানার দিকে আঙুল তুলে ধরল। হেষ্টিংস জোরে জোরে পড়তে

থাকে, ফর্ বৃটীশ-ট্রুপস্ ওন্‌লি—আউট্-অফ্-বাউন্ডস্ ফর্ ইন্ডি-য়ান্-ট্রুপস্।

হেষ্টিংসের বিশাল দেহখানা মুহূর্তে কুঁকড়ে ওঠে। হাতদুটোকে মুঠো করে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে ওঠে, ফর্ বৃটীশ ট্রুপস্ ওন্‌লি! হোয়াট্ এ্যাবাউট্ দি এ্যামেরিকান্‌স্! আই উইল্ কিক্ দি ব্লাডি বৃটীশারস্ আউট অফ্ ইন্ডিয়া—হিংস্র একটা পশুর মত সিঁড়ি দিয়ে উঠে বোর্ডখানা এক হেঁচকায় খুলে নিয়ে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

খগেন বলল, চলহে দেখি, হেষ্টিংস্‌টা না জানি কি করে বসে!

অমল গমনোদ্যত খগেনের হাতটা খপ করে চেপে ধরে বলল ওদের লড়াইয়ের মাঝখানে তোমার আমার কোন স্থান নেই খগেন। এ লড়াই হল দুই বীরপুরুষের লড়াই! আমরা হলাম তাদের বাজি!

খগেন আর পাঁচকড়ি অমলের থমথমে মুখখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অমল আবার বলল, চল আমরা ফিরে যাই।

ঝণঝণ করে একটা শব্দ ভেসে আসে রেস্তোরাঁর মধ্যে থেকে। পাঁচ-কড়ি বলল, কিন্তু একসঙ্গে এসে হেষ্টিংসকে এরকম একটা বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাব?

রেস্তোরাঁর মধ্যে তখন চলেছে হুড়োহুড়ি খটাখট দুমদাম শব্দ! অমল বলল, পালিয়েতো আমরা যাচ্ছি না! আমরা যাচ্ছি আমাদের রাস্তায়। আমেরিকানরা বৃটীশদের ঘৃণা করে বলেই আমাদের বন্ধু হতে পারে না।

রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে ভেসে আসে কয়েকটা টুকরো আর্তনাদ! খানিকটা ধস্তাধস্তি আর টেবিল চেয়ার ভাঙার মড়মড় শব্দ। অমল বলল, এখনও কি হেষ্টিংসকে সাহায্য করার কথা ভাবছ নাকি খগেন?

খগেন পাঁচকড়ির দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে কাঁধ কোঁচকায়।

রাত তখন বোধহয় এগারটা! মেইন-ষ্টেশন থেকে সাদেক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে অমলকে ঘুম ভাঙিয়ে ঠেলে তুলল। ধড়মড় করে উঠে অমল বলল, কি হয়েছে সাদেক!

সাদেক বলল, এক্ষুণি ষ্টেশনে চলুন! অনন্তবাবু ডাকছেন!

কেন?

সমস্ত ব্যাপার আমি জানি না। তবে আমেরিকানদের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হয়েছে। অনন্তবাবু ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন!

আমেরিকানদের সঙ্গে গোলমাল! অমল ভেবেই ঠিক করতে পারে না, ব্যাপারটা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যে সাধারণ নয় সেটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। রাত এগারটার সময় কোন অফফ-ডিউটী লোকের ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক একথা নিশ্চয়ই অনন্তর মনে আছে! তবুও অনন্ত ডেকে পাঠিয়েছে! সাদেককে বলল, এক কাজ কর সাদেক, খগেন পাঁচকড়ি স্বরাজ সন্তোষ আর সুনীলকেও ডাক। তাদের বল, কোন হৈ-চৈ না করে একজন একজন করে যেন ওরা এক্ষুণি ষ্টেশনে যায়। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে কয়েক-পা যেতেই নাইট-পিকেটের সঙ্গে মুখো-মুখি! অমলের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে মুচকে হেসে বলল, আপনি!

হ্যাঁ ভাই! ভয় নেই কোন খারাপ মতলবে যাচ্ছিনা। আমেরিকান-দের সঙ্গে কি একটা গোলমাল হয়েছে! অনন্ত ডেকে পাঠিয়েছে!

কিন্তু অমলবাবু!

উপায় নেই ভাই! ধরা যদি পড়ি শাস্তি পাব। এসব জেনেশুনেও যখন অনন্ত ডেকে পাঠিয়েছে তখন যাওয়াই উচিত। তুমি কি বল?

নাইট-পিকেট বলল, নিশ্চয়ই! বিশেষ করে যখন আমেরিকানদের সঙ্গে গোলমাল। ফিরে এসে কিন্তু আমায় সমস্ত ব্যাপারটা বলবেন।

ষ্টেশন-রুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই অনন্ত ধড়মড় করে উঠে এল। অমলের একটা হাত ধরে টানতে টানতে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। হাত-পা তার থরথর করে কাঁপছে। অমল তার কাঁধ চেপে ধরে বলল, কি হয়েছে অনন্ত!

কথা বলতে গিয়ে অনন্তর গলা কেমন যেন বুজে যায়! বারকয়েক ঢোঁক গিলে বলল, আমেরিকানরা মতলব করেছে আসাম-মেল থেকে মেয়ে নামিয়ে নেবে!

অমল আঁতকে ওঠে, কি!

হ্যাঁ অমল, ট্রেণ যেই ছাড়বে অমনি ওদের মধ্যে থেকে একজন

লেডিজ-কম্পার্টমেন্ট থেকে একটী মেয়ে জোর করে নামিয়ে নেবে।

অনন্তর একটা হাত অমল প্রাণপণে চেপে ধরে, শরীরটা তার থর-থর করে কাঁপছে! হঠাৎ সে চীৎকার করে ওঠে, তোমার সামনে যখন ওরা এইসব মতলব করছিল তখন ওদের গলা টিপে ধরতে পারলে না? অস্বস্তিতে সে ছটফট করতে থাকে, বারবার পেছন দিকে ফিরে ফিরে চায়, আঃ এখনো ওরা আসছে না কেন! আবার অনন্তকে জিজ্ঞেস করল, ট্রেণ আসতে আর কত দেরী?

তা এখনও আধঘন্টা।

অমল যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে, তা তুমি কেবল আমাকে ডেকে পাঠালে কেন। আর ব্যাপারটাই বা সাদেকের কাছে বলে দাও নি কেন? তা-হলে ক্যাম্পশুদ্ধ ছেলেকে জাগিয়ে তুলে আনতুম।

অনন্ত আমতাআমতা করে বলল, ওরা যখন আমারই সামনে বসে এই সমস্ত মতলব করছিল তখন আমি এত ঘাবড়ে গিয়েছিলুম যে, কি যে করব কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষে তোমায় ডেকে পাঠালুম।

লাইন-ক্লিয়ার দিয়েছ নাকি?

না, এখনো দিইনি।

বেশ, আমরা তৈরী হয়ে খবর না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই লাইন-ক্লিয়ার দিয়ো না! দূরে তিন-চারজনকে দেখা গেল কথা কইতে কইতে আসছে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে অমল বলল, যাক্, ওরা এসে পড়েছে! এবার তুমি লাইন-ক্লিয়ার দিতে পার।

অনন্ত চলে গেল ষ্টেশন-রুমে। খগেন পাঁচকড়ি স্বরাজ সাদেক সুনীল সকলেই এসেছে। পাঁচকড়ি ছুটে এসে অমলকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে অমল?

অমল বলল, চল, আমরা ওয়াটার-কলমের আড়ালে গিয়ে কথা কই।

সকলে নীরবে অমলের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। সোয়ান-নেক'-এর তলায় সিন্ডারের গাদার ওপর বসে অমল বলল, খুব মাথা ঠাণ্ডা করে শুনবে আর এখনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে!

একে একে অমল আমেরিকানদের মতলবের কথা বলল। শুনতে শুনতে পাঁচকড়ি ছিটকে লাফিয়ে উঠল, শালাদের আজ জানে মেরে

দেব! মনে করেছে কি শালারা! এটা কি ওদের ষ্টেটস নাকি!

সুনীল বলল, এই শুনেই এত লাফালাফি করছিস! আর সেদিন এই আমেরিকানরা ফারকাটিঙে কি করেছে জানিস? ভর্-দুপুরে গোটাতিনেক আমেরিকান একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে বাড়ীর মেয়েদের ধরে টানাটানি করতে সুরু করে! ভয় পেয়ে মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে। চিৎকার শুনে আশপাশের লোক যখন তেড়ে আসে তখন ওরা র‍্যাণ্ডাম-ফায়ার করতে করতে পালিয়ে যায়। তিনটি লোক মারা যায়!

স্বরাজ বলল, এ রকমতো ওরা হামেশাই করে বেড়াচ্ছে। কে যেন বলছিল, ওদের জ্বালায় কলকাতায় মেয়েরা রাস্তায় বেরুতে পারে না।

খগেন বলল, অথচ শালাদের মুখে সব সময়ে ফ্রেণ্ডশিপের বুলি!

সাদেক বলে উঠল, এর একটা বিহিত করতেই হবে অমলবাবু। আমাদের নাকের ডগায় মেয়েদের এমনভাবে বেইজ্জৎ করবে এ কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

সুনীল বলল, বরদাস্ততো তুমি করবে না! কিন্তু ওরাতো রিভলভারের ডগায় যা খুশি তাই করছে। তুমি বাধা দিতে গেলে তোমার কপালে হয় মৃত্যু না-হয় কোয়ার্টার-গার্ড!

পাঁচকড়ি তেড়ে ওঠে, আর ভয় দেখাসনি সুনীল! ভয়ে ভয়েতো আধমরা হয়েই আছি। তা-বলে এমন একটা কাণ্ড হাত-পা গুটিয়ে চোখের ওপর দেখব কেমন করে! আমরা মানুষ না জানোয়ার? অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেন সে ছটফট করে ওঠে না না অমল, এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না। মরতে যদি হয় ওদের একটাকে নিয়ে মরব!

সাদেক বলল, আলবৎ! মরতে যদি হয় মরদের মত মরব।

অমল বলল, তাহলে ইষ্ট-ইয়ার্ড আর ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডের ষ্টাফদের খবর দিয়ে এখনি জড় করতে হবে। আর লাঠি ডাণ্ডা রড্ যা পাওয়া যায় সবই হাতের কাছে মজুত রাখতে হবে।

পাঁচকড়ি লাফিয়ে ওঠে, আজ যা থাকে কপালে! ওই শালা আমেরিকানদের একদিন কি আমাদের একদিন!

সুনীল অমলকে বলল, তাহলে তোমরা মারপিট করবে? ভাল করে একটু ভেবে দেখ অমল।

পাঁচকড়ি সুনীলকে খেঁকিয়ে উঠল, মারপিট করব নাতো কি ওদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ল্যাজ নাড়ব ?

অমল সাদেককে বলল, তুমি অনন্তকে ডেকে নিয়ে এসতো সাদেক।

সাদেক চলে গেল ষ্টেশন-রুমে। খগেন আর পাঁচকড়ি গেল ইষ্ট আর ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডে। সুনীল অমলকে আবার বলল, ভাল করে একটু ভেবে দেখ অমল, ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

স্বরাজ সুনীলকে বলল, আর আমেরিকানরা যে কান্ডটা করতে চলেছে সেটা কি খুব মামুলি মনে হচ্ছে?

সুনীল বলল, আহা আমি কি তাই বলেছি নাকি! আমি বলছি, একটু সাবধান হয়ে নিজেদের সামলে কাজটা হাসিল করা যায় না?

অমল বলল, এইভাবে সাবধান হয়ে হয়ে আর নিজেদের সামলিয়ে চলে চলে আজ আমাদের এই হাল হয়েছে সুনীল! আজ আমরা মিলিটারীতে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি। আর কি কাজটা করছি? একেবারে ভাড়াটে-গুন্ডার কাজ! দুমুঠো ভাত ছড়িয়ে দিয়ে এরা আমাদের দিয়ে সহরে চালের চোরাকারবারীদের পাহারা দিইয়েছে আর লাখে লাখে মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেছে। এরপরও কি মনে কর, ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে তুমি শান্তিতে জীবন কাটিয়ে যেতে পারবে?

অনন্ত এসে দাঁড়াতেই অমল জিজ্ঞেস করল, লাইন-ক্লিয়ার দিয়েছ?

হ্যাঁ, আউট-রিপোর্টও পেয়েছি।

ইষ্ট-ইয়ার্ড, ওয়েষ্ট-ইয়ার্ড থেকে প্রায় সকলেই এসে পড়েছে। অমল বলল, দেখ, ওদের শাস্তি দেওয়ার মত ক্ষমতা আমাদের নেই! আমরা পরাধীন জাত! আমরা কেবল বাধা দেব, আমাদের চোখের ওপর একটি মেয়েকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কিছুতেই দেব না।

থ্রি-আপ আসাম-মেলের হেডলাইট দেখা দিয়েছে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফোঁসফোঁস করতে করতে ছুটে আসছে। পাঁচকড়ি অমলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই অমল, আমরা প্রায় কুড়িজন আছি। হেডলাইটের ধ্বকধ্বকে আলোটার ওপর চোখ রেখে অমল পাঁচকড়ির একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

দেখতে দেখতে ট্রেণটা এসে পড়ল, ঢুকে পড়ল ষ্টেশনে, থেমে পড়ল

প্ল্যাটফরমে। ওরা ছোট ছোট দলে লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে লেডিজ-কম্পার্ট-মেন্টের দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। অমল সবকটা দলের কানে কানে ফিসফিস করে বলে গেল, খবরদার, মাথা গরম কর না।

আর-এম-এস থেকে মেলব্যাগ নামিয়ে প্ল্যাটফরমের ওপর স্তূপাকার করে ফেলল, ডাইনিং-কার কেটে সাইডিং-লাইনে প্লেস করল। প্যাসেঞ্জার কিছু নামল কয়েকজন উঠলও—তাদের প্রায় সকলেই মিলিটারী-অফিসার আর জনকয়েক বোধহয় সিভিলিয়ান কনট্রাক্টর। ট্রেণ আসার গোলমাল ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে, লোক চলাচল থেমে গেছে, ষ্টেশনটা আবার খাঁ খাঁ করছে। ঢাকনি-ঢাকা আলোর তলায় টুকরো টুকরো অন্ধকারগুলো যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। কেবল জেগে আছে পাঁচকড়ি, লেডিজ কম্পার্টমেন্টের দরজায় সজাগ প্রহরী! আর জেগে আছে সাদেক, লোহাব রডটা ঠুকে ঠুকে পায়চারী করছে! আরও জেগে আছে ছোট ছোট দলে বাকী ছেলেরা, উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে মোকাবিলা করার জন্য!

সময় যেন আর কাটেনা! আধ-আলো আধ-অন্ধকারে ট্রেণের যাত্রীরা ঝিমিয়ে পড়ছে। অস্থির ভাবে অমল সমস্ত প্ল্যাটফরমটা পায়চারী কবছে। বারকয়েক ষ্টেশন-রুমের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে এসেছে। জনতিনেক আমেরিকান চেয়ারে টেবিলে বসে হৈ-হল্লা করছে, মদ গিলছে, চিউয়িং-গাম চিবাচ্ছে! অমল ভেবে থৈ পায়নি, এমন একটা বর্বর অভিসন্ধি করে মানুষগুলো এমন নির্বিকার আছে কেমন করে! তবে কি এমন কাজ করা তাদের কাছে নিতান্ত মামুলি একটা ব্যাপার!

আর বোধহয় মিনিটতিনেক বাকী। হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে অনন্ত বলল, ওরা ঠিক করেছে ট্রেণ ষ্টার্ট করলেই হ্যারী ঢুকে পড়বে কম্পার্টমেন্টের মধ্যে, ড্যান্ আর ওয়াকার থাকবে ফুটবোর্ডের ওপর! ষ্টার্টারী পার হলেই হ্যারী একজনকে নামিয়ে দেবে, তারপর তিনজনেই লেভেল-ক্রসিঙের কাছে নেমে পড়বে। কালও নাকি গাড়ীতে উঠেছিল কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারেনি!

হন্তদন্ত হয়ে অনন্ত আবার ষ্টেশন-রুমে চলে গেল। অমল সবকটা দলের কাছে সমস্ত কথা ঘুরে ঘুরে বলে এল। ষ্টেশন-রুমের

সামনাসামনি এসেই দেখে ষ্টার্টার ডাউন হয়েছে! সবুজ আলো মিট-মিট করছে! আর যেন অমলের পা চলে না!

ড্রাইভার হুইসিল দিয়েছে, ব্রেকভ্যান থেকে গার্ড সবুজ বাতি নাড়ছে। হাসতে হাসতে ড্যান হ্যারী আর ওয়াকার বেরিয়ে এল।

পাঁচকড়ি দাঁতে দাঁত চেপে ডাকল, সাদেক!

ঠিক আছি পাঁচকড়ি বাবু!

হ্যারী আসছে সকলের আগে আগে, প্রত্যেকটা কামরায় টর্চ ফেলে দেখতে দেখতে। একটার পর একটা কামরা ছেড়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার হুইসিল দিয়ে ষ্টিম খুলে দিয়েছে, ভস্—ভস্—ভস্—গাড়ীটা যেন নড়ে উঠল, একটুখানি যেন গড়িয়েও গেল, ব্রেক-চেপে-ধরা কোন একটা চাকা থেকে ক্যাঁ—ক্যাঁ—শব্দ হতেই রইল।

পাঁচকড়ির চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠছে ভেসে উঠছে অগষ্ট আন্দোলনের দিনে সেদিনকার সেই নিশুতিরাতে জ্বলন্ত মশালের সেই আলো! সেদিনও সে-ই ছিল সেণ্ট্রী, আর আজ! পাঁচকড়ি নড়ে উঠল, টলে উঠল, সমস্ত শরীরটা তার থরথর করে কেঁপে উঠল! সেদিনকারই মত তার বুকের মধ্যে থেকে আর্ত এক আর্তনাদ ঠেলে বেরিয়ে এল, হল্ট—

থতমত খেয়ে হ্যারী একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাদেক স্বরাজ খগেন ওরা সকলে গিয়ে ড্যান আর ওয়াকারকে ঘেরাও করে ফেলল। এ্যাডভান্স ষ্টার্টার পার হয়ে ইঞ্জিন থেকে আবার হুইসিল দিয়েছে। ব্রেকভ্যান থেকে গার্ড সাদা আলো দেখিয়ে 'অল রাইট' সিগন্যাল দিচ্ছে, হুসহুস করে গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। গভীর স্বস্তির এক নিঃশ্বাস অমলের বুকখানা খালি করে বেরিয়ে এল।

ধীরে ধীরে অমল ভীড়টার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা সকলে মিলে ড্যান হ্যারী আর ওয়াকারকে ঘিরে ধরেছে। পাঁচকড়ি গলা ফুঁড়ে চিৎকার করছে, দিস ইজ নট ইওর ষ্টেট্স। দিস ইজ আওয়ার ইণ্ডিয়া!

ভীড়ের বাইরে অমল দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছে, সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দৈত্যের মত তিনটে আমেরিকান ফ্যাকাশে মুখে রোগা-শুঁটকো পাঁচকড়ির তম্বিগম্বি নীরবে হজম করছে!

হঠাৎ সাদেক হ্যারীর একটা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠল, বোলো, ফিন্ কভি এইসা করেগা?

বিস্মিত অমল দেখল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সুসভ্য আমেরিকার ডেমোক্রাট সৈনিক হ্যারী অপরাধীর মত মাথা নেড়ে জানাচ্ছে, না।

অমল পাঁচকড়ির কাঁধে হাত রেখে বলল, চল পাঁচকড়ি, এবার আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই!

চোদ্দ

ষ্টালিনগ্রাদের 'গেল-গেল' অবস্থা!

কোম্পানির ছেলেদের মধ্যে নতুন করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, তাদের ভাগ্যে আবার না জানি কি ঘটতে চলেছে! খবরের জন্য উৎসুক হয়ে মেজর ব্রাউনের উদারতায় পাওয়া ষ্টেটসম্যানের আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলে, রেডিও'র খবরের প্রতিটী কথা যেন গিলতে থাকে। কিন্তু ষ্টেটসম্যান বা রেডিও'র খবর তাদের মনে কোন আশা জাগায় না!

তবুও আশা মরে না! রাশিয়ার ওপর তবুও ভরসা! মস্কৌ লেনিনগ্রাদ যারা অমনভাবে রক্ষে করতে পারে ষ্টালিনগ্রাদ কি আর তারা সামলাতে পারবে না! ষ্টেশনে বাজারে যে কোন সিভিলিয়ানকে দেখতে পায় তারই কাছে খবর জিজ্ঞেস করে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শোনে ষ্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের খবর। সে যেন এক রূপকথা! তার ইটকাঠ পথঘাট ধুলো-কাঁকরটাও বুঝি রুখে দাঁড়িয়েছে জার্মানদের বিরুদ্ধে! রাস্তায়-রাস্তায় অলি-গলিতে চলেছে হাতাহাতি লড়াই! যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সহরের প্রতিটী বাড়ীতে বাড়ীতে, প্রতিটী বাড়ীর তলায় তলায়!

এদিকে আবার জাপানও যেন আসাম-বর্মা সীমান্তে নড়েচড়ে উঠছে! প্যালেল দখল করে ধীরে ধীরে চীনদুইন নদীর ধারে এগিয়ে আসছে। এতদিন যুদ্ধ ছিল দূরে দূরে তাই মনে ছিল ভয়! আর যুদ্ধ এখন এসে পড়ছে একেবারে ঘাড়ের ওপর তাই মনে জাগে আতঙ্ক। ষ্টালিন-গ্রাদের যদি পতন হয় আর জাপান যদি এগিয়ে আসে, তাহলে ভারত-বর্ষের বুকের ওপর দুদিক থেকে এসে পড়বে যুদ্ধ!

সন্ধ্যে বেলায় ক্যানটীনে গিয়ে ভীড় করে ছেলেরা রেডিও'র খবর

শোনে। তারপর গুটীগুটী বেরিয়ে যায় প্যারেড-গ্রাউণ্ডের দিকে, অন্ধকারে গোল হয়ে বসে। অন্ধকারই যেন ভাল লাগে!

গভীর উদ্বেগে দিনের পর দিন কেটে যায়। সন্ধ্যে উতরোলেই রাতের খানা খেয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। জীবন যেন তাদের নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে! ধীরে ধীরে একজন একজন করে অমলের সীটটায় এসে বসে, নীরবে পরষ্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে গুম হয়ে থাকে, ভাবনার তাদের অন্ত নেই! নীরব স্তব্ধ ছেলেদের মধ্যে থেকে অনন্ত হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, আমাদের ওপর এত জুলুম কেন? আমাদের কি দায় পড়েছিল রাজায়-রাজায় এই যুদ্ধের মধ্যে উলুখড়ের মত প্রাণ দেওয়ার!

শিবেন বলল, আর কেন! পেটের দায়ে।

সুনীল বলল, শুধু তাই নয়! এ যুদ্ধ না বাঁধলে কি আর স্বাধীনতার কথা ভাবতে পারতাম!

পাঁচকড়ি বলল, না ভাই সুনীল ও স্বপ্ন ভেঙে গেছে! জাপান আর জার্মানি এসে যে আমাদের স্বাধীন করে দেবে একথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

সুনীল বলল, কেন!

কেন? সেদিনকার রাতের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে। ওই আমেরিকানরা, ওরাওতো বলে আমাদের রক্ষে করার জন্য ভারতবর্ষে এসেছে! ভারতবাসীকে ওরাও বন্ধু মনে করে। কিন্তু তার নমুনাতো সেদিন স্বচক্ষে দেখলে?

শিবেন বলল, কিন্তু এরা যে বৃটীশেরই দলে! ও-রকমতো হবেই।

অমল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। মাঝখান থেকে বলে উঠল, কিন্তু এই আমেরিকানরাও বৃটীশদের ঘৃণা করে!

পাঁচকড়ি বলে উঠল, সব শালাই সমান! কেবল ফুসলোবার তাল!

অমল বলল, না পাঁচকড়ি সকলেই সমান নয়! রাশিয়াতো নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে মাতব্বরী করতে যায়নি! কোন দেশকে রক্ষে করতে গিয়ে সে দেশের মেয়েদের ধরে টানাটানি করেনি!

অনন্ত অমলের কথার জের টেনে বলল, আর নিজের দেশের জন্য কি লড়াইটাই না তারা লড়ছে!

সুনীল বলল, তাতে আর চি'ড়ে ভিজবে না! এবার দেশ আর রক্ষে করতে হচ্ছে না!

অমল বলল, কিন্তু আমার মন চাইছে রাশিয়ার জয় হোক!

সুনীল মোচড় দিয়ে বলল, বল কি হে! তুমিও যে দেখছি রাশিয়ার ভক্ত হয়ে গেলে?

অমল বলল, তা আমি হয়েছি সুনীল, সত্যিই আমি রাশিয়ার ভক্ত হয়ে উঠেছি! কেন, তা-ও বলছি। প্রথমত দেখ, হিটলারের অনুচর ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ থেকে বেরিয়েছে কিন্তু রাশিয়া থেকে বেরোয়নি! সমস্ত ইউরোপের শক্তি নিয়ে হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে, রাশিয়া একা সেই আক্রমণ ঠেকিয়েছে! আমি অবাক হয়ে ভাবি রাশিয়ার মানুষ এত শক্তি পেল কোথা থেকে! যুদ্ধের গোড়ায় গোড়ায় লোকে বলেছে রাশিয়াতো চাষার দেশ, দশদিনেই হিটলার সমস্ত রাশিয়া দখল করে নেবে। আমিও তখন ভাবতুম, যে হিটলারের সামনে ফ্রান্সই দাঁড়াতে পারল না, রাশিয়াতো সেখানে এক ফুঁয়ের খদ্দের! সত্যি বলছি, আমার কেমন যেন অবাক লাগে, রাশিয়ানরা ষ্টালিনগ্রাদে এমন যুদ্ধ করছে কি করে! দেশকে তারা এত ভালবাসতে শিখল কেমন করে!

অনন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর আমরা মনের সুখে খুসী হয়ে বসে আছি জাপান এসে আমাদের স্বাধীন করে দেবে!

সকলেই কেমন যেন গুম মেরে গেছে, চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে আছে। স্বরাজ ডিউটী থেকে ফিরে ব্যারাকে ঢুকে বলে উঠল, কি রে, তোরা যে সব নিরাকার ভোজে বসে গেছিস! ব্যাপার কি?

কয়েকজন কেমন যেন ক্লান্ত দৃষ্টিতে স্বরাজের দিকে ফিরে চায়। স্বরাজ অনন্তর কাছ ঘে'ষে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে রে! কোন খারাপ খবর আছে নাকি?

অনন্ত বলল, না, এই যুদ্ধের কথা হচ্ছিল।

স্বরাজ বলল, তাই বল, আমিতো রেগুলার ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! এতো সুখবর! ষ্টেশনে একজন সিভিলিয়ান ভদ্রলোক বলছিলেন, ষ্টালিনগ্রাদে আড়াইলক্ষ জার্মান সৈন্য ঘেরাও হয়ে গেছে! এইবার জার্মানি কুপোকাৎ! ৪৫ সালের মধ্যেই আমরা বাড়ী ফিরতে পারব।

অকস্মাৎ একসঙ্গে একটা উল্লাস ফেটে পড়ল. হিপ্-হিপ্-হুর্রে—

খগেন লাফিয়ে উঠে বলল, বলিস কিরে! এই শালা নরক থেকে তাহলে আমরা মুক্তি পাব?

সকলের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মুক্তি! সত্যিইতো মুক্তি!

স্বরাজ বলল, যাক, এইবার আমার খবরটা শোন, শুনলে আর এক-দফা ভমকে যাবি!

পাঁচকড়ি বলে ওঠে, বাড়ী ফেরার আশা যখন দেখা দিয়েছে তখন আর কিছুতেই ঘাবড়াই না!

স্বরাজ বলল, মেজর ব্রাউন বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে!

পাঁচকড়ি বলল, যেতে দাও শালাকে জাহান্নমে!

স্বরাজ বলতে লাগল, আর ওর জায়গায় যেটী আসছেন সেটি নাকি মেজর রায়ের রাজসংস্করণ!

পাঁচকড়ি আবার তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠে, তাতে আর খুব সুবিধে হবে না! বলে দিও যাদুদের, আমরা আর সেই ভেড়াটি নেই। এখন থেকে ইটটী মারলে পাটকেলটী খেতে হবে!

অনন্ত বলল, তা ইনি যে এমন হঠাৎ আমাদের অকুল পাথারে ভাসিয়ে চললেন! ইনিও কি মেজর রায়ের মত বিদ্রোহ করছিলেন নাকি?

স্বরাজ বলল, ইনি চলেছেন প্রমোশন নিয়ে। তা আজ প্রায় দেড়-বছর হয়ে গেল আমাদের কোম্পানিতে এসেছেন।

অমল বলে ওঠে, প্রমোশন এঁর না হলে আর হবে কার! এমন সুন্দর ভাবে কচুকাটা করল এই দেড়টাবছর ধরে! সমস্ত কোম্পানিটার বোধহয় কমসে-কম ছ'মাসের মাইনে কেটেছে!

স্বরাজ বলল, তার ওপর আবার এ্যাডিশন্যাল কোয়ালিফিকেশন!

খগেন বলল, সেটা আবার কি! শুনি?

এঁর মেমসাহেবটী নাকি খুব সুন্দরী! তিনি আবার দিল্লী হেড-কোয়ার্টারসে এ-জি'র পার্সোন্যাল ষ্টেনো। শাস্ত্রের বচন, স্ত্রীভাগ্যে ধন! আর সুন্দরী স্ত্রী কিনা তাই ধন একেবারে ছপ্পর ফুঁড়ে পাচ্ছেন। কমিশন পাওয়ার চোদ্দদিনের মধ্যে লেফটেনান্ট, আড়াইমাসে ক্যাপটেন

আর চতুর্থ মাসে মেজর হয়ে আমাদের কোম্পানিতে অবতীর্ণ হলেন!

জনকয়েক একসঙ্গে বলে ওঠে, সাববাস!

স্বরাজ বলল, কিন্তু আসল খবরটাতো এখনও শুনিসনি। তাহলে একটু কাছে কাছে আয়, এ নিয়ে যেন হৈ-চৈ করিসনি।

সকলে গোল হয়ে স্বরাজকে ঘিরে ধরল। স্বরাজ চাপা গলায় বলল, সুবেদার সাহেব ঠিক করেছেন মেজর ব্রাউনকে ফেয়ারওয়েল্ দিতে হবে। আজ রোল-কলে তিনি সেই কথা তুলবেন আর সকলের কাছে চাঁদা চাইবেন। ফেয়ারওয়েলের দিন ঐ টাকায় কিছু একটা জিনিষ কোম্পানির ছেলেদের তরফ থেকে মেজর সাহেবকে প্রেজেন্ট করা হবে আর ক্যানটিনে একটা ছোটখাট জলসা করা হবে। ডাক পড়বে অমলের, বিজয়া সম্মিলনীর মত ভ্যারাইটী শো অর্গানাইজ করার জন্য!

অমল হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল, না, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমাদের রক্ত যারা তিলে তিলে শুষে নিয়েছে, আমাদের সঙ্গে যারা প্রতিটি মুহূর্তে কুকুর-বেড়ালের সামিল ব্যবহার করেছে, তাদের কাকেও আমরা কোন ভাবেই সম্মান দেখাবনা!

স্বরাজ বলল, কিন্তু অমল, সেইদিনই মেজর ব্রাউন আপগ্রেডিং-লিষ্টে সই করে যাবেন। অকাদা সে লিষ্ট তৈরী করে রেডি হয়ে আছে, মানপত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই লিষ্টটী মেজর সাহেবকে দেবে।

মুহূর্তের মধ্যে সকলেই স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ পাঁচকড়ি ফেটে পড়ে, তার মানে লোভ দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করবে!

শিবেন বলে ওঠে, ওসব আর হচ্ছে না। জাপানতো এসে পড়েছে! এইবার শালাদের গলায় পা দিয়ে ডুবিয়ে দেব!

সুনীল বলল, কিন্তু নামকাওয়াস্তে একটা ভ্যারাইটি-শো করলে যদি আপগ্রেডিঙটা পাওয়া যায়, মন্দ কি!

পাঁচকড়ি ক্ষিপ্তের মত লাফিয়ে ওঠে, চাইনা শালা আপগ্রেডিং! ইস্, জুতো মেরে গরু দান! এই চললুম আমি, কোম্পানির প্রত্যেকটা ছেলেকে বলব, ফেয়ারওয়েল বয়কট করতে!

* * *

রিভেলির পর ছেলেরা চা আর পুরি নিয়ে যে যার ব্যারাকে ফিরেছে। যাদের খাওয়া হয়ে গেছে তারা পি-টি'র পোষাক পরছে। যাদের বিছানা ড্রেসিং তখনও বাকী তারা তাড়াহুড়ো করে কাজ সেরে নিচ্ছে। হঠাৎ হুইসিল বেজে উঠল। যাদের কাজ শেষ হয়নি তারা চিৎকার করে ওঠে, দেখ মাইরী, এখনো পাক্কা দশমিনিট বাকী আর শালা হাবিলদার-মেজর কিনা হুইসিল বাজিয়ে দিল!

ব্যারাকের আর একপ্রান্ত থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, এই, কেউ ফল-ইন করিসনি!

এন-সি-ও'র দল ব্যারাকে ব্যারাকে ছুটছে, চিৎকার করছে, যে যে-পোষাকে আছ ওইভাবেই আভভি ক্যানটিনমে ফল-ইন। জলদি!

জনকয়েক ছেলে একজন এন-সি-ও'কে ঘিরে ধরে, কেন, ক্যানটিনে আবার এই সক্কালবেলায় কি?

মহাব্যস্তভাবে অন্য ব্যারাকের দিকে ছুটতে ছুটতে এন-সি-ও বলল, অতশত জানিনা বাপু, সুবেদার সাহেবের হুকুম! মেজর সাহেব এসেছেন।

ছেলেরা ভাবনায় পড়ে যায়, এই সাত-সকালে মেজর নেলসন এসেছে ক্যাম্পে! পি-টি'র বদলে ক্যানটিনে! বেবাক বিস্ময়ে ছেলেরা মূক হয়ে গেছে, সন্ত্রস্ত গতিতে তাবা ক্যানটিনে এসে জমা হতে থাকে। ক্যানটিনে শুধু মেজর নেলসন একা নয় অন্য অফিসাররাও আছেন। সুবেদার জমাদার হাবিলদাব-মেজর এমন কি অকাদাও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

—ব্যাপারটা কি? নতুন কোন হুকুম! তার জন্য সবকটি অফিসার এই ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে কেন! পার্ট-ওয়ান অর্ডারে একবার ছেপে দিলেইতো সুবেদার থেকে ক্ষুদে লান্স-নায়েক পর্যন্ত হুকুম মানাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যেত! কোম্পানি মুভ করবে? তার জন্যতো এত সকালে নরম বিছানা ছেড়ে ব্রেকফাষ্ট না করে এমন চিন্তিত মুখে অফিসারদের স্বয়ং এসে হাজির হওয়ার দরকার পড়ে না! মুখের কথা খসালেইতো ওই সুবেদার আর হাবিলদার-মেজর ধরে আনবার জায়গায় বেঁধে আনত!

সুবেদার সাহেব প্ল্যাটফরমে উঠে মিহিগলায় বললেন, তোমরা সকলে বসে পড়।

অফিসাররা আর তাঁদের পেছন পেছন হাবিলদার-মেজর প্ল্যাট-ফরমে উঠলেন। অকাদা তাঁর গোলকধাঁধার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঊর্ধনেত্র হয়ে প্ল্যাটফরমের সিঁড়িটায় বসে পড়লেন।

—নাঃ, আমাদের পক্ষে কষ্টকর কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়! তা যদি হত তাহলে ওদের মুখগুলো এতক্ষণে খুসীতে ভরে উঠত! কিন্তু ওদের মুখ যে শুকনো!

মেজর নেলসন প্ল্যাটফরমের সামনে এসে বলতে সুরু করলেন, তোমরা সকলেই জান, গত একমাস ধরে আসাম-বর্মা সীমান্তে যুদ্ধ সুরু হয়েছে। কয়েকটা জায়গায় আমরা পশ্চাদপদ হয়েছি। টিডিম যে আমাদের দখলের বাইরে চলে গেছে সে খবর তোমরা কাল রাত্রে রেডিওতে শুনেছ।

—টিডিমতো গেছে আর তোমরাও শালারা টিমটিম করছ! পশ্চাদ-পদ হওয়া ছাড়া তোমাদের আর গতি কি! কর শালারা বুট-পালিশ আর বিস্তারা-ড্রেসিং! জাপানীরা তোমাদের চকচকে বুট দেখেই পালিয়ে যাবে!

মেজর নেলসন বলে চলেছেন, কিন্তু আজ সকালে আমি তোমাদের কাছে রেডিওর খবর শোনাতে আসিনি। এমন একটা খবর আমি পেয়েছি, যে খবর এখনি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তোমাদের জানান দর-কার। জাপানীরা আমাদের ফোর্থ-কোর এলেকা আক্রমণ করেছে!

—তবে আর কি! এইবার বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপদ হতে সুরু কর! আর মরবার জন্য আমরাতো ভেড়ার পাল আছিই!

মেজর সাহেব তখনও বলছেন, এখন আমাদের সামনে বিরাট দায়ীত্ব। এমনই একটা দিনের জন্য আমরা আজ তিনবছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছি। সেই পরীক্ষার দিন আমাদের সামনে এসে গেছে। আমি তোমাদের কোম্পানিতে নতুন! আমার চেয়ে তোমাদের এই কোম্পানির ওপর দরদ ঢের বেশী। আজ প্রাণ দিয়েও কোম্পানির সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে হবে। আমাদের কোম্পানি যুদ্ধের মাঠে লড়বার বাহিনী নয়, আমাদের

কাজ রেল চালান। যদি প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার জন্য সব রকম অস্ত্রই তোমাদের ধরতে হবে।

—তাতো হবেই! দায়ীত্ব শেষ পর্যন্ত আমাদেরই নিতে হবে! শেষ লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে! আর সেইজন্য এই তিনবছর ধরে আমাদের আধমরা করে ফেলেছ! অস্ত্র যদি হাতে পাই তাহলে জাপানী-দের আগে শালা তোমাদের কচুকাটা করব!

একটা সিগারেট ধরিয়ে মেজর নেলসন আবার বলতে সুরু করেন, আজ আমাদের ওপর নির্ভর করছে সীমান্তের সৈনিকদের খাওয়াপরা, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সব কিছুই। আমরা আজ যত বেশী কাজ করতে পারব জাপানের পরাজয়ের দিন ততই এগিয়ে আসবে, ভারতবর্ষের নিরা-পত্তা ততই মজবুত হবে! আর আমাদের ঘরে ফেরার দিন ততই নিকট হবে!

নীরব সৈনিকের দল স্তম্ভিত হযে গেছে। এত সরলতা, এত আবেদন, তাদের শক্তির প্রতি এতখানি মর্যাদা! সবই কেমন যেন ভেল্কির মত মনে হয। তাদের সামরিক জীবনের সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস ধীরে ধীরে চোখের ওপর দিয়ে ভেসে চলে। অফিসার আর তার পুচ্ছ-গ্রাহীদলের অত্যাচার দিনের পর দিন জমা হয়ে উঠে, আজ যে আক্রোশ জাগিয়ে তুলেছে, তারই প্রতিহিংসা সবার আগে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে, দাঁত কড়মড় করে ওঠে! এদের ভাঁওতায় আর ভোলা হবে না! এমন সুযোগ আর ছাড়া হবে না! তাদের জীবনকে যারাই নষ্ট করতে আসবে তাদের তারা কিছুতেই ক্ষমা করবে না। মনে পড়ে বর্মা-ইভ্যাকুয়ী সৈনিক আর নাগরিকদের চেহারাগুলো আর তাদের প্রেতাত্মার মিছিল! শঙ্কিত সৈনিকের দল আতঙ্কে চোখ বোজে, মানসপটে ভেসে ওঠে তাদের গৃহের ছবি। তাদের স্নেহাতুর বাপ মা, অসীম সহানুভূতিশীল ভাই-বোন, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল স্ত্রী-পুত্র! তাদের কি হবে? তাদের শান্তির নীড়ে আগুন ধরিয়ে কে তাদের টেনে আনল এই মারণযজ্ঞে! কেন?

অফিসারদের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ চলে। তারপর মেজর সাহেব একটা শ্লিপ নিয়ে বলতে সুরু করেন, এইবার আমাদের কাজের একটা

খসড়া তৈরী করতে হবে। সমস্ত কোম্পানিটাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করব। প্রথমদল থাকবে রেলওয়ে-ডিউটীতে। দ্বিতীয়দল রেকী স্কোয়াড, মনিপুর-রেলহেড রক্ষা করবে—প্রতিদিন তারা লাইন পরীক্ষা করবে, দেখবে কোথাও কোন সাবোতাজ হচ্ছে কিনা। রেললাইনের ওপর কোথাও কোন হামলা হলে তারা এগিয়ে গিয়ে মহড়া নেবে। এই দলের কম্যান্ডার হবেন লেফটেনান্ট কর্নেলি আর সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সুবেদার নন্দী। এই দলে থাকবে চারজন ব্রেন-গান ক্রু আর আঠার-জন রাইফেলম্যান। বাকী লোক নিয়ে হবে তৃতীয়দল—রিজার্ভ ব্যাচ।

আবার কিছুক্ষণ জনান্তিকে আলোচনা চলে। এরই ফাঁকে সাদেক বলে ওঠে, শালাদের শেয়ালের যুক্তিতো আর শেষ হবে না দেখছি! এদিকে বিড়ি না খেয়ে যে পেট ফেঁপে ওঠবার জোগাড়!

পাশ থেকে রবীন বলল, আরে নে না, তুই বিড়ি ধরা। এখন আর শালারা কোন কথাটী কইবে না! বেগতিক দেখলে পায়েও ধরবে!

ফস্‌স্‌ করে দেশলাই জ্বালার শব্দে ক্যানটিনশুদ্ধ ছেলে চমকে ওঠে। মেজর নেলসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ইয়েস্‌, ইউ ক্যান্‌ স্মোক।

শ'খানেক বিড়ি সিগারেট জ্বলে উঠল। ধোঁয়ায় সমস্ত ক্যানটিনটা ভরে উঠেছে। মেজর সাহেব জানিয়ে দিলেন, টেকনিক্যাল ডিউটী-ওয়ালারা থাকবে ষ্টেশনের রাণিং-রুমে, রেকী-স্কোয়াড থাকবে ষ্টেশনের রিফ্রেসমেন্ট-রুমে আর রিজার্ভ ব্যাচ থাকবে ডিফেন্স-বক্সে। অফি-সাররাও সকলের কাছাকাছি থাকার জন্য থাকবেন আপার-ক্লাস ওয়েটীং-রুমে। কোম্পানির প্রত্যেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কীটস্‌ ছাড়া বাকী সমস্ত জমা করে দেবে ষ্টোরে। প্রত্যেকের ইউনিফর্ম হবে ব্যাটল-অর্ডারে।

এইবার রেকী-স্কোয়াড নির্বাচনের পালা। সুবেদার নন্দী তাঁর পেয়ারের জনকয়েককে নাম ধরে ডাকাডাকি সুরু করে দিলেন। যাদের নাম ধরে তিনি ডাকেন তারা ভীড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার চেষ্টা করে! সুবেদারকে তারা খুসী করেছে খোসামোদ করে, অন্যের নামে চুকলি খেয়ে, মাঝেমাঝে এটা-সেটা ঘুষ দিয়ে! মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়ার মত নৈতিক বল তারা পাবে কোথায়!

মেজর সাহেব সুবেদার সাহেবকে নিরস্ত করে বললেন, আমি তেমন লোক চাই যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে।

কিন্তু কে যাবে স্বেচ্ছায় এগিয়ে! মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়ার মত প্রেরণা কোথায়! তারা অনেকেই সংসারের একমাত্র অবলম্বন। তাদের জীবনে বিপর্যয় ঘটলে তাদের শূন্য স্থানকে পূরণ করার যে কিছুই নেই! গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত আঠারটাকা মাস-মাহিনার অর্ধেক ন'টাকা মাস-পেন্সনের ভরসায় নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে প্রবৃত্তি জাগে না।

সবকয়টী অফিসারের দৃষ্টি ছেলেদের ওপর নিবদ্ধ। ফ্যাকাশে মুখে আজ তাঁরা চেয়ে আছেন এই মানুষগুলোর দিকে। বেয়ণেটের ডগায় আদায়-করা আনুগত্য আজ তাঁদের প্রাণে আশার সঞ্চার করতে পারে না। তাই তাঁরা জানতে চান, যে মাটিব ওপর তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সে মাটি একেবারেই চোরাবালি কিনা!

অবশেষে জনকয়েক এন-সি-ও আর কয়েকটি ছেলে বেরিয়ে এল। বাকী ছেলেরা তাদের দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বলল, যা শালারা মরগে যা! মরে গেলে রাজা খেতাব পাবি!

পনের

একদিনের মধ্যে ষ্টেশনের চেহারা গেল বদলে। কাঁটাতার দিয়ে সমস্ত ষ্টেশনএলেকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। সারাদিনই কড়া পাহারার বন্দোবস্ত, বিশেষ করে সন্ধ্যের পর আটহাত অন্তর সেন্ট্রী মোতায়েন হয়। প্রতিটী ইয়ার্ডের মুখে মুখে পিলবক্স তৈরী হচ্ছে। স্লিট-ট্রেঞ্চের ওপর করা হচ্ছে ক্যামোফ্লাজ। সমস্ত ষ্টেশনএলেকায় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক-আউট। ইয়ার্ডগুলো অন্ধকার, ইঞ্জিনের হেডলাইট জ্বলে না, রাতের বেলায় একমাত্র পয়েন্টসম্যানদের হাতবাতি ছাড়া আর কোন আলোও জ্বলে না। সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। বিনা পাস-ওয়ার্ডে ষ্টেশনএলেকার মধ্যে ঢুকলে জীবন হয়ে উঠছে সংশয়াপন্ন! এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফটগুলো সব সময়ে উর্ধ্বমুখ হয়ে আছে। ইনফ্যান্ট্রির একটা পুরো কোম্পানি ষ্টেশন রক্ষার ভার নিয়েছে।

রেলের কাজ যারা করছে তাদের কার্যকাল আটঘন্টা থেকে বাড়িয়ে বারঘন্টা করা হয়েছে। সংখ্যানুপাতিক হিসাবে রিজার্ভের লোক নাকি অনেক কম! সুতরাং রেলের কাজ থেকে ছাঁটাই করে রিজার্ভ ব্যাচের হিসাব পূরণ করা হয়েছে।

গাড়ী চলাচলের সংখ্যা গেছে বেড়ে। আমেরিকানরা নতুন কায়দায় গাড়ী চালান সুরু করেছে। একসঙ্গে একশ'খানা ওয়াগন জুড়ে, মাথায় ডবল-ইঞ্জিন লাগিয়ে হু হু শব্দে টেনে নিয়ে যায় বড় ইয়ার্ডওয়ালা ষ্টেশনে; যেমন লামডিং, মনিপুর রোড, মারিয়ানি, তিনসুকিয়ায়। আসছে ট্রুপস-স্পেশ্যাল একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে ট্যাঙ্ক-স্পেশ্যাল, ব্রেন-গান-ক্যেরিয়র-স্পেশ্যাল আর তার ফাঁকে হাণ্ড্রেড-কার স্পেশ্যাল। আসছে সৈনিক অস্ত্রশস্ত্র খাদ্য কাপড়চোপড় জন্তুজানোয়ার —মনে হয়, বুঝিবা পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ এসে জড় হচ্ছে এই ডিমাপুরে! গাড়ী এসে মেইন-ইয়ার্ড বা ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডে থামছে, সঙ্গে সঙ্গে ইয়ার্ড-পাইলট লোড সর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সাইডিঙে।

ষ্টেশনের আবহাওয়াটা হয়ে উঠেছে থমথমে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই! বিরাম নেই! বিশ্রাম নেই! যান্ত্রিক উন্মত্ততার বেড়াজালে পড়ে মানুষগুলোও পেয়েছে যান্ত্রিক গতিবেগ। চাকার ঘরঘর শব্দে তাদের কানে বাজতে থাকে একটীমাত্র কথা, 'যত বেশী কাজ তারা করতে পারবে, জাপানের পরাজয়ের দিন ততই এগিয়ে আসবে আর ঘরে ফেরার দিনও ততই নিকট হবে।'

সকালের প্রথম খবর, লাল ফৌজ আরও এগিয়ে গেছে, ষ্টালিনগ্রাদ মুক্তি পেয়েছে, খারকভ পুণরুদ্ধার হয়েছে, লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভেঙে পড়েছে।

তবে কি মুক্তির দিন এগিয়ে আসছে!

রেকী স্কোয়াড কাজ বুঝে নিয়েছে। উঁচু দেয়ালওয়ালা একটা খোলা ওয়াগনের ওপর স্যান্ডব্যাগ দিয়ে বুক সমান পাঁচিল তোলা হয়েছে। তারই অন্তরালে দুইকোণে দুই ব্রেনগান আর তাদের পেছনে ন'জন করে রাইফেলম্যান। এর মধ্যে মহড়াও বারকয়েক হয়ে গেছে।

রিজার্ভ-ব্যাচ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সময়টুকুর জন্য তাদের

যাবতীয় মালপত্তর ঘাড়ে করে ক্যাম্পে ফিরে আসে। দুবেলার খাওয়া সেরে নেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করে, সন্ধ্যে হওয়ার আগেই আবার ফিরে যায় ডিফেন্স-বক্সে। পাশেই তাদের ওয়েস্ট-ইয়ার্ড, সেখান থেকে ভেসে আসে কর্মচাঞ্চল্যের কলরব! ক্যাম্পের গণ্ডি ছেড়ে যাওয়ার হুকুম নেই! তাই তারা কান পেতে শোনে ওয়াগন ঠোকাঠুকির শব্দ, পাইলট ইঞ্জিনের হুইসিল আর ভাবে, কবে তাদেরও ডাক পড়বে!

ডিমাপুরের মধ্যে সবচেয়ে যেটা মারাত্মক জায়গা, সেই পেট্রোল-সাইডিঙে হয়েছে রিজার্ভ ব্যাচের নিরাপদ আশ্রয়! কোটি কোটি গ্যালন পেট্রোল সেখানে মাটির তলায় আর ওপরে জমা করে রাখা হয়েছে। সে জায়গার নিরাপত্তাতো একটি ইনসেনডিয়ারি-বম্বের অপেক্ষায়! তারই মধ্যে তারা থাকে চারফিট গভীর, ক্যামোফ্লাজ করা বৃহৎ এক ট্রেঞ্চের মধ্যে। তাদের চারপাশে আছে অনেকগুলো এ্যাক-এ্যাক-পোষ্ট আর পিল-বক্স। সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তারা নেমে যায় গহ্বরের নীচে, দিনের শেষ তাদের কাছে তখনই হয়ে যায়! শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না বলে তারা শুয়ে পড়ে। চিৎ হয়ে শুয়ে নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে জোর করে চেয়ে থাকে; ভাবে বাড়ীর কথা! আরও ভাবে, যদি সত্যিই জাপানীরা আক্রমণ করে তখন তারা কেমন করে আত্মরক্ষা করবে! উপায় ভাবতে গিয়ে একমাত্র পালিয়ে যাওয়া, পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাড়ি দেওয়া ছাড়া আর কোন সমাধান খুঁজে পায় না। রুদ্ধ আক্রোশে হাতদুটো মুঠো হয়ে ওঠে আর চোখ দুটো যায় বন্ধ হয়ে! অন্ধকারের বুক চিরে চলতে থাকে বর্মার ইভ্যাকুয়ীরা মিছিল করে, মৃত্যুর পরোয়াণা উঁচিয়ে নরকঙ্কালের শোভাযাত্রা বানিয়ে!

কোহিমাকে দু'দিক দিয়ে জাপানীরা আক্রমণ করেছে। মাও-এর মাঝামাঝি আক্রমণ করে ইমফলের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সোজা নেমে আসছে প্রধান সড়ক ধরে কোহিমার দিকে; অপর দিকে কোহিমার পেছন থেকে বোকাজান রোড আর জেসিম রোডের মাঝামাঝি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে উঠছে কোহিমার আশপাশের গ্রামগুলোয়।

অতর্কিত এই আক্রমণে কোহিমার প্রতিরোধ-ব্যূহ টলমল করে উঠেছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমার রাস্তাও বিপন্ন হয়ে উঠেছে, জাপানীরা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে রাস্তার ওপর গুলি চালাচ্ছে। কোহিমার অবস্থা সংকটাপন্ন! ডিমাপুর থেকে কোহিমা ছেচল্লিশমাইল!

সন্ধ্যার অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। রিজার্ভ-ব্যাচ খাওয়াদাওয়া সেরে ডিফেন্স-বক্সে ফিরে গেছে। রেকী-স্কোয়াড ডিউটী বদল করে তাজা উৎসাহে পজিশন নিয়েছে। টেকনিক্যাল-ডিউটীতে বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। পাইলট-ইঞ্জিন ভসভস শব্দে সমস্ত ইয়ার্ডটাকে চষে বেড়াচ্ছে। পয়েন্টসম্যানরা হাতবাতি জেবলে নিচ্ছে। অফিসাররা ওয়েটিং-রুমের ইজিচেয়ারে বসে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে শুষ্কমুখে কোহিমার কথা আলোচনা করছেন।

হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল!

দুঃসহ সে আর্তনাদ বুকফাটা কান্নার মত মানুষকে পাগল করে তোলে। অসহ্য সে অবস্থায় মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঊর্ধ্বে চোখ তুলে আকাশের দিকে চায়। চাঁদ! আকাশের কোলে চাঁদের আলো ঝলমল করছে! আতঙ্কে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

কয়েকসেকেন্ড পরেই ছুটল এ্যান্টি-এয়ারক্রাফট থেকে গুলি। ডিমাপুর বেস'এর সবক'টা এ্যাক-এ্যাক-পোষ্ট থেকে একই সঙ্গে ফায়ারিং চলতে থাকে। কখনও গুলি ছুটছে রিপিট, কখনো অটোম্যাটিক। সমস্ত আকাশটা ট্রেসার বুলেটের আগুনে সরলরেখার রূপালি জালে ছেয়ে গেছে!

সাইরেনের শব্দ অফিসাররা লক্ষ্য করছিলেন, ট্রেঞ্চে যাওয়ার আগে মদের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ফায়ারিঙের শব্দে হাত থেকে গ্লাস খসে পড়ে যায়, নেশা তাঁদের ছুটে যায়! মেজর নেলসন একদৌড়ে বাইরে ছুটলেন। সমস্ত ষ্টেশনটা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, কেবল দুহাত চওড়া জিগজ্যাগ একটা রাস্তা রাখা হয়েছে থার্ড-ক্লাস-ওয়েটিং-রুমের সামনে! সোজা দৌড়ে বাইরে যেতে গিয়ে মেজর নেলসন হোঁছট খেলেন সেই কাঁটাতারের বেড়ায়, সামলে ওঠার আগেই

তিনি আটকে পড়লেন কাঁটাতারের মধ্যে!

ওহ গড—আর্তনাদ যারা শুনল তারা সজাগ হয়ে সঠিক রাস্তা ধরল!

রেকী-স্কোয়াড ব্রেনগানগুলোকে এ্যাক-এ্যাক পজিশন করে নিয়েছে। একঝাঁক প্লেন উড়ে আসছে কোহিমার দিক থেকে, তার শব্দে হাওয়ার কাঁপন বেড়ে উঠেছে। ব্রেনগান-ক্রু'র হাতের পাতা ঘেমে উঠেছে। রাইফেলম্যানরা নিল-ডাউন পজিশনে বসেও উরুর কাঁপন রোধ করতে পারছে না। প্লেনের ঝাঁকটা যেন ছড়িয়ে পড়ছে, জমাট শব্দ যেন পাতলা হয়ে যাচ্ছে! ক্রু'নাম্বার-ওয়ান চিৎকাব করে উঠল, কোথায় গেল সেই শুয়োরকা-বাচ্চা কর্নেলি?

একজন রাইফেলম্যান বলে ওঠে, তুই চালা গুলি! সে শালা এতক্ষণে কেঁচোর গর্তে ঢুকেছে!

চাপা একটা গোঙানির শব্দ খুব কাছে কোথায় গুমরে উঠছে! চমকে সে সেইদিকে ফিবে চায়। তাদেরই একজন রাইফেলম্যান মুখ থুবড়ে স্যাণ্ডব্যাগের ওপর পড়ে রয়েছে!

ইয়ার্ড-ফোরম্যান সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট-ইঞ্জিনটাকে কেটে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে সান্টীং নেক'এ। পয়েন্টসম্যানরা হাতবাতি নিভিয়ে শ্লিট-ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছে। তারা চেয়ে আছে আকাশের দিকে! মৃত্যু যেন গুঁড়ি মেবে এগিয়ে আসছে তাদের কাছে, আরও কাছে!

রিজার্ভ-ব্যাচ ততক্ষণে শুয়ে পড়েছিল। সাইরেনের শব্দে তারা উঠে বসেছে। এরপর আর তাদের কিছুই করবার নেই, তারা রয়েছে নিরাপত্তার সেরা বন্দোবস্তের মধ্যে! ইচ্ছে করলে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ভাবে শুয়ে থাকতে পারে! তবুও তারা উঠে বসেছে! এ্যাক-এ্যাক ফায়ার যখন সুরু হল তখন জনকয়েক মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে! দু'তিনজন কাপড়ে পায়খানা করে ফেলেছে! কতক উঠে দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে আছে! কেউ কেউ আপনমনে বিড়বিড় করছে! হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল, আমি পালাব! আমি মরতে পারব না! অন্ধকারের মধ্যে ছোটাছুটী করে সে পথ খুঁজতে থাকে!

*   *   *

কোহিমার খবর ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। লড়াই চলেছে সমস্ত কোহিমা এলেকা জুড়ে। প্রধান রাস্তা বা সহর এলেকাকে এড়িয়ে জাপানীরা দখল করতে সুরু করেছে গ্রামের পর গ্রাম! আর সেই গ্রামের মধ্যে থেকে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে এসে কোহিমাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে! কোহিমার সঙ্গে ডিমাপুরের যোগাযোগ আরও কয়েক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ খবর, জাপানীরা জুবজা পর্যন্ত নেমে এসে কনভয়গুলোকে আক্রমণ করছে। জুবজা ডিমাপুর থেকে মাত্র তেইশমাইল।

আগের দিন শোনা গিয়েছিল নাগা পাহাড়ের ডিভিসন্যাল-কমিশনার জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছে। সেদিন সকালে তাকে দেখা গেল মণিপুর রোড ষ্টেশনে. মুখময় খোঁচাখোঁচা দাড়ি, পায়ে একজোড়া ছেঁড়া গামবুট, জামাকাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে গেছে! জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে পালিয়ে এসেছেন। তাঁর ধারণা, কোহিমা জাপানীদের হাতে চলে গেছে!

অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিক প্রশ্ন ছেলেদের মনে জেগে উঠেছে, কোহিমা যদি গিয়েই থাকে তাহলে ডিমাপুর আর কতক্ষণ! ইষ্ট-ইয়ার্ড, ওয়েষ্ট-ইয়ার্ড আর মেইন-ইয়ার্ডের সংযোগস্থলে তিনইয়ার্ডের ষ্টাফ এসে জমা হয়েছে। স্বরাজ বলল, আর কেন, এইবার পাততাড়ি গুটাবার বন্দোবস্ত কর!

শিবেন বলল, সে বন্দোবস্ততো হয়ে গেছে! জানিস না বুঝি?

কি রকম!

কুড়িখানা বগি দিয়ে একটা স্পেশ্যাল-ট্রেণ তৈরী হয়েছে। তার জন্য ভাল একটা ডব্লিউ-ডি ইঞ্জিন চব্বিশঘন্টাই রেডি! গার্ড তার মাল-পত্তর নিয়ে ব্রেকভ্যানে আস্তানা নিয়েছে! আর ড্রাইভার ফায়ারম্যান ইঞ্জিনেই আছে!

খগেন বলে উঠল, অর্থাৎ পালানর পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত!

শিবেন বলল, শুধু কি তাই! লরি বোঝাই করে মালপত্তর আসতে সুরু হয়েছে। এরিয়া-হেডকোয়ার্টারের সব মাতব্বররাই আছেন। বগিগুলো সব ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ডক্লাস. তার ওপর আছে একখানা

ডাইনিং-কার। জিনিসপত্তর যা এসে পেঁাচেছে সবই শালাদের প্রাইভেট কীটস্। সব শালার ট্যাঁকের নার্সগুলোরও মালপত্তর এসে হাজির হয়েছে আর ডাইনিং-কারটা বোঝাই হচ্ছে মদের পেটিতে।

স্বরাজ বলে ওঠে, যা থাকে কপালে আমিও উঠে পড়ব ব্রেকে!

ওই আনন্দেই থাক। এ গাড়ীর গার্ড কে জানিস? সার্জেন্ট মেজর স্মিথ। ড্রাইভার হচ্ছে লোকো-ফোরম্যান স্ক্যালান্ আর ফায়ার-ম্যান ম্যাসি আর বান্টেন!

খগেন বলল, তাহলে আমাদের মরতেই হবে? অত সহজে মরছিনা বাবা! বেঁটে মামারা এলেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে যাব, বলব সুভাষ বোসের দেশের লোক। তারপর এ শালাদের দিয়ে রিক্সা টানাব!

স্বরাজ বলল, অগত্যা! তাছাড়া আরতো কোন উপায় দেখছিনা!

মেইন-ষ্টেশনের পয়েন্টসম্যান মণিপুর-সাউথের কেবিনম্যানকে জানায়, জাপানীরা বোকাজানে ঢুকে পড়েছে। খবরটী গুটিগুটি এগিয়ে চলতে থাকে। পাঁচকড়ি ওয়েষ্ট-ট্রুপস-সাইডিং থেকে দৌড়ে এসে খগেনকে বলে, চল মাইরী, আমরা রওণা হয়ে পড়ি। বোকাজান মানেতো এখান থেকে দশমাইল। তবে আর কতক্ষণ!

খগেন বলল, কিন্তু পালাব কোন চুলোয়! রাস্তাতো চিনি না!

সাউথ-ষ্টেশন থেকে সুনীল কন্ট্রোল-ফোনে পাঁচকড়িকে ডাকছে।

পাঁচকড়ি খগেনকে বলল, চল, নিশ্চয়ই কোন খবর আছে!

ফোন ধরে পাঁচকড়ি বলল, কিরে সুনীল, খবর কি?

খগেন পাঁচকড়ির মুখের দিকে চেয়ে আছে। শুনতে শুনতে পাঁচ-কড়ি আঁতকে উঠল, এ্যাঁ—ধানশিরিতে ধরা পড়েছে? দুজন?

ফোন নামিয়ে পাঁচকড়ি বলল, শুনলিতো, ধানশিরিতে দুজন জাপানী ধরা পড়েছে! বল্, এখন কি করা যায়?

খগেন শুধু অসহায়ভাবে পাঁচকড়ির মুখের দিকে চায়। পাঁচকড়ির যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। হঠাৎ সে ফেটে পড়ে, এমন ফাঁদেই পড়েছি যে নড়বার ক্ষমতাটি নেই! ডাহা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে?

বেলা যত বাড়ছে, গুজব ততই জোরাল হয়ে উঠছে! কোহিমার পতন ঘটেছে, এরা কেবল কোহিমা থেকে নেমে আসার রাস্তাটা আটকে

রেখেছে। বৃটীশের সমস্ত এ্যামুনিশন ফুরিয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান সোলজারদের জাপানীরা কিছুই বলছে না। আজকেই রাতের অন্ধকারে ডিমাপুর আক্রমণ করবে। ডিমাপুরকে দুদিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের মত সমস্ত বৃটীশ ফৌজকে করবে ঘেরাও! জাপানীরা এসে গেছে গোলাঘাটে, সেখানে বাজারের পথে রীতিমত লড়াই হচ্ছে। জামগুড়িতে এসেছে চারজন, বোকাজানে ছজন, ধানশিরিতে যে কত-জন তা জানা যায়নি।

অকাদা তাঁর গোলকধাঁধার ওপর চোখ রেখে লাইন ডিঙোতে ডিঙোতে ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডে চলেছেন। শিবেন বলল, আমাদের কি হাল হবে দাদা?

কেন ভাই, কি হয়েছে রে?

আপনি থাকেন ও-সি'র পাশে পাশে আর বলছেন কিনা কি হয়েছে!

আমার কি আর মাথার ঠিক আছে ভাই! এই দেখনা, বেলা দুটো থেকে সেকেণ্ড-বৃটীশ-ডিভিশন আসতে সুরু করবে। প্রতি আধঘন্টা অন্তর-অন্তর একখানা করে ট্রুপস-স্পেশাল আসবে। বুঝতেইতো পারছিস ভাই, সে কি ভীষণ ব্যাপার! সমস্ত ইয়ার্ডটাতো ক্লিয়ার চাই?

কিন্তু তাঁরা এসে আর করবেন কি, এদিকে জাপানীরাতো ডিমা-পুরের দুদিকেই ঢুকে পড়েছে। আপ'এ ঢুকেছে বোকাজানে আর ডাউনে ধানশিরিতে! আমরাতো ঘেরাও হয়ে গেছি।

হঠাৎ যেন অকাদা ক্ষেপে উঠলেন, কে তোকে একথা বলেছে বল, তার নামটা একবার বল, এখনই তাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে তবে ছাড়ব! সে পাক্কা ফিফথ-কলামনিষ্ট! এসব কথায় কান দিসনি ভাই, কি দর-কার ভাই আমাদের এসব কথায়! জানিসতো, আমরা বাঙালীরা হয়েছি শালাদের চক্ষুশূল। এ শালারা মনে করে বাঙালী হলেই যেন সুভাষ বোসের আত্মীয়!

কিন্তু দাদা—

কিন্তু-টিন্তু নয় ভাই। শোনা যাচ্ছে জাপানীদের সঙ্গে কিছু কিছু ভারতীয় সৈন্য এসেছে! সেই যে যারা হংকং'এ সারেণ্ডার করেছিল। তারা নাকি এদিকসেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে! এইতো কালই

একজন পাঞ্জাবী লেফটেনান্ট পি-ও-এল-সাইডিঙে ধরা পড়েছে! সে নাকি পেট্রোল নিয়ে জাপানীদের কাছে পেঁছে দিচ্ছিল! বুঝলি না ভাই, দিনকাল বড় খারাপ! একটী কথাও বলিসনি, চুপচাপ নিজের কাজ করে যা।

হতাশা আর আতঙ্কের একটা ছায়া ঘনিয়ে ওঠে ছেলেদের মনে। কাজের চাপে যারা এতক্ষণ অসুরের মত খেটে চলেছিল তারা ঝিমিয়ে পড়ছে। সবকিছুর আগে তাদের কাছে বাঁচার প্রশ্নটাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচতে যে তাদের হবেই! কিন্তু তার উপায় কি! দেখেছে তারা বর্মা-ইভ্যাকুয়ীদেরও জীবনসংগ্রাম! শুধু বাঁচবার জন্য, কোনমতে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে ধরে রাখবার জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছে! মা তাব শিশুকে ফেলে রেখে গাড়ীতে উঠেছে! এক টুকরো পাঁউরুটীর জন্য একজন যুবতী তার দেহ বিকিয়ে দিয়েছে!

তবে কি তারাও জাপানীদের সামনে হাত তুলে দাঁড়াবে! এছাড়া বাঁচার কি আর কোন পথ নেই?

কোহিমার অবস্থা চরমে উঠেছে! জাপানীরা ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে কোহিমা-ক্যান্টনমেন্ট! যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠছে ক্যান্টনমেন্টের প্রবেশ পথে। যে সৈন্য ওখানে আছে তারা সামাল দিতে পারছে না। বৃটীশ যদি কোহিমা রক্ষা করতে না পারে তাহলে প্রায় সমস্তটা আসাম চলে যাবে জাপানের হাতে! ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতট ছাড়া আর কোথাও বোধহয় তারা একটা আত্মরক্ষা ব্যূহ পর্যন্ত খাড়া করতে পারবে না!

তাই আসছে সেকেণ্ড-বৃটীশ-ডিভিসন! বিশ্ববিশ্রুত দুর্দ্ধর্ষ বৃটীশ-সেকেণ্ড-ডিভিসন, উত্তর-আফ্রিকায় যে জার্মানিকে ঘায়েল করেছে, সেই ক্র্যাক-ডিভিসন। আসছে ডারহামস, ডি-সি-এল-আই, কে-আর-আর, কিংস-ওন-রেজিমেন্ট, কুইনস-ওন-রেজিমেন্ট, আরও কত কি! বৃটীশ যেন তার সমস্ত জাতটাকে উজাড় করে দিয়েছে কোহিমাকে রক্ষা করার জন্য। কোহিমা যদি রক্ষা হয় তবেই ভারতবর্ষ রক্ষা পাবে!

ট্রুপস-স্পেশ্যাল এসে দাঁড়াচ্ছে প্ল্যাটফরমে, আর-টি-ও ট্রাকে ষ্টার্ট দিয়ে একেবারে তৈরী! তাদের কীট্‌ব্যাগে প্ল্যাটফরম ভরে ওঠে।

ষ্টেন-গান হাতে নিয়ে তারা ট্রাকে উঠছে, ট্রাক রওনা হচ্ছে কোহিমার উদ্দেশ্যে! ত্রিশখানা করে ট্রাকের কনভয়, সামনে সামনে চলেছে ব্রেন-গান-ক্যেরিয়ার ড্রাম-ম্যাগাজিন ফিট করে। প্রতি তিনখানা লরির পেছনে একখানা ব্রেনগান-ক্যেরিয়ার। তাদের কাছে নির্দেশ, যে কোন উপায়েই হোক কোহিমা-ক্যান্টনমেন্টে তাদের পেঁছতেই হবে।

কয়েকখানা ট্রুপস-স্পেশ্যাল আসার পরই এল একখানা ট্যাঙ্ক-স্পেশ্যাল, বারখানা বত্রিশটন ট্যাঙ্ক নিয়ে! তারপর আবার আসতে সুরু করে ট্রুপস-স্পেশ্যাল, রয়াল-আইরিশ-ফ্যুসিলিয়ার্স, নরফোক্-রেজিমেন্ট, এসেক্স-রেজিমেন্ট ইত্যাদি। ব্যবস্থা সেই একই, ত্রিশখানা ট্রাকের কনভয়, তার সামনে ট্যাঙ্ক, তার পেছনে ট্যাঙ্ক। ডিমাপুর থেকে কোহিমা পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকা চাই-ই!

খুসির একটা ভাব যেন ঘনিয়ে উঠতে চায়! হয়তো যুদ্ধের মোড় এইবার ঘুরবে! লাল-ফৌজ যদি ষ্টালিনগ্রাদ থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে রাশিয়া মুক্ত করতে পারে তাহলে কোহিমা কেন মুক্তি পাবে না!

খবর আসতে থাকে বৃটীশ-সেকেণ্ড-ডিভিসন সামাল দিতে পারছে না। একটার পর একটা রেজিমেন্ট যাচ্ছে আর কয়েকঘন্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে! যে কনভয় করে তারা গিয়েছিল কোহিমায় লড়তে সেই কনভয় করে তারা ফিরে আসছে রেড-ক্রস ঝুলিয়ে! নিতান্ত ভাগ্যবান যারা তারা ফিরে আসছে ডিমাপুরের হাসপাতালে!

হাসপাতালে আর সীট নেই! সাধারণ রোগীদের ছুটী দিয়ে ইউ-নিটে পাঠিয়ে দিচ্ছে! ব্যারাকের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যতটুকু জমি আছে সেইখানেই তাঁবু খাটান হচ্ছে। এম্বুলেন্স-স্পেশ্যাল দুখানার জায়গায় আরও দুখানা আমদানি করা হয়েছে সিরিয়স-কেস গৌহাটীতে ট্রান্সফার করার জন্য!

মেজর নেলসন যিনি নিজে বোধহয় দিনে দুবার দাড়ি কামিয়ে থাকেন, ইন্সপেকসন-প্যারেডে যিনি ছেলেদের গালে হাতের উল্টোপিঠ ঘষে দাড়ি-কামান পরীক্ষা করেন, তাঁরও গাল খোঁচাখোঁচা দাড়িতে কালো হয়ে উঠেছে! ছেলেদের বুটের ওপর কাদা আর মাটী জমে একটা আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে, প্যান্টে ক্রীজ নেই, জামায় বোতাম নেই, টুপির

নীচে ঘাড়ের চুল বড় হয়ে উঠেছে, খোঁচাখোঁচা দাড়িতে মুখগুলো কদাকার দেখাচ্ছে। তবুও মেজর নেলসনের মেজাজ খারাপ হয় না!

ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডের একনম্বর লাইনে হেডকোয়ার্টার-স্পেশ্যালখানা ষ্টেবল করা আছে। গাড়ীর নীচে লাইনের মাঝখানে ঘাস বড় হয়ে উঠেছে, রেলের ওপর আর চাকার টায়ারে মরচে ধরে গেছে। মেজর নেলসন সতৃষ্ণ নয়নে কিছুক্ষণ গাড়ীখানার দিকে চেয়ে থাকেন। প্রত্যেকটা কামরা জিনিষপত্রে বোঝাই, ধীরে ধীরে তার ওপর ধুলো জমে উঠছে!

মেজর নেলসন তলব করলেন ইয়ার্ড-ফোরম্যানকে। অমল এসে সামনে দাঁড়ায়। মেজর সাহেব হুকুম দিলেন, প্লেস্ দি এইচ্-কিউ-স্পেশ্যাল্ ইন্ প্ল্যাটফরম্ নাম্বার থ্রি ওয়েষ্ট-ট্রুপস-সাইডিঙ এ্যাট্ ওয়ান্স!

পয়েন্টসম্যান্ রবীন মেজর সাহেবের সামনেই হাত নেড়ে বলে উঠল, কি যাদু, দৌড় বুঝি ফুরিয়ে গেল? যত বড়াই বুঝি আমাদের কাছে!

মেজর সাহেব রবীনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হনহন করে ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন। পয়েন্টসম্যান মবারক বলল, তা ছাড়া আর কি! ও শালাবাতো এবার পালাবে ল্যাজ গুটিয়ে আর মরব আমরা!

অমল রবীনকে বলল, যাও রবীন, ট্যাঙ্ক স্পেশ্যাল থেকে ইঞ্জিনটা কেটে একনম্বরে নিয়ে এস।

রবীন আপন মনে গজগজ করতে করতে চলল, ট্যাঙ্কগুলো আগে আনলোড হলে ডাউন-ট্রেণটা ছেড়ে দেওয়া যেত। তা-না ও-শালাদের পালানর বন্দোবস্তটাই হল জরুরী! ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে তেড়ে উঠল, চল হে, এইবার কর্তাদের পালানর ব্যবস্থা কর!

সান্টার আমিন বলল, তার মানে!

মানে আর কি! এঁরাতো কেটে পড়ছেন, এইবার মর শালা যত হাভাতের দল! চল, সব ছেড়ে এখন ওঁদের এইচ-কিউ-স্পেশ্যাল প্লেস্ করে আসি!

ইঞ্জিন কেটে একনম্বর লাইনে ঢুকে রবীন ফুট-প্লেটের ওপর লাফিয়ে উঠে বলল, শালারা না যদি পারে ছেড়ে দিক না, আমরা ওই জাপানীদের খতম করে দিচ্ছি। তা-না! এইরকম একটা অবস্থায়

আমাদের হাতে রাইফেল ষ্টেনগানতো দূরের কথা একটা ডাণ্ডাও শালারা দিল না! বেঘোরে প্রাণটা যাবে আর কি!

আমিনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, জাপানীরা এসে পড়েছে নাকি?

রবীন খেঁকিয়ে ওঠে, আসবে নাতো কি বসে থাকবে নাকি!

রবীনের দিকে চেয়ে কথা বলার ফলে আমিন সিগন্যাল লক্ষ্য করতে পারেনি। পাইলট-ইঞ্জিনটা জোরে রেকটার ওপর এসে পড়েছে! সামনে দাঁড়িয়ে অমল মবারক আর সিরাজ হাঁ-হাঁ করে চিৎকার করে উঠল। আমিন সমস্ত ভ্যাকুয়াম ডাউন করে দিল! তবুও ইঞ্জিনটা গড়িয়ে গিয়ে রেকটায় মারল ধাক্কা!

অমল আঁতকে উঠল, সর্বনাশ! একনম্বর লাইনে একটা ওয়াগন গড়ালে যেখানে রোখা যায় না সেখানে মালভর্তি কুড়িখানা বগির এক-খনা রেক ঠেকাবে কি করে! রেকটা গড়াতে সুরু করেছে, ধীরে ধীরে যেন তার গতি বেড়ে উঠছে। সকলে থতমত খেয়ে গেছে! অমল হাঁ করে রেকটার দিকে চেয়ে আছে আর সেটা দুলতে দুলতে গড়িয়ে চলেছে মেইন ইয়ার্ডের দিকে! মেইন-ইয়ার্ডে তখন সান্টীং হচ্ছে।

সিরাজ বলে উঠল, কি হবে অমলবাবু?

অমল নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, রবীন, পয়েন্ট বানাতে বানাতে চলে যাও মেইন-ইয়ার্ডে, ওদের সান্টীং বন্ধ করতে বল! সিরাজ তুমি চলে যাও ব্রেকে, জোরসে হ্যাণ্ড-ব্রেক লাগাও।

সিরাজ বলল, ব্রেক-ভ্যানের হ্যাণ্ড-ব্রেকগুলো যে ধরে না!

অমল চিৎকার করে উঠল, উপায় নেই সিরাজ, এগাড়ী আমাদের থামাতেই হবে। যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয় এই গাড়ীতে তাহলে আমাদের জাপানী-চর বলে গুলি করে মারবে!

সিরাজ চলে গেল। অমল মবারককে বলল, আমি এক কাজ করি মবারক, ইঞ্জিনের কাউক্যাচারে উঠে দেখি কাপলিংটা লাগান যায় কিনা, তুমি ইঞ্জিনে উঠে সিগন্যাল দাও!

মবারক বলল, আমি কাউক্যাচারে উঠছি আপনি ইঞ্জিনে উঠুন।

পাইলট ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, রেকটার অনেক কাছাকাছি

এসে পড়েছে। মবারক কাপলিং-হুক ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। অমলের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, বলল, আর ছ'ইঞ্চি আমিন! খুব সাবধান! আর যেন বাম্প না লাগে!

আর একটু স্পীড দরকার। আমিন লিভারটা আর একটু তুলে ধরে, ছোট্ট একটা ঝাঁকানি দিয়ে ইঞ্জিনটা ঝপ করে এগিয়ে যায়, কাপলিঙে কাপলিঙে লাগে ঠোকাঠুকি! অমল ফুটপ্লেটের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, লেগেছে মবারক?

কোন উত্তর এল না! কেবল একটা আর্তনাদ মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল! আমিন পুরো-ভ্যাকুয়াম ডাউন করে দিয়ে উল্টো দিকে রেগুলেটাব ঘোরাচ্ছে! রেক আর ইঞ্জিন খানিকটা ঝাঁকানি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল!

ইঞ্জিনের সামনে দৌড়ে গিয়ে অমল আঁতকে ওঠে, ও-ও-ওঃ— তার সমস্ত শরীর ঠকঠক কবে কাঁপতে থাকে, চোখদুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে! মবারকের দিকে খানিকটা এগিয়ে যায়, হাতদুটো বাড়িয়ে মবারককে ধরতে গিয়ে থমকে যায়! শূন্যে মেলে ধরা হাতদুটো ঝুলতে থাকে! বুজে-আসা গলার মধ্যে থেকে একটা স্বর কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে, ম-বা-র-ক—

আমিন নেমে এসেছে, ফায়ারম্যান দুজনও নেমে এসেছে। কাউ-ক্যাচার, লাইন, শ্লিপার, দুটী-লাইনের মাঝখানে খোয়াগুলো লালে লাল হয়ে উঠেছে, ফিনকি দিযে তখনও রক্ত ছুটছে!

রবীন আর সিরাজ আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। রবীন চিৎকার করে বলছে, এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছি অমলবাবু!

রবীন এসে পাশে দাঁড়াতেই অমল তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চেপে ধরল! ফুঁপিয়ে সে কেঁদে উঠল! সমস্ত শরীরটা তার থরথর কবে কাঁপতে লাগল! ধীরে ধীরে রবীন অমলকে সরিয়ে দিল, এগিয়ে গেল একধাপ দুধাপ। মবারকের শরীরটা কেটে ছ'টুকরো হয়ে গেছে, হাত পা ধড় সব মিলে মিশে তালগোল পাকিয়ে গেছে! খোয়ার ওপর রক্ত জমে উঠেছে দইয়ের মত। রবীন আরও এগিয়ে গিয়ে বসল মবারকের কাটা মাথাটাব সামনে। মবারকের চোখদুটো যেন তার দিকে বিস্মিত

দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে! অতি সন্তর্পণে মাথাটা দুটীহাতের মধ্যে তুলে নিল! নাড়া পেয়ে মাথা থেকে খানিকটা রক্ত ঝরঝর করে ঝরে পড়ল!

পেছনদিকে মুখটা ঘুরিয়ে রবীন ডাকল, আয়রে সিরাজ—

আমিন বলল, অফিসারদের খবর না দিয়ে লাশে হাত দেওয়া কি ঠিক হবে রবীন?

রবীন আমিনের মুখের ওপর চোখদুটোকে স্থির রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। যেন আপন মনেই বলতে থাকে, এ্যাঁ ঠিক হবে না! মবারকের লাশে হাত দেওয়া ঠিক হবে না! আমাদের মবারক—

হঠাৎ সে এক-লাফে এগিয়ে এল আমিনের দিকে, উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠল, আমাদের মবারকের লাশে হাত দেব কিনা তার হুকুম নিতে যাব ওই সব হারামীর বাচ্চা অফিসারদের কাছে? সে শালা কুত্তার দলতো আর এক ডালকুত্তার মুখে আমাদের ছেড়ে দিয়ে পালাবার মতলব করছে।

সিরাজ রবীনের হাত থেকে মবারকের মাথাটা নিল। রবীন একটা একটা করে মবারকের শরীরের টুকরো সিরাজের হাতে দিতে লাগল...

কোহিমার লড়াইয়ে বৃটীশ-সেকেণ্ড-ডিভিসন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বিশ্ববিশ্রুত সেকেণ্ড-ডিভিসন যে জার্মানিকে উত্তর-আফ্রিকায় ঘায়েল করতে পারে, যার মদগর্বিত পদভরে পৃথিবী টলমল করে, যার রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, সেই অপরাজেয় বৃটীশ-বাহিনী জাপানীদের হাতে কচুকাটা হয়ে গেল!

ডিমাপুর যায় যায়। হেডকোয়ার্টার-স্পেশ্যালের যাত্রীসংখ্যা প্রতি-দিনই বাড়তে থাকে! আরও মালপত্তর ট্রেণে বোঝাই হতে থাকে! বড় বড় অফিসাররা ঘনঘন এসে গাড়ীটাকে দেখে যান।

অকাদাকে ঘিরে ধরে ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, ঠিক করে বলুন দাদা, আমাদের অবস্থাটা এখন কি? এ শালারা কি সত্যিই পালাবে?

আকাদা বললেন, সত্যি বলছি ভাই, এদের মতলব আমি কিছুই বুঝতে পারি না। তবে শেষচেষ্টা আর একবার করবে বলেতো মনে হয়। আজ জিরো-আওয়ার্স থেকে নাকি ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন

আসতে সুরু করবে। ফোরটীনথ-আর্মির কমান্ডার জেনারেল স্লিম বলেছেন, জাঙ্গল-ফাইটীং বৃটীশ সোলজারদের কম্মো নয়! যদি কিছু করতে পারে তো ইন্ডিয়ানরাই পারবে। অবশ্য আমাদের অফিসাররা একথা শুনে মুচকে হেসেছে! ব্লাডি-ইন্ডিয়ানদের দ্বারা আবার লড়াই! অথচ দেখ ভাই, সেভেনথ-আর্মিতো ইটালি দখল করল! জানিস্ তার মধ্যে বারআনা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সোলজার!

এ সংবাদে প্রাণে আশ্বাস জাগে না, উৎসাহ আসে না। জাপানের জয়ে প্রাণে আর উল্লাস জাগে না, বৃটীশের জয়ে তারা খুশী হয় না। বারবার মনে হয়, তারা যদি আজ স্বাধীন হত তাহলে ষ্টালিনগ্রাদের মত যুদ্ধ তারাওতো করতে পারত! আর কোহিমাকে বলছে কিনা ভারতের ষ্টালিনগ্রাদ! কিন্তু ভারতবাসী যেখানে পরাধীন, ভারতীয় সৈনিক যেখানে নিছক ভাড়াটে-গুন্ডা, সেখানে কোহিমার লড়াইকে ষ্টালিনগ্রাদের সঙ্গে তুলনা করা মানে ষ্টালিনগ্রাদের তাৎপর্যকে বিকৃত করা!

অকাদা ছেলেদের বারণ করে দিয়েছেন কোহিমার লড়াই নিয়ে খোলা-খুলি আলোচনা করতে। কেমন যেন সন্দিগ্ধ একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এরিয়া-হেডকোয়ার্টারের দুজন ভারতীয় কেরাণীর কোর্ট-মার্শালে প্রাণদন্ড হয়ে গেছে! তারা নাকি জাপানী-চরের কাজ করছিল!

অমলের মনে পড়ে, জয়ন্তর মুখে মেজর রায়ের ঘুঁষির কথা। মেজর রায়ওতো জয়ন্তকে জাপানী-চর বলেছিলেন! মনে পড়ে কোষ্টাল-ব্যাটারীর কোর্ট-মার্শালের কথা। বারজনের ফাঁসি আর দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তারা নাকি মাদ্রাজ উপকুল আক্রমণ করতে জাপানীদের সাহায্য করার ষড়যন্ত্র করেছিল!

আরও মনে পড়ে টেরিটোরিয়াল-ফোর্স সিকসটীনথ-বেঙ্গল-ব্যাটা-লিয়নের ইতিহাস! প্রায় দুহাজার বাঙ্গালী ছেলের ওপর কি অমানুষিক নির্যাতন এরা করেছে! ভারতের সীমানার মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যায় জুলুম চালিয়েছে। কিন্তু অন্নের কাঙাল এই ছেলেদের নোয়াতে পারেনি। দিনে বারঘন্টা পাহাড় কাটিয়ে, কাঁটাপেরেকের ওপর খালি পায়ে ডবল-মার্চ করিয়ে, আড়ালে

ডেকে রিভলভারের ডগায় শাসিয়েও রাজি করাতে পারেনি! শেষ পর্যন্ত ব্যাটালিয়ন ভেঙে দিয়েছে। তারাও কি ছিল জাপানী-চর?

অগষ্ট আন্দোলনের সময়ে বহু ভারতীয় সৈনিক জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। তাদের সরিয়ে স্টেশনে স্টেশনে মোতায়েন করতে হয়েছিল বৃটীশ সৈনিক। গুলি করার হুকুম যে ভারতীয় সৈনিকেরা মানেনি তাদের ফাঁসি দিয়েছে, গুলি করে মেরেছে। তাদের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ—জাপানী-চর!

আঘাতে আঘাতে শতচূর্ণ হয়ে যেন ছেলেরা একটু একটু করে বুঝতে পারে কি বিরাট এক ষড়যন্ত্রের ফাঁদে তারা এসে পড়েছে। ব্যক্তিগত অভাব অনাটনের বিরুদ্ধে প্রাণের বিনিময়ে লড়াই করতে এসে তাদের মধ্যে জাগে পরাধীনতার চেতনা। পরাধীনতা যে কত কদর্য, তা তারা হাড়েহাড়ে বুঝতে পারে। তাই একক মানুষগুলো ধীরে ধীরে বহুর সমষ্টিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। বুঝতে তারা পারে, বাঁচতে হলে এই ষড়যন্ত্রকে বাধা দিতে হবে—প্রতিরোধ করতে হবে প্রতি পদে-পদে!

নতুন করে আবার সৈন্য আমদানি সুরু হয়ে গেছে। আবার সেই ট্রুপস-স্পেশ্যাল একটার পর একটা! আসছে পাঞ্জাব-রেজিমেণ্ট, বেলুচি, গাড়োয়াল, গুর্খা! উৎসাহ এদের মধ্যেও নেই কিন্তু আছে যেন একটা দৃঢ় সংকল্প। যুদ্ধ এরা করে, প্রাণের মমতা না রেখেই করে কিন্তু কার স্বার্থে কি উদ্দেশ্যে তা এরা জানে না!

ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন লড়াইয়ের মাঠে নেমেছে, লড়াই করতেই তারা নেমেছে! দুর্জয় জাপানের বীরত্বের মুখোস খসে পড়তে লাগল! অজেয় জাপান পেছু হঠতে লাগল! ডিমাপুরের চেহারায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। হেডকোয়ার্টার-স্পেশ্যাল থেকে অফিসারদের মালপত্তর খালাস হল। তারপর একদিন খালি গাড়ীখানা পাণ্ডু ফিরে গেল!

•অমল ভাবে, তবে মবারকের এমন ভাবে মরবার কি দরকার পড়েছিল! তবুওতো মবারক মরল! এই কি তার বিধিলিপি! নিছক দুমুঠো অন্ন সংস্থান করতে এসে এ কি শোচনীয় ভাবে মবারক মরে গেল! তাতে কারই বা কি ক্ষতি হল? কেবল তার যুবতীবধূ আর শিশুপুত্রের রইল না কেউ! কিন্তু ভাবনা কি, খুনীরাইতো বড় দাতা!

মেজর নেলসন দিয়েছেন পঞ্চাশটাকা আর গভর্ণমেণ্ট দেবে মাসে ন'টাকা পেন্সন! তবে আর কি, মবারকের দামতো উঠেই গেল!

পনের দিনের মধ্যে রিজার্ভ-ব্যাচ ক্যাম্পে ফিরে এল, রেকী-স্কোয়াড ভেঙে দেওয়া হল, টেকনিক্যাল-ডিউটীর ছেলেরা রানিং-রুম ছাড়ল। এরিয়া-হেডকোয়ার্টার থেকে লম্বা লম্বা বুলেটীন বার হয়, রোলকলে তার সমস্তটাই ছেলেরা খুশী মনে শোনে। কোহিমা থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হয়েছে, ইমফলের অবরোধ গেছে ভেঙে। ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন তখন টিড্ডিমে ঢুকছে!

ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন এগিয়ে চলেছে! এগিয়ে চলেছে জয়ের নেশায়, বীরত্বের মোহে! বর্মা থেকে পালিয়ে আসার পথে যাদের বুকের ওপর দিয়ে তারা হেঁটে এসেছিল সেই অভাগা সাথিদের স্মরণ করে তারা এগিয়ে চলেছে! দুর্মদ হয়ে উঠেছে তাদের পদক্ষেপ পিতৃ-পিতামহের অমর ঐতিহ্যের প্রেরণায়। দুর্দাম হয়ে উঠেছে তারা সৈনিকের মর্যাদায়। যে মর্যাদা দিতে বৃটীশ আজও অস্বীকার করে, আজও তাদের বানিয়ে রাখে ভারতের দাসত্বকে কায়েম রাখার জন্য দাস-বাহিনী!

ষোল

ক্যাম্প আবার জমজমাট। রিজার্ভ-ব্যাচ আর রেকী-স্কোয়াডের ছেলেরা প্যারেড আর ফেটীগ করতে সুরু করেছে। বিমর্ষ মুখে তারা ভাবে কোহিমা-সংকটের দিনগুলোর কথা।

রেলের কাজ তখনও পুরোদমে চলেছে কিন্তু এত লোক ফালতু হওয়া সত্ত্বেও বারঘণ্টা ডিউটীই বহাল আছে। মণিপুর-রোড থেকে পাণ্ডু পর্যন্ত ডবল-লাইনের কাজ সুরু হয়ে গেছে। এইবার ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসনকে শুধু রসদ জুগিয়ে যেতে হবে! তাই আসছে পনটুন, চীনদুইন নদী পার হতে হবে! আসছে ব্রিজিং-পার্টস, ডিমাপুর থেকে ইমফল সমস্ত রাস্তাটা ডবল-ওয়ে করতে হবে! আসছে টেলিগ্রাফের তার আর পোষ্ট, অসংখ্য ট্রাক খচ্চর আর অপর্যাপ্ত পেট্রোল!

অমলের ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডে সকালের সিফটে ডিউটী। সমস্ত শরীর দিয়ে তার দরদর করে ঘাম ঝরছে, মাথার মধ্যে ঝাঁঝাঁ করছে, তবুও এক

মুহূর্তের অবসর নেই! পেট্রোল-সাইডিঙে লোড প্লেস্ করতে হবে, ট্রান্সপোর্টেসন-সাইডিঙে প্লেস করতে হবে সমস্ত পনটুন, গ্রেফ-সাই-ডিঙে বুলডজার, ষ্টোরস-সাইডিঙে টেলিগ্রাফ-লোড! তিনখানা ডাউন-ট্রেণ এডভারটাইজ হয়ে আছে, রাঙাপাহাড়-মার্শালিং-ইয়ার্ডে যাবে সমস্ত ব্রিজিং-পার্টস্ নিয়ে একখানা সাট্‌ল্ আর হসপিটাল-সাইডিং থেকে যাবে এ্যাম্বুলেন্স!

রাগে ক্ষোভে অমলের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে, এত কম লোক দিয়ে কি এত কাজ সম্ভব! অথচ ক্যাম্পে লোক বসিয়ে রেখে ঘাস ছেঁড়াচ্ছে! জয় সম্বন্ধে কি এরা এতই নিশ্চিন্ত! রাশিয়া যদি আজ জার্মানিকে ঘায়েল করতে না পারত তাহলে জাপানকে পেছু হঠানর ক্ষমতা কি এদের হত?

সাদেক লুজসান্ট করেছে! একটা ওয়াগন গড়গড় করে গড়িয়ে যাচ্ছে—বাম্‌ম্! বাম্পের শব্দ হলেই অমল চমকে ওঠে! তার চোখের ওপর ভেসে ওঠে রক্তে মাখামাখি মবারকের টুকরো টুকরো দেহ! তাজা লাল রক্তের ওপর তাব বিস্মিত চোখদুটো!

মার্শালিং-ইয়ার্ডের ঝোপেব মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল অনন্ত। অমলকে কাছে ডেকে বলল, একটা জবরদস্ত খবর আছে অমল!

কি ব্যাপার?

অনন্ত বলতে লাগল, কালকে মকবুল একখানা টেলিগ্রাফ পেয়েছে, তার বৌয়ের অবস্থা খুব খারাপ। আঠারমাস সে ছুটী পায়নি। বলল, ছুটী আমাকে করিয়ে দিতেই হবে। খগেন বলল, হাবিলদার-মেজর থেকে সুবেদার সব শালাকে পাকড়াও কর, ও-সি'র কাছে তোমাকে পেশ করবে। কাল বিকেল থেকে মকবুল এদের প্রত্যেকের কাছে ধর্ণা দিয়েছে কিন্তু তাতে কোন ফলই হয়নি। হাবিলদার-মেজর বলেছে, চার্জসীট ছাড়া কাঁকেও পেশ করি না। জমাদার সাহেব বলেছেন, আমার কথা আর কে শুনছে। আর সুবেদার সাহেবতো ধমকধামক দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

অমল বলে উঠল, তা এঁদের মেজাজটা এত গরম কেন?

কি জানি ভাই, শালারা আক্রোশে যেন ফেটে পড়ছে! তারপর

মকবুল এসে সমস্ত খবর জানাতে বসে গেল আমাদের কমিটি। পাঁচকড়ি তখন মতলবটা দিল, প্যারেডে নামবার সময় মকবুল ফল-ইন না করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে! হাবিলদার-মেজর যখন ধমকধামক সুরু করবে তখন মকবুল সমস্ত কথা চেঁচামেচি করে বলবে, সেই ফাঁকে আমরাও লাইন থেকে হৈচৈ সুরু করে দেব। দেখি শালারা পেশ করে কিনা!

হলও ঠিক তাই। প্যারেড ফল-ইনের সময় মকবুল বলল, আমাকে মেজর সাহেবের কাছে পেশ না করলে আমি ফল-ইন করব না, তাতে আমার জানই যাক আর যাই হোক। প্রথমটা হাবিলদার-মেজর মিঠে কথায় বোঝাতে লাগল, এইসব ছুটীছাটা বাজে ব্যাপারে মেজর সাহেবের কাছে গেলে তিনি ভীষণ চটে যান।

প্ল্যান আমাদের তৈরীই ছিল। একজন লাইনের মধ্যে থেকে বলে উঠল, আর চার্জসীটে পেশ করলে বুঝি খুব খুশী হন? আর একজন বলল, একজনের বৌ মরে যাওয়াটা বুঝি বাজে ব্যাপার হল? এমনি করে একটা-দুটো কথা থেকে রীতিমত একটা হট্টগোল সুরু হয়ে গেল। হাবিলদার-মেজর মুখচোখ লাল করে মকবুলকে বলল, ভাল চাওতো ফল-ইন কর বলছি। মকবুল কোন জবাব দেওয়ার আগেই অনেকে মিলে চিৎকার করে উঠল, না কিছুতেই ফল-ইন করবে না! সুবেদার সাহেব আশপাশে কোথায় যেন ছিলেন। হঠাৎ দৌড়ে এসে মকবুলের হাতটা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন কোয়ার্টার-গার্ডে। কেমন যেন হাওয়াটা থমথমে মেরে গেল, ছেলেরাও কেউ আর কোন কথা বলল না।

অমল বলল তারপর?

তারপর চার্জসীট বানিয়ে সুবেদার সাহেব মকবুলকে ও-সির কাছে পেশ করলেন। অর্ডারলি-রুমে মকবুল সমস্ত কথা বলে। মেজর সাহেব মকবুলকে সাতদিনের মাইনে ফাইন করেছেন বটে কিন্তু ছুটীও দিয়েছেন! শুধু মকবুলকে নয় সেই সঙ্গে আরও প্রায় কুড়ি জনকে।

অমল লাফিয়ে উঠল, তবে? ভেবনা যেন দয়া করে ছুটী দিয়েছে।

ডিউটী থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অমলের ডাক পড়ল হাবিলদার-মেজরের ঘরে। অমল গিয়ে হাজির হতেই তিনি আপ্যায়ন করে ডাকলেন, আসুন অমলবাবু, ডিউটী থেকে ফিরলেন নাকি?

অমল বলল, আমি বড্ড ক্লান্ত, একটু বসতে পারি কি ?

আরে বসুন বসুন, সেই জন্যইতো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনারাতো আমাকে শত্তুর মনে করেন—কিন্তু শত হলেও আমি একটা মানুষতো! আপনাদের ভালমন্দের কথা ভাবা আমার কর্তব্য—একটা ক্যাম্পটুল তিনি অমলের দিকে এগিয়ে দিলেন।

অমল বসে পড়ল। হাবিলদার-মেজর আবার সুরু করলেন, তা আজ প্রায় ছ'মাসেরও ওপর হয়ে গেল একটানা রেলওয়ে-ডিউটী করছেন, শরীরটাতো দেখছি খুবই খারাপ হয়ে গেছে। আমি মেজর সাহেবকে বলেছি। কাল থেকে আপনাকে আর রেলওয়ে-ডিউটীতে যেতে হবে না! ক্যাম্পে থাকবেন, একটুআধটু পি-টি প্যারেড করবেন, ব্যাস বাকী সময়টা আপনার রেষ্ট!

অমল হাসি চেপে বলল, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

হাবিলদার-মেজরের খুশীখুশী মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল। তবুও মোলায়েম সুরে বললেন, আর কি, এইবারতো সব বাড়ীতে ফিরবেন, লড়াইতো শেষ হল বলে। কোম্পানির ছেলেরা খুব খুশী, না?

অমল বলল, এই জন্যই বোধহয় আমাকে ডেকেছেন? আচ্ছা, আমি সত্যি কথাই বলছি। এভাবে যদি কোম্পানি আর কিছুদিন চলে তাহলে যে-কোন মুহূর্তে একটা গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে!

কেন?

কেন, সেকথা আপনি বোধহয় আমার চেয়েও ভাল জানেন।

কিন্তু যত দোষ সবই কি আমার? আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখছেন না! আমাকেওতো চাকরি বজায় রাখতে হবে! আমিতো নিছক হুকুমের দাস!

সেতো বটেই—অমল উঠে দাঁড়াল।

হাবিলদার-মেজর বললেন, তাহলে গণ্ডগোল আপনারা করবেনই?

অমল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, একথা আমি একবারও বলিনি। গণ্ডগোল করতে কেউই চায় না কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে!

কার কার সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেছে তাদের নামটা একবার শুনি?

অমল হেসে বলল, আপনার পাত্র-নির্বাচন খুব ভুল হয়েছে স্যার!

ঠিক ও-জাতের লোক আমি নই!

হাবিলদার-মেজর বললেন, কিন্তু আপনি কেন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন অমলবাবু! অফিসারদের কানে পর্যন্ত পেঁাচেছে, আপনিই হচ্ছেন ছেলেদের লীডার! এ আর মেজর ব্রাউন নয় যে জয়ন্তর মত আপনাকেও ট্রান্সফার করে দেবে! নির্ঘাত একটা কোর্ট-মার্শাল করে আপনার জীবনটাই হয়তো নষ্ট করে দেবে! লাভ কি অমলবাবু এই সব অশিক্ষিত ছোটলোকদের নিয়ে নাচানাচি করে? তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে—

অমল ফস করে বলে উঠল, আপনি যদি হুকুম করেন, আপনার লেকচার আমি শুনতে বাধ্য! কিন্তু আপনার হুকুমে আমাব মন বদলাবে না—

অমলের মুখের দিকে হাবিলদার-মেজর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন!

অমল বলল, এবার আমি যেতে পারি কি?

হাবিলদার-মেজরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, আচ্ছা—যান—

সন্ধ্যের পর ক্যাম্পের সমস্ত ছেলে এসে জড় হয় ক্যানটিনে। ছোট ছোট দলে এসে ইউরোপের বড় ম্যাপটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে লাল-ফৌজ কতদূর এগুলো! বার্লিন আর কতদূর!

'বাঙলায় খবর বলছি' ঘোষণাব সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে থাকে এসে ভেঙে পড়ে কাউন্টারটার ওপর, মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে রেডিওটার দিকে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনতে থাকে পৃথিবীজোড়া মানুষের ফ্যাসিষ্ট বর্বরদের বিরুদ্ধে অভিযান! লাল-ফৌজ জার্মানদেব তাড়িয়ে নিয়ে গেছে রাশিয়ার শেষ সীমান্তে—প্রবেশ করেছে বুমানিয়া আর পোল্যাণ্ডের মধ্যে! সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে বার্লিনের পথে! বৃটীশ আর আমেবিকানরা উত্তর-আফ্রিকাব যুদ্ধ শেষ করে ইতালি দিয়ে এগিয়ে আসছে খাস জার্মানির দিকে! প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানরা কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করেছে! বর্মায় ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন ফোর্ট হোয়াইট দখল করে এগিয়ে চলেছে মান্দালয়ের দিকে!

খবর বলা শেষ হয়। ছেলেরা ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়ে, গোল

হয়ে হিসেব করতে বসে আর কতদিন! আশায় আনন্দে মন নেচে ওঠে, বুক ভরে যায়, মুক্তির পথে তারা পা বাড়িয়েছে! লাল-ফৌজ এগিয়ে চলেছে বার্লিনের দিকে! তাদের চলার পথে বুকভরা দরদ ঢেলে দেয় লক্ষ যোজন দূরে বসে এই মুক্তিকামী মানুষগুলো! মুক্তির প্রতীক লাল-ফৌজ তাদের জীবনে এনেছে আশা উৎসাহ উদ্দীপনা! তারাও যেন চলতে থাকে লাল-ফৌজের সঙ্গে কার্পেথিয়ান পর্বত ডিঙিয়ে, ড্যানিয়ুব পার হয়ে, ওয়ারশ'র ওপর দিয়ে দুর্মদ পদক্ষেপে বার্লিনের দিকে! বার্লিন! বার্লিন হয়ে গেলেই যুদ্ধ শেষ! তাদের মুক্তি! সৈনিক জীবনের অবসান! আবেগে উচ্ছ্বাসে বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। তারাও তাহলে বাঁচবে! আবার তারা বাড়ী ফিরবে!

রোল-কলের হুইসিল পড়লে মাঠ থেকে উঠে গিয়ে ছেলেরা অলস মন্থর গতিতে রোল-কলে দাঁড়ায়। হাবিলদার-মেজর ঘোষণা করলেন, কাল সকালে রুট-মার্চ, মার্চ অফফ সাড়েপাঁচটায়।

পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠল, তার মানে আবার টাইট দিতে সুরু করেছে। মকবুলের ব্যাপারটায় দাদারা মনে বড় দাগা পেয়েছেন! সেই জন্যই বোধহয় তোমাকেও ডিউটী থেকে সরিয়ে নিল অমল!

অমল বলল, বোধহয় তাই।

পরদিন সকালে একখানা করে পুরি আর একমগ চা খেয়ে কোম্পানির সমস্ত প্যারেডওয়ালা ছেলে মার্চ করল। সামনে হাবিলদার মেজর, তাঁর পেছনে তিনটী স্কোয়াড। প্রতি স্কোয়াডের সামনে একজন করে হাবিলদার স্কোয়াড-কমান্ডার ষ্টেপিং দিচ্ছে, লেফট—রাইট—লেফট! ঝপ-ঝপ-ঝপ করে একই তালে পা পড়ছে। শব্দের মাদকতায় ছেলেরা নেশাতুর হয়ে উঠেছে! শ'খানেক ছেলে একটা মানুষের মত এগিয়ে চলেছে! দুনম্বর স্কোয়াড-কমান্ডার হাবিলদার সরকার বলল, তোমরা গান ধর, তাহলে ষ্টেপিং আরও ভাল হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল গানের সুর, জিন্দেগী হ্যায় প্যারসে, প্যারসে বিতায়ে যাও!

দুধারে ঘন জঙ্গল তার মাঝ দিয়ে নতুন তৈরী পথ, পীচ-ঢালা রাস্তা। সবকটা বুটের আওয়াজ যেন একটি আওয়াজ হয়ে দূর হতে

দূরান্তরে ঘন সবুজ বনানির প্রান্ত থেকে প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সকালের সূর্যের মিঠে রোদ কোথাও গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ী রাস্তার ওপর এসে পড়েছে। দুনম্বর-স্কোয়াডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এক আর তিননম্বর-স্কোয়াডও গান ধরেছে। গানের লহরে-লহরে, পায়ের তালে তালে শরীরের রক্তও যেন নাচতে সুরু করেছে। সৈন্যদল তখন একটা খাড়াই'এর ওপর উঠছে। হঠাৎ হাঁক এল, কোম্পানি, হল্ট!

একটী আওয়াজে তিনটী স্কোয়াড দাঁড়িয়ে পড়ল। হাবিলদার মেজর স্কোয়াড-কমাণ্ডারদের ডাকলেন। ছেলেরা গুঞ্জন করে ওঠে, শুধু শুধু হল্ট করালে কেন! বেশতো চলেছিলাম, বড় ভাল লাগছিল!

হাবিলদার সরকার ফিরে এসে বলল, তোমরা কেউ গান গেয়ো না

একজন জিজ্ঞেস করল, কেন হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার-মেজর সাহেব বারণ করেছেন!

ইস্, বারণ করলেই হল!

আবার চলার হুকুম হয়। ছেলেরাও চলতে থাকে কিন্তু ষ্টেপিং আর মিলতে চায় না! স্কোয়াড-কমাণ্ডাররা তারস্বরে ষ্টেপিং হেঁকে চলে, লেফট—রাইট—লেফট! হাবিলদার-মেজর একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের পা লক্ষ্য করছেন আর তাড়া দিচ্ছেন, কদম মিলাও। কদম তাতেও মিলতে চায় না। বেতালা বেখাপ্পা পা পড়ছে, মাঝে মাঝে পা ঘষে চলার শব্দ হচ্ছে, সে এক বিশ্রী ব্যাপার! ক্ষিপ্তের মত হাবিলদার-মেজর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কোম্পানি, ডবল—মার্চ!

ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়ে সবকটী ছেলে দৌড়তে সুরু করল, অসম তালে, যথেচ্ছ পদক্ষেপে। প্রায় পঞ্চাশগজ দৌড়ানর পর থামবার হুকুম হল। ছেলেরা দাঁড়াল, কোন লাইন নেই, ফাইল নেই, ড্রেসিং নেই, যে যেভাবে পেরেছে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। সন্তোষ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, দেখি কত মুরোদ ওর, কেমন করে ষ্টেপিং মেলায়!

খগেন জোরে বলে ওঠে, ষ্টেপিং আর মিলছে না বাছাধন, যতই ডবল করাও আর হামাগুড়ি দেওয়াও!

অনন্ত বলল, বেটা মনে করেছে কি! গান হল রুট-মার্চের একটা

অঙ্গ! আর উনি চান নিয়মটাই বদলে দিতে!

সাদেক বলল, বলুন অমলবাবু, শালাকে আজ মালুম করিয়ে দিই!

অমল খপ করে সাদেকের কব্জিটা চেপে ধরে। হাবিলদার-মেজর দৌড়ে ওদের সামনে এসে হাঁকলেন, রাইট টার্ণ—রাইট ড্রেস—পাগুলো ঘষতে ঘষতে ছেলেরা ট্যারা-ব্যাঁকা হয়ে দাঁড়াল, ডান-হাতটা কিছুটা ওপরে ঁঠ যেন শূন্যে ঝুলছে! ঘাড় ডাইনে না ফিরে কেবল কাৎ হয়ে আছে!

হাবিলদার-মেজর হাঁকলেন, আইজ—ফ্রন্ট—হাতগুলো উরুর ওপর ৃপাস করে পড়ে গেল আর মাথাগুলো সামনের দিকে ফিরল শির-টেনে-ধরা ঘাড় বেঁকানর মত!

একটু উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে হাবিলদার-মেজর বললেন, তোমরা ..দ মনে করে থাক এইভাবে আমাকে জব্দ করবে, তাহলে আমি বলে দিচ্ছি তোমরা খুব ভুল করছ! কয়েকটা চ্যাঙড়া ছোঁড়ার মতলব শুনে মার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা কর না। বিপদে পড়বে তোমরা যারা ন্দোষ। কাকেও আমি ছেড়ে কথা কইব না। যতদিন আমার কব্জিতে ই ক্রাউন আছে আর মেজর নেলসন এই কোম্পানিতে আছে ততদিন আমি যা হুকুম করব তাই তোমাদের শুনতে হবে।

ছেলেদের মাঝখান থেকে কে যেন বলে উঠল, দূর শালা কুত্তা!

হাবিলদার-মেজরের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, কি যেন একটা বলতে গিয়ে তখনই ঢোঁক গিলে নেন। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত ছেলেদের ওপর বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেঁকে ওঠেন, লেফট টার্ণ—কুইক মার্চ!

হুড়মুড় করে ছেলেরা হাঁটতে সুরু করেছে। হাবিলদার-মেজর ৌড়ে সামনে চলে যান। স্কোয়াড-কমান্ডাররা বারকয়েক ষ্টেপিং দিয়ে ুপ করে যায়। একটা কিছুর আশঙ্কায় সবকটা ছেলে গুম হয়ে আছে। .ছুদূরে যাওয়ার পর হুকুম এল, কোম্পানি—লেফট হুইল!

বাঁক খেয়ে একনম্বর স্কোয়াড এগিয়ে চলেছে, নেমে চলেছে পাহাড়ের ালু বেয়ে! আর কিছুদূরে নামলেই পচা জলের ডোবা! পা টিপে টপে অতি সন্তর্পণে নামছে, পায়ের ধাপ একটু অসাবধান হলেই পড়ে াচ্ছে। হাবিলদার-মেজর হেঁকে চলেছেন, লেফট—রাইট—লেফট!

খগেন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ওই পাঁকের মধ্যে নামাবে নাকি!

অনন্ত বলল, আমি জানতাম ও শালা অত সহজে ছাড়বে না।

সাদেক অমলের হাত চেপে ধরে বলল, আমরা কেউ জলে নামব না!

অমল বলল, কিছুতেই না! তাতে যা হয়, হবে।

একনম্বর স্কোয়াড নেমে চলেছে, প্রথমসারির তিনটী ছেলে বারবার পেছন ফিরে চাইছে। ভিজে মাটীতে তাদের পা পড়েছে, বুট একটু একটু করে বসে যাচ্ছে। মাঝের ছেলেটী পেছন দিকে চেয়ে সামনে পা ফেলতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

সাদেক আঁতকে উঠল, অমলবাবু!

সঙ্গে সঙ্গে অমল হেঁকে উঠল, হল্ট!

সমস্ত ছেলে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। হাবিলদার-মেজর স্বরটাকে লক্ষ্য করে ছুটে এলেন, কে! কে হল্ট বলল?

লাইনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে অমল বলল, আমি।

হাবিলদার-মেজর অমলের একটা হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, তুমি হল্ট বলার কে?

সাদেক একলাফে অমলের পাশে এসে বলল, খবরদার, গায়ে হাত তুলেছ কি তোমার দফা আজ শেষ! হাত ছেড়ে দাও বলছি!

হাবিলদার-মেজরের হাত থেকে অমলের হাতটা খসে পড়ল। সমস্ত ছেলেরা ওদের ঘিরে ধরেছে। হাবিলদার-মেজরের মুখখানা ঘেমে উঠছে উত্তেজিত ছেলেদের দিকে তিনি ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছেন!

সাদেক বলে উঠল, মনে করেছ কি! আমরা তোমার বেগারী নাকি?

অনন্ত বলল, আমরা স্যাপার হতে পারি কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনার চেয়ে কোন অংশে নীচে নই!

বারকয়েক ঢোক গিলে হাবিলদার-মেজর সামনে পেছনে চারপাশে কি যেন চেয়ে চেয়ে দেখলেন। একটু দূরে দেখতে পেলেন স্কোয়াড-কমাণ্ডার তিনজন খুব উত্তেজিত ভাবে কি যেন বলাবলি করছে। ফিরে তিনি অমলের মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, তা তোমরা কি চাও?

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বলে উঠল, আমরা চাই মানুষের মত ব্যবহার।

হাবিলদার-মেজর ফিকে হেসে বললেন, ওকথা আমাকে বলে কোন লাভ নেই অনন্ত! পরাধীন জাত কোনদিন মানুষের মত ব্যবহার পেতে

পারে না! ও কথা মেজর নেলসনকে বল।

ছেলেরা কেমন যেন ভ্যাবাচাকা মেরে যায়, পরষ্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। হাবিলদার-মেজর মোলায়েম সুরে বললেন, বেশতো, তোমরা যদি ম্যানুভারিং করতে না চাও তাহলে আর সামনে যেও না। কিন্তু এইটাই ছিল আজকের প্রোগ্রাম।

পেছন থেকে একজন বলে ওঠে, সব মিছে কথা। শালা শয়তান, বেকায়দায় পড়ে এখন ভাল মানুষ সাজছে!

চকিতে একবার পেছনে দেখে নিয়ে হাবিলদার-মেজর বললেন, কি করব বল! দোষ আমার নয়, দোষ আমার র‍্যাঙ্কের! যাক, এখন তোমরা কি করতে চাও তাই বল?

সাদেক বলল, আমরা মার্চ করার সময় খুশীমাফিক গান গাইব!

হাবিলদার-মেজর হেসে বললেন, বেশতো, রুট-মার্চ করার সময় গান গাওয়ারতো নিয়মই আছে। আমি কি এর আগে কখনও বারণ করেছি? কিন্তু আজ যে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল ম্যানুভারিং!

একজন ভেঙচে উঠল, ওঃ, কি আমার ভিজে বেড়ালটীরে! ম্যানুভার-ট্যানুভার সব বাজে কথা! আসল কথা আমাদের ওপর মেজাজ ফলান!

হাবিলদার-মেজর বললেন, যাক, আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে, রোদ চড়ছে। চল আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই।

নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে ছেলেরা ফল-ইন করল। মার্চ করতে সুরু করে ছেলেরা বুকের সমস্ত জোর ঢেলে দিয়ে গেয়ে উঠল,

জিন্দেগী হ্যায় প্যার্‌সে, প্যার্‌সে বিতায়ে যাও।
জিন্দেগী হ্যায় কওম্‌কি, কওম্‌সে বিতায়ে যাও ॥

পরদিন সকালে অর্ডারলি এন-সি-ও অমলের নাম হেঁকে গেল, দশ বজে দফ্তরমে হাজির!

ক্যাম্পময় রাষ্ট্র হয়ে গেল, অমলের নামে হাবিলদার-মেজর চার্জসীট করেছে। চাপা একটা উত্তেজনা সমস্ত ক্যাম্পটার মধ্যে গর্জে গর্জে উঠছে। স্কোয়াড-ড্রিলে তাল কেটে যায়, ডাইনে ঘুরতে ছেলেরা বাঁয়ে ঘুরে বসে! হাবিলদার সরকার হতাশ হয়ে পাঁচমিনিটের ব্রেক-অফফ দিয়ে দেয়।

সাদেক হাবিলদার সরকারকে বলল, আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে হাবিলদার সাহেব, আপনিতো কাল সবই নিজের চোখে দেখেছেন!

হাবিলদার সরকার আমতাআমতা করে, সে ক্ষমতা আমার নেই সাদেক!

সকালের প্যারেড শেষ হওয়ার সংগে সংগে খানার হুইসিল পড়ল। কিন্তু মগ-প্লেট হাতে ছেলেরা লংগরের দিকে দৌড়ায় না, ছোট ছোট দলে জটলা পাকাতে থাকে। অনন্ত বলল, কি করা যায় এখন! অমল-কেতো নিশ্চয়ই ফাঁসাবে!

পাঁচকড়ি দাঁত কড়মড় করে ওঠে, আমার ইচ্ছে করছে ওই শালা হাবিলদার-মেজরের মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিই!

খগেনের হাতদুটো নিসপিস করছে, অসহায়ভাবে সে সাদেকের দিকে চাইল। সাদেক বলল, অমলবাবুকে ফিরিয়ে না এনে আমরা খেতে যাব না।

জমায়েৎ ছেলেদের মধ্যে থেকে সম্মতি গর্জে উঠল, চল সকলে দফ-তরে! অমলবাবুকে কোন শাস্তি দেওয়া চলবে না!

অফিসের আশপাশে ধীরে ধীরে ভীড় বেড়ে ওঠে, ছোট ছোট দলে জটলা চলতে থাকে। সুনীল বলল, কিন্তু এতে কি কোন লাভ হবে? এতো মিউটিনীর মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

সাদেক তেড়ে ওঠে, তবে কি নেলসনকে বাপ ডেকে পা জড়িয়ে ধরে বলব, হুজুর ধর্মাবতার, গরীবের মা-বাপ, অমলবাবুকে ছেড়ে দাও! আর অমনি ওই চকচকে ব্রাউন-বুটের ঠোক্কর খেয়ে গালে হাত বুলতে বুলতে এসে বলব, নেলসন সাহেব মানুষ নয়রে, একেবারে দেবতা! ওসব কুত্তাপণা আর চলবে না। সাফ কথা, আজ যদি অমলবাবুকে ছাড়িয়ে আনতে না পারি তাহলে এই শালারা বুটের ডগায় আমাদের টিপেটিপে মারবে!

ছোট ছোট দলগুলো ক্রমশই কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আসছে! তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা রীতিমত একটা সোরগোলের সৃষ্টি করেছে। হাবিলদার-মেজর অফিসঘরের জানলায় এসে দাঁড়ালেন। ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, ধরে নিয়ে আয় শালা কুত্তাকে—আর একজন আক্ষেপ করতে থাকে, কাল শালা ঠেলায় পড়ে কেমন ভিজে বেড়ালটী সেজেছিল! ঘা কতক না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া খুব ভুল হয়েছে!

কিছুক্ষণের মধ্যে চারজন রাইফেল-সেন্ট্রী মার্চ করে অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। গার্ড-কমাণ্ডার অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রচুর হাঁক-ডাক করে এক-এক দরজায় দুজন করে সেন্ট্রী মোতায়েন করে দিল, চিৎকার করে বলল, অফিসের দশহাতের মধ্যে কেউ এলেই সোজা তার ওপর ফায়ার করবে—কটমট করে জমায়েৎ ছেলেদের দিকে চেয়ে হনহন করে কোয়ার্টার-গার্ডের দিকে চলে গেল।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একটী ছেলে একজন সেণ্ট্রীকে বলল, কিরে আমাদের গুলি করবি নাকি ?

সেন্ট্রী মুচকে হেসে রাইফেলের ওপর থেকে বুড়ো আঙুলটা দেখাল। ছেলেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

একটু পরে সুবেদার সাহেব এসে দরজায় দাঁড়ালেন। তাঁর পেছন থেকে অফিসের কেরানী-হাবিলদাররা উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। সুবেদার সাহেব মাঠে নেমে একজন সেন্ট্রীর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে ভীড় করেছ কেন ?

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা অমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব !

তোমরা কি ভুলে গেছ যে তোমরা এখনও মিলিটারীতে আছ !

সাদেক বলে উঠল, মিলিটারীতে আছি বলেতো আর কেনা-গোলাম হয়ে যাইনি ?

মেজর সাহেবকে দরজার গোড়ায় দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রীরা ভীড়ের দিকে রাইফেল ঘুরিয়ে অন-গার্ড পজিসনে দাঁড়াল। মেজর সাহেব নেমে এলেন সুবেদার সাহেবের পাশে আর তাঁদের পেছনে এসে দাড়ালেন হাবিলদার-মেজর। প্রত্যেকের কোমরে বিভলভার, হোলষ্টারের মুখ খোলা, বাটগুলো বেরিয়ে আছে ! মেজর সাহেব কিছুক্ষণ চারি-দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, ক্রুর দৃষ্টিতে চোখদুটো তাঁর কুঁচকে উঠেছে, ডানহাতটা রিভলভারেরই ওপর নিসপিস করছে ! আঙুল নেড়ে তিনি একজনকে ডাকলেন। জনকয়েক একসঙ্গে এগিয়ে আসছিল। তিনি বললেন, এক আদমী !

এগিয়ে এল সাদেক, উত্তেজনায় সে স্যালিউট করতেও ভুলে গেছে।

মেজর সাহেব বললেন, তুম্‌লোগ্‌ ইধর্‌ ক্যোঁ খাড়া হ্যায় ?

সাদেক বলল, হম্‌লোগ অমলবাবুকা বিচার দেখনে মাঙতা!

ক্যোঁ! উস্‌কো জরুর সাজা মিলেগা!

নহি সাব্‌ উন্‌কো কোই সাজা হোনা নহি চাহি! উন্‌কা কোই কসুর নহি হ্যায়! হাবিলদার-মেজর সাব্‌ হম্‌লোগোঁ পর জুলুম কিয়া ঔর্‌ উন্‌কো ঝুটমুট ফাঁসানে মাঙতা। আপ্‌ সাজা দেনে মাঙতা তো পুরা কোম্পানিকো সাজা দিজিয়ে! হম্‌লোগ তৈয়ার্‌ হ্যায়!

মেজর সাহেব আর একবার সমস্ত ছেলেদের ওপর চোখ বুলিয়ে নেন। একটু যেন চিন্তা করে নিয়ে বললেন, আচ্ছা ঠিক হ্যায়, তুম-লোগোঁকো বাত্‌ ম্যায় য়্যাদ্‌ করেগা অর্ডার্বলি-রুম্‌কে বখ্‌ত্‌। যাও, তুমলোগ খানা খা লেও!

সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল, অমলবাবুকে সঙ্গে না নিয়ে আমরা খেতে যাব না—মেজর সাহেব ভীড়টার ওপর আরও এক-বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অফিসঘরে চলে গেলেন।

আধঘন্টা পরে অমল বেরিয়ে এল অর্ডার্বলি-রুম থেকে, মুখে তার বিজয়ীর হাসি। সেন্ট্রীরা তাকে ঘিরে ধরল, রাইফেলেব মুখ ঘুরিয়ে ধরল ছেলেদের দিকে। কয়েক-পা এগোতেই ছেলেরা অমলকে ঘিরে ধরল। অনেকে একসাথে ভেঙেগ পডল, তোমায় ছেড়ে দেয়নি অমল!

অমল বলল, মাত্র চোদ্দদিনের কয়েদ! আমি নিজেই মেনে নিয়েছি দুটী সর্তে। প্রথমত, প্যারেড-প্রোগ্রাম হাল্কা করা হবে আর দ্বিতীয়, হাবিলদার-মেজবকে এ কোম্পানি থেকে ট্রান্সফার করা হবে। অফিসের সামনে তোমাদের এভাবে জমায়েৎ হতে দেখে মেজর সাহেব রীতিমত ভয় পেয়ে গেছেন। আমাদের জয় হয়েছে!

সাদেক ভেঙেগ পড়ল, কিন্তু কয়েদ কেন মেনে নিলেন অমলবাবু?

অমল বলল, এ ছাড়া আর যে কোন উপায ছিল না সাদেক!

সাদেক ফুঁসে উঠল, উপায় ছিল না মানে? আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না! আমরা কি কিছুই করতে পারতাম না?

সাদেকের আবক্ত ক্ষুব্ধ মুখখানার ওপর থেকে অমল চোখ নামিয়ে নিল। বাকী ছেলেরা নীরবে ধীরে ধীরে ব্যারাকে ফিরে গেল।

* * *

হাবিলদার-মেজরের ঘরের সামনে ছেলেরা সারাদিন ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করছে, সত্যিই হাবিলদার-মেজর চলে যাচ্ছে কিনা! দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সন্দেহও গভীর হয়ে ওঠে। থ্রী-থার্টি-ডাউনের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটা তাদের কাছে সরল হয়ে যায়। পাঁচকড়ি আক্রোশে ছটফট করে, দেখলেতো শালা নেলসন ভাঁওতা দিয়ে অমলকে কেমন কোয়ার্টার-গার্ডে পুরে দিল!

সাদেক বলে উঠল, অমলবাবুও যেমন! মনে করেন বুঝি এ শালারা মুখে কথা কয়! এ শালা বেজম্মারা সব করতে পারে! ভেবেছে, অমল-বাবুকে কোয়ার্টার-গার্ডে পুরে আমাদের সায়েস্তা করবে! আচ্ছা, আমরাও দেখছি।

রোল-কলে হাবিলদার-মেজর এলেন অর্ডার শোনাতে। অন্ধকার আকাশের তলায় ছেলেদের মুখ দেখা যায় না। ছেলেদের যার মুখে যা আসে তাই বলে হাবিলদার-মেজরকে খিস্তি করতে থাকে। হাবিলদার-মেজর আর মেজাজ দেখান না, অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে রোল-কল ডিস্‌মিস্‌ করে দিয়ে নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলতে থাকেন। হঠাৎ তাঁর পিঠের ওপর একখানা আধলা-ইট এসে পড়ল ধাঁই করে। পেছনের দিকে না চেয়ে তিনি দৌড়ে চলে যান নিজের ঘরের মধ্যে!

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতেই একজন সেন্ট্রী অমলকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। উত্তেজনায় সে হাঁপাতে থাকে, চোখদুটো তার বড় বড় হয়ে উঠেছে। অমল বলল, কি হয়েছে?

ভীষণ কাণ্ড অমলবাবু!

কি কাণ্ড?

কাল রাত্রে হাবিলদার-মেজরের ঘরে শাবল ছুড়ে মেরেছে!

তারপর?

শাবলটা দেয়াল ফুটো করে ভেতরে ঢুকে যায়, তবে হাবিলদার-মেজর সাহেবের গায়ে লাগেনি!

অমল স্তম্ভিত হয়ে যায়। থরথর করে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে! এমন কাজ করল কে? কেন?

বেলা বাড়তে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই সমস্ত কাজ সুরু হয়।

প্যারেড, ফেটীগ সমস্তই চলতে থাকে। প্রিজনার্স এন-সি-ও নায়েক রামজীবন যথাসময়ে এসে অমলকে ফেটীগ খাটাতে নিয়ে যায়। বুটের ওপর মোজাটা উল্টে দিয়ে, হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে, খালি মাথায় কোদাল কাঁধে নিয়ে অমল চলে জঙ্গলে মাটি কাটতে। সকালে সাতটা থেকে এগারটা আর বিকেলে একটা থেকে পাঁচটা মাটি-কাটা হল কয়েদীর ফেটীগ। প্যারেড গ্রাউন্ডের ওপর দিয়ে, একনম্বর আর তিননম্বর ব্যারাকের ফাঁক দিয়ে অমল চলেছে। যে কোন ছেলেকে সে দেখে ক্ষণেকের জন্য তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নায়েক রামজীবনকে পাশ কাটিয়ে রবীন অমলের পাশে পাশে চলতে চলতে চাপা গলায় বলল, হয় আপনাকে ছেড়ে দেবে না-হয় ও-শালাকে তাড়াবে! এর একটা আদায় করবই!

অমলের মনে পড়ে সাদেকের কথা, আমরা কি কিছুই করতে পারতাম না! সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, সত্যিই কি পারে এই বিরাট শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে!

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে নায়েক রামজীবন বলল, লিজিয়ে অমলবাবু, বৈঠকে থোড়া আরাম কর্ লিজিয়ে, আজ ঔর্ কোই নহি আয়গা!

অমল কোদালটা নামিয়ে রেখে ভাবছে শাবলটা যদি হাবিলদার মেজরের গায়ে লাগত! সমস্ত মনটা তার শিউরে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মবাবকের সেই রক্তাক্ত দেহ! সেই বিস্মিত চোখ আর তার একটুকরো আর্তনাদ! শুধু মবাবক একা নয়, তার চোখের ওপর ভীড় করে এসে দাঁড়ায় এই কোম্পানির মৃত আহত বিকলাঙ্গ ছেলের দল, যারা প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে, যারা একটা-না-একটা অঙ্গ খেসারৎ দিয়ে এদের বহাল তবিয়তে রেখেছে! আরও মনে পড়ে কলকাতার রাস্তায় দেখা গ্রামের নিরীহ মানুষদের কাক-চিলে ঠুকরে খাওয়া শবদেহ! পাঁচকড়ির হাতে গুলি খাওয়া সেই বাব বছরের ছেলেটী! বর্মা-ইভ্যাকুয়ী জীবন্ত মানুষের শবযাত্রা!

ঝোপের আড়ালে খড়খড় শব্দে অমল চমকে ওঠে। লঙ্গরখানার বাচ্চা লাঙ্গরী আরফান একমগ চা আব দুখানা পুরি নিয়ে বেরিয়ে এল। অমলকে বলল, খেয়ে নিন অমলবাবু, আপনার জন্য নিয়ে এলুম!

অমল আরফানেব মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, চেয়ে

চেয়ে তার চোখ জ্বালা করে ওঠে! আবার তার মন সচল হয়ে ওঠে, জয়ন্তকে যেন সে অনুভব করতে পারে তার পাশেই! আরফানের গা স্পর্শ করার জন্য মনটা তার আনচান করে ওঠে। তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলল, ওরা যদি দেখতে পায়?

দেখতে আর তেনাদের হচ্ছে না বাবু! ল্যাজ গুটিয়ে তেনারা আফিসঘরে ঢুকে বসে আছেন! এই কথাকয়টা বলার মধ্যে তার কত গর্ব! অমল আবার ভাবে, এত জোর এই আরফানইবা পেল কোথা থেকে!

এগারটার সময় আবার কোদাল ঘাড়ে করে অমল কোয়ার্টার-গার্ডের দিকে চলতে থাকে। হাবিলদার সরকার অমলকে আড়ালে ডেকে বলল, আপনি বারণ করে দিন অমলবাবু! আপনার কথা ওরা শুনবে।

অমল ভাবে, শুনবে কি! বোধহয় নয়। সে অধিকার সে হারিয়ে ফেলেছে। সে ভেবেছিল তার কারাবরণের মধ্যে দিয়ে কোম্পানিতে আসবে মংগল! এতগুলো মানুষের শক্তির ওপর সে ভরসা রাখতে পারে নি। চোখের ওপর ভেসে ওঠে হতাশ সেই ছেলেদের ধীরে ধীরে ব্যারাকে ফিরে যাওয়া! অনুতাপে তার বুক মুচড়ে দুমড়ে যায়!

বেলা পাঁচটায় ফেটীগ শেষ করে কোয়ার্টার-গার্ডের মধ্যে ঢুকতেই স্পেয়ার সেণ্ট্রী দুজন দৌড়ে অমলের কাছে এসে বলল, শুনছেন, আজকে থ্রি-থার্টি-ডাউনে হাবিলদার-মেজর সাহেব ছুটিতে যাচ্ছেন!

অপরজন বলে ওঠে, সত্যি অমলবাবু আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম!

প্রথমটী আবার বলল, জানেন অমলবাবু, ছুটি না আরো কিছু! শালা কেটে পড়ছে! বুঝলেন না, শালারা ভাঙবে তবু মচকাবে না!

অমলের কানে বেজে ওঠে সাদেকের ভর্ৎসনা, আমরা কি কিছুই করতে পারতাম না!

সেদিনকার রেডিয়োর খবর, রেড-আর্মি বার্লিন থেকে আর বত্রিশ-মাইল! কুড়িদিনে রেড-আর্মি ওয়ারশ থেকে ওডের নদীর তীরে এসে পৌঁচেছে! বৃটীশ আর আমেরিকানরা জার্মানীকে পশ্চিমদিক থেকে ঘিরে ফেলছে! ইতালিতে সেভেনথ-আর্মি মিলানের কাছে এসে পৌঁচেছে! উত্তর ইতালিতে ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, মুসোলিনী বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে নিহত হয়েছেন! ওকিনাওয়ার

অবতরণ করার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় আমেরিকান সৈন্য প্রবল লড়াই চালাচ্ছে! তিনদিনের যুদ্ধে ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন মান্দালয় দখল করেছে!

খবর বলা শেষ হল। পাঁচকড়ি, খগেন আর অনন্তর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমরাও যেন রেড-আর্মির মত এগিয়ে চলেছি, না রে?

অনন্ত বলল, সে আবার কিরে!

কেন! প্যারেড কমিয়েছি, হাবিলদার-মেজরকে তাড়িয়েছি, এইবার মেজর নেলসনকে ঘায়েল করতে পারলেই সমস্ত জুলুমের শেষ!

সতের

রাত তখন বারটা কি একটা! ক্যাম্প নিশুতি হয়ে ঘুমোচ্ছে। কেবল নাইট-পিকেট ডাণ্ডা-হাতে ক্যাম্পের রাস্তায় টহল দিচ্ছে। কৃষ্ণ-পক্ষের কালো রাত, অন্ধকারে সবকিছুই একাকার হয়ে গেছে কেবল ক্যাম্পের ধারে নালাটার ওপর জোনাকির ঢেউ বহে চলেছে।

হঠাৎ একসাথে দুটো ডব্লিউ-ডি ইঞ্জিনের হুইসিল বেজে উঠল। বেজে চলেছে একটানা! কয়েকমুহূর্ত পরেই অনেকগুলো পটকা ফাটার শব্দ! লম্বা একটা ফিতের মত! ফগ-সিগ্ন্যালের শব্দ!

ব্যারাকে ব্যারাকে ছেলেরা উঠে পড়েছে। প্রথমটা ঘাবড়ে যায় বিপদের সংকেত মনে করে। কিন্তু বেখাপ্পাভাবে এতগুলো ফগ-সিগন্যাল্ ফাটার শব্দে মনে হয়েছে, এতো বিপদের সংকেত নয়। পাঁচকড়ি বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, শব্দটা মেইন-ইয়ার্ড থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে!

খগেন বলল, নিশ্চয়ই ওই আমেরিকানগুলোর কীর্তি।

অনন্ত বলল, তাহলে জার্মানি সারেণ্ডার করল নাকি!

পাঁচকড়ি লাফিয়ে ওঠে, ঠিক বলেছিস, নিশ্চয়ই তাই! দাঁড়া আমি অফিস থেকে খবর নিয়ে আসছি—মশারীর মধ্যে থেকে বেরিয়ে, শুধু লুঙ্গিটা পরেই ব্যারাক থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অফিসের সামনে রীতিমত ভীড় জমে গেছে। পাঁচকড়ি আর খগেন অফিসের মধ্যে ঢুকে মেইন-ষ্টেশনে ফোন করছে। খবর পৌঁচেছে ব্যারাকে ব্যারাকে! সমস্ত ক্যাম্পটাই উঠেছে জেগে! দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে

পড়েছে! যে যে-পোষাকে শুয়েছিল সেই অবস্থাতেই দল পাকিয়ে হুট্ট-গোল করতে করতে অফিসের সামনে গিয়ে জড় হচ্ছে!

হাবিলদার সরকার ছেলেদের উদ্দেশ করে বলল, তা বলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে পড়েছ! আনন্দ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া বাঁধিয়ে বস না—হাবিলদার সরকার হাবিলদার-মেজরের কাজ করছে! হাবিলদার-মেজর মুখার্জি ছুটি থেকে আর ফেরেননি!

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, আর হাবিলদার সাহেব, এবার যদি ম্যালেরিয়া হয় তাহলেতো বাড়ীতেই চিকিৎসা করাব! আপনাদের আর কষ্ট করে মেপাক্রীণ খাওয়াতে হবে না!

আর একজন বলল, জার্মানি সারেন্ডার করলেই বুঝি বাড়ীতে ফিরতে পারবে মনে করেছ! এখনও শালা জাপানীরা বাকী আছে!

হ্যাঃ জাপানীরা আবার লড়বে! রেড্-আর্মি যদি একবার ঠেলা দেয় তাহলেই শালারা কুপোকাৎ!

পাঁচকড়ি আর খগেন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলল, জার্মানি সারেন্ডার করেছে!

সমবেত ছেলেরা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, হিপ্-হিপ্-হুর্-রে—

সমস্ত ক্যাম্পময় তারা ছোটাছুটি সুরু করে দিয়েছে! পাগলের মত বকবক করছে! যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে! যেখানেই জনকয়েক ছেলে জড় হয়েছে সেইখানেই তারা একই সঙ্গে প্রলাপ বকে চলেছে! এইবার তারা বাড়ী ফিরবে! এইবার তাদের মুক্তি!

একনম্বর ব্যারাকে ঢুকে হাবিলদার সরকার বলল, আচ্ছা, এইবার তোমরা শুয়ে পড়, রাত জেগে আর লাভ কি!

একজন বলে উঠলু, বলেন কি হাবিলদার সাহেব! রাত জাগা কি বলছেন! এখন যদি আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন তাও পারি। ভাবতে পারছেন এই নরক থেকে মুক্তি পাব! ওঃ জীবনে এত বড় পাপ বোধ-হয় আর কখনও করিনি, যা করেছি এই মিলিটারীতে ঢুকে! ছেলেটী গুম্ হয়ে যায়, চোখ ফেটে তার জল আসে!

ব্যারাকের মাঝখান থেকে একজন দাবি জানায়, কাল আমাদের ছুটী

চাই! আজ আমরা সারারাত হৈহৈ করব!

অনেকে সমর্থন জানায়, ঠিক, কাল পি-টি, প্যারেড কিচ্ছু নয়!

হাবিলদার সরকার বলল, ছুটী দেওয়ার মালিক আমিতো নই-ই এমন কি সুবেদার সাহেবও পারেন না। কাল সকালে ও-সি এলে জিজ্ঞেস করে ছুটীর বন্দোবস্ত করা যাবে।

একজন বলল, কাল সকালে কেন, এখনই জিজ্ঞেস করে আসা যায়।

হাবিলদার সরকার বলল, দূর, তা কখনো করা যায়!

কেন যাবে না? গিয়ে দেখবেন, সে শালারা মদ গিলে আর নার্স নিয়ে নাচানাচি সুরু করেছে!

হাবিলদার সরকার যেন একটু ফাঁপরে পড়ে যায়। আমতাআমতা করে বলল, কিন্তু এত রাত্তিরে যাওয়া ঠিক হবে কি?

আলবৎ ঠিক হবে। আমরাতো আর ওদের নার্সগুলোর ওপর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। জার্মানি সারেণ্ডার করেছে, আমরা ছুটী চাই! ভাবুনতো দেখি একবার ইউরোপের কথা! সেখানকার মানুষগুলো এখন কি করছে!

জার্মানির সারেণ্ডার উপলক্ষে কোম্পানির পুরো ছুটী, তদুপরি বড়-খানা। সন্ধ্যেবেলায় ক্যানটিনে উৎসব, মেজর সাহেবের বক্তৃতা আর বিনামূল্যে রম্ বিতরণ। সকাল থেকে চলেছে বড়-খানা'র মহড়া। সমস্ত কোম্পানিটা আনন্দে আত্মহারা। শুধু একটি কথা বারবার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, এইবার তারা বাড়ী ফিরবে! বাড়ী বলতে তাদের মনে সুখী একটি সংসারের ছবি ভেসে ওঠেনি। তারা জানে লড়াই থেকে ফিরে আবার তাদের সেই বেকারদশা, সেই অভাব অনাটন! তবুও চেয়েছে বাড়ী ফিরতে, সৈনিক নামে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে!

সন্ধ্যে থেকে ছেলেরা ক্যানটিনে জমা হতে সুরু করে। উদ্যোগী রম্‌পায়ীরা আগেভাগে এসে কাউন্টার দখল করে দাঁড়ায়। মগ, ওয়াটার বটল, সবকিছু নিয়ে একেবারে তৈরী। অল্পে যাদের নেশা জমে না তারা অরসিকদের ভাগটুকু জোগাড়ের তালে ক্যানভাস করে বেড়াচ্ছে। এন-সি-ও'রা ব্যারাকে ব্যারাকে ঘুরে ছেলেদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে

ক্যানটিনে।

অফিসাররা সকলেই এসেছেন, সঙ্গে তাঁদের মাথাপিছু একজন করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স। অনেকদিন পরে অতগুলো মেয়েকে এত কাছাকাছি দেখে ছেলেদের মন চনমনে হয়ে ওঠে। সান্নিধ্য আরও একটু ঘনিষ্ঠতর করে নেওয়ার জন্য ছেলেরা আরও একটু কাছে এগিয়ে যায়।

মেজর সাহেব বলতে সুরু করেন, আর একবছর আগে এমনই একটা দিনে আমরা এখানে জমায়েৎ হয়েছিলাম. সেদিন আর আজকের মধ্যে কত তফাৎ! সেদিন আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। আর আজ, আমরা দুটো ফ্যাসিস্ট শক্তিকে খতম করেছি. ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়েছে! কিন্তু, আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি. এখনও জাপানীরা লড়ছে। যতক্ষণ জাপানীদের একজনের হাতে অস্ত্র থাকবে ততক্ষণ আমাদের বিরাম নেই!

পাঁচজন নার্স খিলখিল করে হেসে উঠে হাততালি দিতে থাকে। অফিসাররাও সেই হাসি আর হাততালিতে যোগ দেন। ছেলেরা নির্নি-মেষ নয়নে চেয়ে থাকে নার্সদের টোল-খাওয়া গালের দিকে!

মেজর সাহেব একটু থেমে ঘোষণা করেন. আর দুমিনিটের মধ্যেই তোমরা প্রিমিয়ার চার্চিলের ঘোষণা শুনতে পাবে।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে ছেলেরা কান খাড়া করে থাকে। ব্রডকাষ্ট সুরু হল বি-বি-সি থেকে. গতকাল সকাল ২-৪২ মিনিটে জার্মানি বিনাসর্তে মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

মেজর সাহেব শিষ দিয়ে 'গড্ সেভ্ দি কিং' গেয়ে উঠলেন! সঙ্গে সঙ্গে বাকী অফিসার আর নার্সেরা নাচের ভঙ্গিতে কাউণ্টারের প্ল্যাট-ফরমে ঘুরতে থাকেন। নার্সদের জামার ওপর দিয়ে নারীদেহের লীলায়িত ভঙ্গি ছেলেদের মন লুব্ধ লোভার্ত করে তোলে।

কিছুক্ষণ পরে রম্ বিতরণ সুরু হল। ছেলেরা লাইন দিয়ে মগ হাতে কাউণ্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মেজর সাহেব মেজার-গ্লাসে ঢেলে তাঁর নার্সটির হাতে দেন আর নার্সটি হেসে করমর্দন করে ছেলেদের মগে ঢেলে দেয়। মেমসাহেবের হাসিমুখ আর করমর্দনের লোভে উৎসাহির সংখ্যা বেড়ে যায়। মেজর সাহেব খোসমেজাজে ছেলেদের

ডাকাডাকি পিড়াপিড়ি সুরু করে দেন।

ক্যানটীনের ভীড় পাতলা হয়ে আসে। এককোণে জনকয়েক ছেলে চুপচাপ বসে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মেজর সাহেব একজনকে ডেকে বললেন, তুমারা মগ কিধর?

ছেলেটি বলল, হম্ সরাপ্ নহি পিতা সাব্!

মেজর সাহেব বললেন, কোই ডর নহি, পি লেও!

ছেলেটি করুণ আবেদন জানাল, মুঝকো মাফ কিজিযে সাব!

মেজর সাহেব তাঁর সঙ্গিণীর দিকে মুচকে হেসে আবার ছেলেটিকে বললেন, আচ্ছা, একঠো মগ লিয়াও মেমসাহেবকে ওয়াস্তে—একচোখ বুজে মেমসাহেবকে বললেন, হোয়াট ডু ইউ সে ডারলিং!

মেমসাহেব খুকখুক করে হেসে বলল, মেক হিম ড্রিঙ্ক ডিয়ার। ইট উইল বি এ রিয়াল ফান্!

ছেলেটি একটি মগ এনে কাউণ্টারের ওপর রাখল। মেজর সাহেব তাঁর সঙ্গিণীকে বললেন, গিভ দি বাগার ডবল-ডোজ্ ডারলিং!

চারআউন্স রম্ মেমসাহেব মগে ঢেলে দিল, মেজর সাহেব মগটা ছেলেটির দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, পিযো!

ছেলেটি বলল, হম্ নহি পিয়েগা সাব!

মেজর সাহেবের মুখ রাঙা হয়ে উঠছে, তবুও হাসবার চেষ্টা করে বললেন, হামারা হুকুম্ মানো।

নহি সাব!

ক্যা? মেজর সাহেব ফেটে পড়লেন। সুবেদার নন্দীকে বললেন, টেক হিম টু গার্ড-রুম নন্দী!

সুবেদার সাহেব যেন একটু ইতস্তত করেন, কি যেন একটা তিনি বলতে চেষ্টা করেন। মেজর সাহেব বললেন, এ্যান্ড পুট হিম্ অপ বিফোর মি টু-মরো।

তাঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্যানটীনে আর একটিও লোক নেই, কেবল অফিসার আর নার্সেরা কাউণ্টারের ওপর বসে আছেন আর জ্বলছে বেবি-পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলজ্বল করে।

ছেলেরা যখন খেতে বসেছে তখন অফিসার আর নার্সেরা খাওয়া পরিদর্শন করতে আসেন। মেসটীন সামনে নিয়ে, উবু হয়ে বসে ছেলেরা খাচ্ছে। মেজর সাহেব জিজ্ঞেস করেন, খানা কৈসা হ্যায ?

যাকে জিজ্ঞেস করা হয় সে আশপাশ দেখে নিয়ে বারকয়েক ঢোঁক গিলে মাথা নামিয়ে বলে, বহুৎ আচ্ছা সাব্।

মেজর সাহেব এগিয়ে গেলে ছেলেটি তার পাশের জনকে তেড়ে ওঠে, ওঃ, দরদ উথলে উঠল! আজ বড়-খানা কিনা তাই মেমসাহেবদের দেখাতে এনেছেন। অন্যদিন যে ধান আর কাঁকর মেশান ভাত আর ডালের জলে চোখের জল মেখে খাই তখনতো শালারা দেখতে আসে না!

রোল-কলের সময় পাঁচকড়ি খগেন অমল প্রভৃতি বারজনের নাম ডেকে বলা হল তারা যেন ফুল-ইউনিফর্মে রাত সাড়ে-ন'টার সময়ে অফিসার্স-বাঙলোয় রিপোর্ট করে।

ব্যারাকে ফিরে পাঁচকড়ি রীতিমত চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছে, শালাদের কি এমন পাকা ধানে মই দিয়েছি যে কথায় কথায় আমাদের এই ক'জনকে ধরে টানাটানি করে!

খগেন বলল, শুধু শুধু ক্ষেপছিস কেন পেঁচো! ভিক্ট্রী-ডে'তে শুধু মেমের হাত থেকে মদই নিয়েছিস নাচতো আর দেখিসনি! সুবেদার সাহেব আমাদের একটু বেশী ভালবাসেন কিনা তাই শুধু আমাদের জন্য এই স্পেশ্যাল-বন্দোবস্তটা করেছেন!

অনন্ত বলল, বুঝলি না ব্যাপারটা! রমের টোপে একটাতো শীকার হয়েছে, এইবার মেমসাহেবের টোপে যদি একআধটা রুই-কাতলা ওঠে!

ডাণ্ডা ঘাড়ে করে ওরা বাঙলোয় এসে পেঁছলে লেফটেনাণ্ট কর্নেল ওদের পোষ্ট দেখিয়ে দিয়ে ডিউটী বাতলে দিলেন। সারারাত ধরে অফিসাররা ফুর্তি করবেন, বলনাচ খানাপিনা হবে আর ছেলেরা বাঙলোর চারকোণে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে।

খগেন আর পাঁচকড়ি ভেতরে দাঁড়াল, অনন্ত আর সাদেক বাইরে। খগেন ডাণ্ডাটাকে সোলডার-আর্ম করে নিয়ে টহল দিতে দিতে পাঁচকড়ির কাছে গিয়ে বলল, শালারা কি মদটাই গিলছে মাইরী!

পাঁচকড়ি বলল, আর ছুঁড়িগুলোওতো কম যায় না!

একটু পরে খগেন আবার পাঁচকড়ির কাছে এসে বলে, শালাদের নাচতো কত! কেবল দেখ জড়াজড়ি আর কামড়াকামড়ি করছে!

পাঁচকড়ি বলল, ওইই তো ওদের নাচ, কেবল গা গরম করা!

আবার ওরা টহল দিতে থাকে! স্পেয়াররা কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মেরে, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে। মেইন-ইয়ার্ড থেকে মাঝে মাঝে পাইলটের হুইসিল আর ওয়াগন ঠোকাঠুকির শব্দ ভেসে আসছে। খগেন বাঙলোর কোণ থেকে সরে গিয়ে অন্ধকারেব আড়ালে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ পাঁচকড়ির ধাক্কায় আঁতকে উঠে বলল, ওঃ, কি ভয়টাই না পেয়ে গিয়েছিলাম!

পাঁচকড়ি বলল, এদিকে আয়! একটা ছুঁড়ি টলতে টলতে এসে ওই গাছতলায় শুয়ে পড়েছে, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে!

তা দেখনা তুই!

না ভাই, আমি পারব না। মাতাল হয়ে আছে, যদি জড়িয়ে ধবে!

তাহলে তো তোরই লাভ!

নাঃ, সে প্রবৃত্তি মরে গেছে!

দুজনে একসঙ্গে মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘবেব মধ্যে থেকে কিছুটা আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। মেয়েটি একেবাবে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে। খগেন বলল, ওই টীনের ঘরে বি-টি-কুক ল্যাজাব থাকে, ওকে ডেকে দে, জলটল দেওয়াব দরকাব হলে সে-ই দিতে পারবে।

পাঁচকড়ি ল্যাজারকে ডেকে নিয়ে এল। চোখ মুছতে মুছতে ল্যাজাব উঠে এসে মেয়েটির স্তিমিত দেহের ওপর ঝুঁকে পড়ল, চোখের পাতা টেনে দেখে তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। মেয়েটি ল্যাজাবেব গলাটা আঁকড়ে ধরে গোঙিয়ে ওঠে, মাই ডার্লিং—মাই ডার্লিং—অনর্গল সে চুমো খেয়ে চলল ল্যাজারকে।

বারান্দার ওপর হুড়মুড় কবে জুতোর শব্দ হল। চমকে ওরা পেছন ফিরে দেখে লেফটেনান্ট কর্নেল একটি মেমকে টানতে টানতে নিজের ঘবে নিয়ে যাচ্ছে! পাঁচকড়ি খগেনকে বলল, যা তোর পোষ্টে গিয়ে দাঁড়াগে যা, আর ঘুমোসনি যেন।

খগেন আর পাঁচকড়ি আবার নিজের নিজের পোষ্টে গিয়ে দাঁড়িযে

পড়ে। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ শুনে খগেন চমকে ওঠে! চোখ কুঁচকে দেখে ল্যাজার দরজায় ছিটকানি লাগিয়ে দিয়েছে। হনহন করে সে পাঁচকড়ির কাছে গিয়ে বলল, কি রে দরজা বন্ধ করে দিলে যে!

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে উঠল, তাতে তোর কি? যা, নিজের জায়গায় যা!

খগেন চলে গেল।

পাঁচকড়ি আপন মনে বিড়বিড় করে ওঠে, যত্তো শালা জানোয়ার!

আঠারে

জাপানের অন্তিমদশা ঘনিয়ে এসেছে। ওকিনাওয়া আমেরিকানরা দখল করেছে। লাল-ফৌজ দুর্দাম বেগে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে প্যাসিফিকের তটে, জাপানীরা কোথাও সামান্য একটু বাধা দিতে পারছে না। ফিফথ-ইন্ডিয়ান-ডিভিসন বর্মি-প্রতিরোধ-বাহিনীর সহযোগীতায় রেঙ্গুন দখল করেছে।

মণিপুর রেল-হেড'এর ওপর থেকে কাজের চাপ একেবারেই কমে গেছে। ওয়েষ্ট-ইয়ার্ডের সাতখানা লাইন প্রায়ই খালি পড়ে থাকে। সাইডিং-লাইনগুলো ঘাসে ঢেকে যাচ্ছে। কোম্পানির জীবন যেন প্রথম দিককার দিনগুলোতে ফিরে এসেছে! মিলিটারী ট্রেণিং আবার গোড়া থেকে সুরু হয়েছে!

ইতিমধ্যে নতুন খবর, কোম্পানি কোহিমা যাবে বিশ্রামের জন্য। ঠিক হয়েছে, তিনটি ব্যাচে কোম্পানিকে ভাগ করে এক-একটি ব্যাচকে এক-মাস করে কোহিমায় রেষ্ট দেওয়া হবে। কোহিমা যাওয়ার নামে ছেলেরা স্বাভাবিকভাবেই খুশী হয়েছে। কোহিমাযুদ্ধের দিনগুলোর ওপর ছেলেদের মনে জেগে আছে অপার মমতা, এত স্বাধীনতা তারা মিলিটারী জীবনে আর কখনো পায়নি! খগেন বলল, যেতেতো খুবই ইচ্ছে করছে কিন্তু ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না! নতুন কোন ফন্দি আঁটল নাকি?

পাঁচকড়ি বলল, আমারতো তাই মনে হচ্ছে। না-হলে মেজর নেলসনের প্রাণ কেঁদে উঠল আমাদের রেষ্টের জন্য!

স্বরাজ কোথা থেকে ঘুরে এসে বলল, আসল ব্যাপারটা শুনে এলুম। কোহিমায় যাওয়া মেজর সাহেবের মর্জি নয়, ওপরওয়ালাদের হুকুম।

কিন্তু সুবেদার সাহেব এই মৌকায় এক মতলব ফেঁদেছেন!

পাঁচকড়ি বলল, কিসের মতলব?

আর কিসের—দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বরাজ বলতে সুরু করে, আমাদের কোতল করার! এই মৌকায় এরা সমস্ত দলগুলোকে ভেঙে দেবে। এক একটা দলের কিছু পাঠাবে কোহিমায় আর কিছু রাখবে এখানে! তারপর দুদিক থেকে বল্টু টাইট দিতে থাকবে!

পরদিন ভোর থেকে ফেটীগ সুরু হল। একজন বি-ও-আর এসে সুবেদার সাহেবের কাছে দুজন লোক চাইল সার্জেণ্ট-মেজরের মাল ট্রাকে তোলার জন্য। সুবেদার সাহেব দুজন ছেলেকে ডেকে হুকুম দিলেন। ক্ষণেক ইতস্তত করে ছেলেটি বলল, আমরা বি-ও-আর'দের মাল তুলব না!

সুবেদার সাহেব ফেটে পড়লেন, হোয়াট! জলদি যাও!

একজন মরিয়া হয়ে বলল, বেশ, আমরা সার্জেণ্ট-মেজরের মাল তুলে দিয়ে আসতে পারি, যদি একজন বি-ও-আর এসে আমাদের হাবিলদার-মেজরের মাল তুলে দেয়! র‍্যাঙ্কেতো দুজনেই সমান! আপনি কেন বি-ও-আর'দের মাল তোলার হুকুম দেবেন! ওরা কি আপনাকে স্যালিউট করে?

মুহূর্তে সুবেদার নন্দীর মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। মনের অতি গোপন এক ক্ষতস্থানে যেন খোঁচা লাগে। বি-ও-আর! কলকাতার ইণ্টালি বস্তি, বড়জোর বিপন লেনের ট্যাঁশ, তারাও নাকি রাজার জাত! আইন মোতাবিক একজন বি-ও-আর একজন ভি-সি-ও'র নীচে। কিন্তু রাজার জাত বলে উপযুক্ত পদে উপযুক্ত মর্যাদা দানের নিয়মানুবর্তিতা-টুকু পালন করাও এদের প্রয়োজন হয় না! বি-ও-আর'দের এই বর্ণা-ভিমানকে 'বিদ্রোহী বাঙালী' মেজর রায় থেকে সুরু করে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেজর ব্রাউন আর খাস-বিলেতি মেজর নেলসন পর্যন্ত সকলেই মেনে নিয়েছেন। ক্ষমতার নেশায় মাতাল সুবেদার নন্দী অফিসারদের এতভাবে খুশী করেও বি-ও-আর'দের সমপর্যায়ে উঠতে পারেননি। স্যাপার বি-ও-আর'এর কাছ থেকে ন্যায্য প্রাপ্য একটা স্যালিউট কোন-দিনই পাননি! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ায় সুবেদার নন্দী অধীর হয়ে বি-ও-আর'টিকে খেঁকিয়ে ওঠেন, লেট দি বি-ও-আরস লুক

আফটার দেয়ার ওন বিজনেস!

মুচকে হেসে বি-ও-আর'টি চলে যায়। অপর ছেলেটি বলে ওঠে, একটি ঘুষিতে শালাদের ওই হাসি চিরদিনের মত মুছে দিতে হয়! সুবেদার সাহেব সবই শোনেন কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার মহান দায়ীত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছেলেটিকে স্তব্ধ করে দেন না!

গাড়ীতে ওঠার আগে আরও একদফা ফল-ইন করতে হয়। মেজর সাহেব ভাষণ দেন, তোমাদের এই যাত্রার পূর্বে একটা সুসংবাদ দিতে এসেছি। আশা করি এই সুসংবাদ তোমাদের যাত্রাকে আরও আনন্দময় করে তুলবে। জাপান সন্ধির সর্ত দাখিল করেছে। মিত্রশক্তি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন সর্তে তাঁরা রাজি হবেন না। মিত্রপক্ষীয় কর্তৃপক্ষমহল আশা করছেন আর আট-চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করবে। আর আমিও আশা করছি এই সপ্তাহের মধ্যেই খবরটি তোমাদের দিয়ে আসতে পারব।

লাইনের মধ্যে থেকে একটি ছেলে ফিসফিস করে বলে ওঠে, দোহাই বাবা, আবার যেন ট্যাঁকে করে মেমসাহেব নিয়ে যেও না!

কনভয় যাত্রা সুরু করল। মেজর নেলসন টুপি নেড়ে বিদায় অভি-নন্দন জানালেন। বি-ও-আর'রা টুপি খুলে প্রত্যাভিবাদন জানাল। আর ভারতীয়েরা ভাবতে থাকে, তারা কি করবে!

রবীন বলে ওঠে, দে শালাকে বুটশুদ্ধ লাথি দেখিয়ে!

ডিমাপুর বাজার ছেড়ে ষ্টেশনের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে কনভয় এসে পড়ে মণিপুর রোডে। কনভয়ের পাইলট হয়েছে বি-ও-আর'দের গাড়ীখানা। তারা গান ধরেছে। সুনীল বলল, আয়, আমরাও গান ধরি।

খগেন খেঁকিয়ে ওঠে, থাক আর গানে কাজ নেই, ঢের হয়েছে!

সুনীল বলল, কেন বাপু খামখা চটাচটি করছিস! আর কটাদিন মুখ বুজে কাটিয়ে দে না!

নীচুগার্ড পার হয়ে কনভয় পাহাড়ে উঠতে থাকে। খানিকটা সোজা উঠে বাঁক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে এ ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে যায়। খগেন গজগজ করতে থাকে, আমাদের পেয়েছে যেন ময়দার

বস্তা! একটা ট্রাকে গেদেছে বাইশজন করে আর ওই শালা বি-ও-আর'রা আটজন উঠেছে একটা ট্রাকে!

অনন্ত বলল, তা উঠবে না, বিশ্রামতো ওদেরই দরকার, ভীষণ লড়াই করেছে কিনা! শালারা একেবারে অপদার্থ! বাগিয়ে যদি একটা ঘা দেওয়া যায় তাহলে ওদের কাৎ করতে বোধহয় কয়েকঘণ্টাও লাগে না!

সুনীল বলল, কিন্তু এমন মজা, ওরাই আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ছে।

ঝাড়বে না! কাজ ফুরিয়েছে যে! এইবার তাড়াবার তাল!

ঘাসপানি পার হয়ে পিফিমায় পেঁাছে কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে বি-ও-আর'রা রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। খগেন বলল, চলরে, নেমে একটু পেচ্ছাব সেরে নিই।

সুনীল বলল, নামার কিন্তু হুকুম হয়নি খগেন!

খগেন বলল, বি-ও-আর'দের যদি হুকুম না লাগে তাহলে আমাদেরও ল্যাগবে না।

হুড়মুড় করে ট্রাকশুদ্ধ ছেলে নেমে পড়ল। হাবিলদার সরকার দৌড়ে এসে রাগতস্বরে বলল, তোমরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছ! আমার ভালমানষির সুযোগ নিচ্ছ!

অমল টপ করে বলে ওঠে, কি রকম?

হাবিলদার সরকার বলল, গাড়ি থেকে আপনারা নামলেন কেন?

অমল বলল, বি-ও-আর'দের কি আপনি নামবার হুকুম দিয়েছেন?

ওদের কথা আলাদা!

তাহলে এখন থেকে আমাদেরও আলাদাভাবে দেখতে হবে।

রবীন বলে ওঠে, যে হাবিলদারী বি-ও-আর'দের কাছে খাটে না, সে হাবিলদারী আর কেন আমাদের ওপর ফলাচ্ছেন! কোন রকমে আর কটা দিন ওই ফিতে তিনটে বজায় করে যান, ব্যাস!

হাবিলদার সরকার কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে, বয়রকযেক সকলের মুখের দিকে দেখে ধীরে ধীরে চলে যায়। খগেন বলল, এর মধ্যে তবুও কিছুটা মনুষ্যত্ব আছে! একেবারে জাত-কুকুর হয়ে যায়নি।

জুবজা জাপানীদের শেষ আক্রমণস্থল, যুদ্ধের চিহ্ন তখনও রয়েছে চতুর্দিকে। টিনের সমস্ত বাড়ী, তার দেয়ালে অসংখ্য বুলেটের ছিদ্র।

জুবজা ছাড়িয়ে কনভয় কোহিমার দিকে উঠতে থাকে। সবকটা ট্রাকের ফার্স্টগীয়ারের গোঁ গোঁ শব্দ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। কনভয় চলেছে একরাশ মেঘের মধ্যে দিয়ে হেডলাইট জেবলে। চোখে মুখে ভিজে হাওয়ার ঝাপটা লাগে, জামাকাপড় স্যাঁতসেঁতে হয়ে ওঠে। মণিপুর রোড ছেড়ে কনভয় কোহিমার রাস্তায় ঢোকে, চারহাজার দু'শ-ফিট ওপরে নাগা পাহাড়ের প্রধান সহর কোহিমা। যেদিকে চোখ পড়ে সেইদিকেই অসংখ্য লাল রঙের টীনের বাড়ী পাহাড়ের ঢালুর বুকে লেগে রয়েছে। আর তারই পাশে সিঁড়ির মত খাঁজ কাটা জমিতে ফলেছে ধান, সোনালি সবুজের হোলি লেগে গেছে পাহাড়ের বুকে।

খগেন বলে ওঠে, এমন জায়গায় কি করে যে এতবড় যুদ্ধটা হল, ভেবেই পাচ্ছি না!

সুনীল দূরে আঙ্গুল তুলে দেখায়, দেখ দেখ অত বড় বড় গাছ-গুলোর ডালপালা সব গেল কোথায়!

বাজার পার হয়ে কনভয় চলল কোহিমার সহর এলেকা ছেড়ে আরও ভেতরের দিকে। রাস্তা দিয়ে চলেছে নাগা মেয়েপুরুষের দল। মেয়েদের কপালের ওপর দিয়ে পিঠে ঝোলান টুকরি আর মায়েদের বুকের মধ্যে বাঁধা স্তন্যপানরত শিশু। মেয়েপুরুষ সকলেরই গায়ে নানান জাতের মিলিটারী জামা—ব্যাটল-ড্রেস-ব্লাউস থেকে টিউনিক-কোট পর্যন্ত। বেশীর ভাগ পুরুষদের কাঁধে বন্দুক! মনে হয় যেন গাদা-বন্দুক!

কনভয় এসে দাঁড়ায় একটা পাহাড়ের তলায়। সেখান থেকে একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের বুক বেয়ে উঠে গেছে। যেখানটায় এসে ছেলেরা থামে সেখানে এর আগেও ক্যাম্প ছিল, তার নিদর্শন রয়েছে একমানুষ সমান উঁচু গাঁদাগাছের সরল লাইন। বোঁচকাবুঁচকি নামিয়ে ছেলেরা যখন চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তখন অকস্মাৎ তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে, সেই মানুষগুলো যারা একদিন এখানে ফুলের গাছ লাগিয়েছিল তারা কি আজও বেঁচে আছে!

সারাদিন ধরে চলে ফেটীগ। লঙ্গরখানা থেকে সুরু করে পায়খানা পর্যন্ত সবই নতুন করে তৈরী করতে হয়। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে

ক্লান্তিতে শরীর ভারী হয়ে উঠেছে। খাওয়া শেষ করে ছোট ছোট দলে তাঁবুর সামনে বসে গল্প করছে—সেইদিনকার অভিযানের রোমন্থন!

খগেন একজন হাফ-প্যাণ্ট-পরা লোক সঙ্গে করে তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে ভাল করে ঠাহর করতে না পেরে সুনীল বলে ওঠে, কে রে, এখনও হাফ-প্যাণ্ট পরে আছিস! মরবার পাখা উঠেছে নাকি?

খগেন বলল, ভয় নেই, ইনি আমাদের মত তাঁবেদার নন, রীতিমত একজন সিভিলিয়ান! তারপর সুরু করে লোকটির পরিচয় দিতে। লোকটি একজন বাঙালী, কতকাল আগে যে নাগাপাহাড়ে এসেছে তা সে নিজেই বলতে পারে না। একটি নাগা মেয়েকে বিয়ে করে এখন সে রীতিমত নাগা বনে গেছে। কোহিমা রিইন্‌ফোর্সমেণ্ট-ক্যাম্পে জল সরবরাহ করার জন্য একটা ওভারহেড-ট্যাঙ্ক বসিয়ে পাহাড়ের বুক থেকে পাম্প করে জল তোলা হত, এই লোকটি ছিল সেই পাম্প-ড্রাইভার। জাপানীরা যখন কোহিমা আক্রমণ করে তখন সে ছিল এখানেই। তারপর জাপানীরা যখন পেছু হঠে যায় তখন জলের ট্যাঙ্কটা তারা মেসিন-গান করে উড়িয়ে দেয় আর এর ওপর অন্তত দশরাউণ্ড গুলি করে। জঙ্গলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়াতে সে-যাত্রা বেঁচে গেছে।

চাঁদের তলা দিয়ে হাল্কা একটা মেঘ ভেসে যাচ্ছে, তারই ছায়া পড়েছে তাদের ওপর, অপর পাহাড় তখন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। লোকটির কাছ ঘেঁষে সকলে গোল হয়ে বসল। সে বলতে সুরু করল—এই জায়গাটা ছিল রিইনফোর্সমেণ্ট-ক্যাম্প! বিরাট এর এলেকা আর এই ক্যাম্পটা ছিল কোয়ার্টার-গার্ড। এইখানটাতেই জাপানীরা প্রথম আক্রমণ করে। সেদিন—ঠিক রাত বারটার সময়ে ডিউটী বদল হচ্ছে, একজন মাত্র সেন্ট্রীকে খাড়া রেখে গার্ড-কমাণ্ডার আর সকলকে নিয়ে ডিউটী বদল করতে বেরিয়েছে। ওই যে সামনের পাহাড়টা যার তলায় আপনাদের কোয়ার্টার-গার্ড বসেছে ওর পেছনে আছে ঘন জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে জাপানীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোয়ার্টার-গার্ডের ওপর। নিশুতি রাত, ঘুটঘুটে অন্ধকার, লাইট-আউট'এর পর সমস্ত ক্যাম্পটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ গুলি ছুটল। পাহাড়ের বুকে সে গুলির শব্দ একটাই যেন একশটা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! ঘুমন্ত সৈনিকের দল

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে বসে! অন্ধকারে তাদের দিকভুল হয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল কোয়ার্টার-গার্ডের দিকে। কিন্তু তাদেরই কোয়ার্টার-গার্ড থেকে মেশিন-গানের গুলি এসে পড়ছে তাদের ওপর! হতভম্ব হয়ে তারা পালাতে লাগল যে যেদিকে পারে। শূন্য রাইফেল ছুড়ে ফেলে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে থাকে। কত তাদের হোঁচট খেয়ে পড়ে, কত তাদের গুলি লেগে মরে, কত তাদের গাড়িয়ে পড়ে যায় পাহাড়ের অতল খাদে! সেই অবসরে জাপানীরা সমস্ত কোয়ার্টার-গার্ড ঘিরে ফেলে, যাকে সামনে পায় তাকেই গুলি করে। বন্দী ওরা বড় একটা কাকেও করে না! যারা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে গেছে তাদের বুকে সোজা বেয়নেট বসিয়ে দিয়েছে!

লোকটি চুপ করল। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতায় ছেলেরা চমকে ওঠে। এ ঘটনা ঘটেছিল প্রায় দেড়বছর আগে, তবুও ছেলেরা বারম্বার শিউরে ওঠে। মেঘে ঢাকা চাঁদের আলোয় পাহাড়ের চূড়া ধূসর হয়ে উঠেছে! মনে হয় ওই ধূসরতার অন্তরালে কারা যেন ওৎ পেতে রয়েছে!

রাত ন'টা বেজেছে। সময় সংকেত করার জন্য ফাটা একটা লোহা ঝুলিয়ে রেখেছে কোয়ার্টার-গার্ডে! মরচে-পড়া সেই ভাঙা লোহাটার ডং ডং শব্দ ছেলেদের কানে কেমন যেন রহস্যময় শোনায়। ধীরে ধীরে তারা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। মশারীর সারি ঠেলে পথ করে নিতে নিতে কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠে। মনে হয় তাদের অলক্ষ্যে কারা যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দেড়বছর আগের সেই মেশিনগানের গুলির শব্দ, আহতদের আর্তনাদ, ভয়ার্তের অসহায় চিৎকার সহসা যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে! তাদের অশরীরি আত্মা সারা ক্যাম্পময় ছুটোছুটি করছে!

বিশ্রামের প্রোগ্রাম সুরু হল পরদিন থেকেই! সকালে সাড়েছ'টা থেকে সাড়েসাতটা পি-টি অর্থাৎ পাহাড়ী রাস্তায় একটী ঘন্টা দৌড়ান। আধঘন্টা ব্রেক-অফফের পর রুট-মার্চ বেলা এগারটা পর্যন্ত।

পি-টি থেকে ফিরে ইউনিফর্ম পরতে পরতে খগেন বলে ওঠে, আর কেন বাবা এই পৈতৃক প্রাণটার ওপর এত জবরদস্তি! লড়াইতো শেষ হয়েছে, এইবার ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি!

'পাশের সীট থেকে বলল, তা বললে আর ছাড়ছে কে। পুরোদস্তুর ফিট করে তবে ছাড়বে! সিভিল-লাইফে ফিরে খেটে খেতে হবেতো!

ফিট করার ঠেলায় আবার টি-বি না হয়ে যায়!

তা হয় হোক! তাবলে আপনাকে মজবুত করবে না! এইতো এখন দশমাইল রুট-মার্চ, তারপর আবার নাগরিকবৃত্তির ক্লাস!

খগেন হতবাক হয়ে যায়, নাগরিকবৃত্তির ক্লাস! সেটা আবার কি?

সিভিল-লাইফে কেমনভাবে চলাফেরা করতে হবে, তারই তালিম!

কেন! আমরা কি ভুঁইফোঁড় নাকি! এরা আমাদেব শেখাবে ভদ্র-সমাজে কেমনভাবে চলাফেরা করতে হয়!

আসল কথা কি জানেন, আমাদের ভেড়ুয়া বানাবার মতলব!

যথারীতি প্যারেড ফল-ইন হল। ডিট্যাচমেন্ট ও-সি লেফটেনান্ট কর্নেল একটা নাইট-গাউন পরে ইন্সপেকসন করলেন। হাবিলদার সরকার দিলে মার্চ-অফফের অর্ডার। কাঁচারাস্তা পার হয়ে ওরা বড়-রাস্তায় এসে পড়ে। যতই ওরা এগিয়ে চলেছে রাস্তাটা ততই নির্জন হয়ে উঠছে। পাহাড় কেটে রাস্তা, তার একদিকে উঁচু খাড়াই অপরদিকে গভীর খাদ। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা যায় পাহাড়ের খাদে পড়ে রয়েছে একটা ব্রেনগান-ক্যোরিয়ার! ধীরে ধীরে এমনতর ব্রেনগান-ক্যোরিয়ার আর মোটর-ট্রাকের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। মাইলটাক যাওয়ার পর একটা খোলা জায়গায় এসে হাবিলদার সরকার পাচমিনিটের ব্রেক-অফফ দিল। ছেলেরা বিড়ি সিগারেট ধরিয়ে এদিকওদিক ঘোরাফেরা করতে থাকে পাহাড়ের ঢালুতে নেমে খুঁজতে থাকে যুদ্ধের চিহ্ন।

খগেন একটা নর-কঙ্কাল দেখে লাফিয়ে একপা পেছিয়ে আসে। আরও অনেকে সেখানে জড় হয়।

সুনীল বলল, বলতো, এ কঙ্কালটা জাপানীর না বৃটীশের?

জনকয়েক হুমড়ি খেয়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপামাপি সুরু করে দেয়। একজন গম্ভীরভাবে বলে, মনে হচ্ছে যেন বৃটীশের!

আর একজন বলল, দূর, বৃটীশের হলে কি আর এখানে পড়ে থাকত! নিশ্চয়ই কোন জাপানীর!

রবীন বলে ওঠে, জাপানী হলেতো কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কার্জন

পার্কে এক্সিবিসন করতো ! এ শালা নিশ্চয়ই আমাদের মত হাভাতে!

আবার ফল-ইন করে মার্চ সুরু হয়। ছেলেরা চলেছে নীরব জনশূন্য রাস্তার ওপর দিয়ে। তাদের বুটের আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শতধা হয়ে আবার তাদেরই কাছে ফিরে আসছে। গান ধরার চেষ্টা জন-কয়েক করেছিল কিন্তু কখন যেন তারা নিজেরাই বিমর্ষ হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন একটা ক্যাম্পের চিহ্ন, কোন একটা সেডের ফ্রেম, কোথাও খানিকটা সিমেণ্ট-বাঁধান চত্বর! ছেলেরা চলেছে যেন যমপুরীর মধ্যে দিয়ে, খর রৌদ্রের মধ্যেও গা ছমছম করতে থাকে!

ক্যামেরন-হিলস'এ গিয়ে ওরা থামল—কোহিমার সর্বোচ্চ চূড়া। লড়ায়ের চিহ্ন আজও রয়েছে তার ধূলিকাঁকরের সঙ্গে মিশে। পাহাড়ের মাথায় সমতল ভূমিটুকুর শেষপ্রান্তে একটি স্মৃতিস্তম্ভ—বেঙ্গল স্যাপারস এ্যাণ্ড মাইনার্সের উদ্দেশে। পুরো একটী কোম্পানি এখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্মৃতিফলকের ওপর চোখদুটো স্থির হয়ে যায়।

একটি ছেলে চিৎকার করে ওঠে, এ শালাদের যুদ্ধ কি কেবল মানুষ-মারা-কল নাকি?

অমল অনন্তর একটা হাত চেপে ধরে বলে ওঠে, বলতে পার, এরাও কি মবারকের মতই শুধু শুধু মরেছে?

অনেকগুলি ছেলে অমলের থমথমে মুখখানার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

অমল আবার বলে ওঠে, কেন এরা আমাদের জোর করে টেনে এনে এমন করে খুন করল! আমরাতো এদের কোন ক্ষতি করিনি!

খগেন অমলের কাঁধটা চেপে ধবে বলল, আঃ অমল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!

শূন্য দৃষ্টিতে অমল কিছুক্ষণ খগেনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর মাথাটা ঈষৎ দোলাতে দোলাতে বলল, ঠিকই বলেছ খগেন, এই কথা বলার জন্য আমার বিরুদ্ধে এরা রাজদ্রোহের চার্জ আনতে পারে, না?

দেড়টার সময় আবার হুইসিল। নাগরিকবৃত্তির ক্লাস! ক্লাস নেবেন লেফটেনান্ট কর্নেল স্বয়ং। ঘুম ভেঙে ছেলেরা উঠে বসে, বিরক্তিতে

সমস্ত মনটা বিষিয়ে ওঠে। অনন্ত খেঁকিয়ে ওঠে, শালা কর্নেলি নেবে ক্লাস! যেন সবজান্তা হ্যামিলটনরে! বিদ্যের দৌড়তো এইটথ-ষ্ট্যাণ্ডার্ড, রেলেতে ছিল একটা টি-টি-আই, আর হিটলারের দৌলতে হয়েছে লেফটেনান্ট!

ক্লাস সুরু হল। কর্নেলি সাহেব হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে জুড়ে দিলেন খোসগল্প। নাগা মদের তারিফ করলেন, নাগা মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোভার্ত প্রশংসা করলেন। এও জানালেন, নাগারা ভীষণ হিংস্র, অল্পতেই ক্ষেপে যায়, একটা মানুষকে কেটে ফেলতে ওদের মধ্যে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ জাগে না। আর নাগা মেয়েরা একেবারে জংগলী! হাসবে, কথা কইবে কিন্তু প্রেম বোঝে না! কাজেই নাগা মেয়েদের দিকে না এগুনই বুদ্ধিমানের কাজ!

সুনীল ফিসফিস করে খগেনকে বলল, আর কাল রাতে উনি নিজের তাঁবুতে নাগা মেয়ে আনিয়ে ফুর্তি লুটেছেন!

খানিকটা মদ আব মেয়েমানুষের গল্প করে নিয়ে তারপব সুরু করলেন শিক্ষাব কথা। এইবার তারা মিলিটারী থেকে ছাড়া পাবে। কিন্তু সমস্যা, নাগরিক জীবনে ফিরে গিযে তারা করবে কি? অবশ্য এখনই তারা একেবাবে অকুল পাথাবে পড়ছে না! গভর্ণমেন্ট তাদের হাতে দিয়ে দেবে মোটা মোটা টাকা! ডেফারড্ পে, তাদের পাওনা টাকা আব তার ওপর ছাপ্পান্ন দিনের পুরো মাইনে!

রবীন জিজ্ঞেস কবে, আর চাকরি? ভর্তি করবার সময় যে রিক্রুটীং অফিসার বলেছিল প্রত্যেকের জন্য চাকবি রিজার্ভ রাখা হবে!

কর্নেলি সাহেব বলেন, নিশ্চযই, গভর্ণমেন্ট তাঁর প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। চাকরি সকলকেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু অত চাকরি কোথায়! আর সকলকেইতো একসঙ্গে চাকরি দেওয়া যায় না, সময় একটু লাগবে বৈকি। কাজেই আমাদের ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

অনন্ত জনান্তিকে খগেনকে বলল, অপেক্ষা যে করব, সে কদিন খাব কি! উনিতো খুব মোটা টাকার হিসেব দিলেন কিন্তু পাওনা টাকা সবইতো গেছে ও'দের গর্ভে! ষ্ট্রেড-পে কেটে আর কয়েদ খাটিয়ে জমার

অংক কবে শূন্য করে ছেড়ে দিয়েছেন !

কর্নেলি সাহেব বলতে থাকেন, কাজেই গভর্ণমেন্ট ঠিক করেছেন যারা এর পরও মিলিটারীতে থাকতে চাইবে তাদের স্থায়ীভাবে মিলিটারীতে রাখা হবে।

খগেন বলে ওঠে, কেন স্যার, লড়াইতো থেমে গেল ! আবার মিলিটারী কি হবে !

কর্নেলি সাহেব বলেন, লড়াই করাই সৈনিকের একমাত্র কাজ নয়। দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সবসময়েই সৈনিকের প্রয়োজন। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল তখন আবাব পীস-টাইমের মত কবে সমস্ত ব্যবসাবাণিজ্যকে ঢেলে সাজতে হবে ! অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে ! অনেক বড় কারবারকে গুটিয়ে ছোট করতে হবে। কিন্তু দেশের মধ্যে দুষ্ট লোকের অভাব নেই, তারা গভর্ণমেন্টের সমস্ত প্ল্যান হয়তো বানচাল কবে দিতে চাইবে, ধর্মঘট বাঁধিয়ে উৎপাদন ব্যাহত করবে, নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে অরাজকতাব সৃষ্টি কববে। তখন এই মিলিটারী সমস্ত কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে।

অমল অনন্তকে বলল, তার মানে ওঁরা যত খুশি লোক ছাঁটাই করবেন আর তারা যদি বেঁকে দাঁড়ায় তাহলে আমরা মিলিটারী সেজে তাদের ওপর গুলি চালাব। বাঃ কি চমৎকার শৃঙ্খলার নমুনা !

সুনীল বলল, কিন্তু এদেরই বা উপায কি। আমরা যদি অন্যায় আব্দার ধরে বসি, আমাদের সকলকেই এক্ষুনি চাকরি দিতে হবে ! তাহলে এবা করবে কি ? কাজেই শান্তি বজায় রাখতে হলে কড়া হতে হবে বৈকি।

অমল বলল, বেশ বলেছ সুনীল ! শান্তিটা কেবল ওদেরই জন্য। যুদ্ধ বাঁধিয়ে কোটি কোটি টাকার গোলা বারুদ বানিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে ! যুদ্ধের কাজে দেশশুদ্ধ লোককে চাকরি দিতে পারে ! দুর্ভিক্ষ বাঁধিয়ে দেশশুদ্ধ লোককে কাঙালী-ভোজন করাতে পারে ! কিন্তু পারে না কেবল পীস-টাইমে সকলকে চাকরি দিতে ! পেট ভরে খেতে দিতে ! এতো বড় মজার যুক্তি !

খগেন বলে ওঠে, তবে কোন শালা আর মিলিটারীতে থাকে ! ভিখু

মেঙে খাব—সেওবি আচ্ছা, কিন্তু দেশের লোকের ওপর গুলি চালানর জন্য থাকব মিলিটারীতে ? তার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল !

কর্নেলি সাহেবের বক্তৃতা ম্লান হয়ে যায়। ছেলেরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, চোখের ওপর ভেসে উঠছে যুদ্ধপূর্ব যুগের সেই বেকারদশা।

কর্নেলি সাহেব বারকয়েক হাই তুলে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন।

বৈকালিক চায়ের পর কাঠ-কুড়ানর ফেটীগ। জঙ্গলে ঢুকে খগেন অমলকে বলল, চলহে, এই ফাঁকে আমরা একটু ঘুরে আসি। এই জঙ্গলটা পার হলেই মিহিমা। ওইখান থেকে জাপানীরা রিইনফোর্স-মেন্ট-ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল। চল না, গাইডও একজন ঠিক করেছি।

অমল রাজি হতেই মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে খগেন বলল, নাগারা দূরে কাকেও ডাকতে হলে এইরকম শব্দ করে ! দেখনা টাকু এক্ষুনি এসে পড়বে।

বাচ্চা একটী নাগা ছেলে এসে হাজির হল। কোমরে তার একট নেঙটী জড়ান, বাকী সমস্ত দেহটা খালি, হাতে একটা 'নাগা দা', ধারের দিকটা ঝকঝক করছে। বয়স তার আট থেকে ষোল যে কোন একটা হতে পারে। টাকু তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, পাহাড়ের উঁচু-নীচু ভেঙে জঙ্গল ডিঙিয়ে খাদ পেরিয়ে মিনিট পনেরর মধ্যে তারা পেঁছে গেল মিহিমায়। একটা বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে টাকু ভেতরে চলে গেল। সামনে খোলা জানলা দিয়ে খগেন উঁকি ঝুঁকি মেরে বলল, দেখ দেখ আয়না চিরুণী পন্ডস-ক্রীম্ ! এতো দেখছি রীতিমত সাহেব !

অমল বলল, বোধহয় এরা খৃষ্টান।

টাকু ফিরে এসে ওদের দুজনকে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে একটা কাঁচা কাঠের টেবিল, কাঠটা শুকিয়ে ট্যারাবাঁকা হয়ে উঠেছে, তার চারদিকে চারটে ওই একই জাতের চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা মেখলা পাতা, তার ওপর খানকয়েক খৃষ্টের সুসমাচার। ঘরের দেয়ালে কয়েকটা বাইবেলের ছবি এঁটে দেওয়া। অমল আর খগেন পাশাপাশি দুটী চেয়ারে যথাসম্ভব সাবধান হয়ে বসল। ঘরের ভেতর দরজা দিয়ে একজন আধা-প্রৌঢ় নাগা এসে ঢুকলেন। হাত তুলে নমস্কার

করে কথা কইতে গিয়ে খগেন পড়ল বিপদে, কোন ভাষায় কথা কইবে!'
নাগা ভদ্রলোক সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি কথা যা কইলেন, তার অধিকাংশ ইংরেজী আর তার সঙ্গে কিছুকিছু অসমিয়া।
খগেন জানাল, তারা এসেছে জাপানীদের সম্বন্ধে জানতে!
'জাপানী' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক সোজা হয়ে যান, মুহূর্তের মধ্যে চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে ওঠে। সরে গিয়ে তিনি দেখান ঘরের আধপোড়া বাতাগুলো।
অমল জিজ্ঞেস করল, আপনার ঘরে আগুন লাগল কি করে?
নাগা ভদ্রলোক একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে গর্জে উঠলেন, জাপানীরা শয়তান। মুখের ওপর রূঢ় একটা ভাব ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠল, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, কোহিমা আক্রমণ করবার দিনসাতেক আগে ছোট একটা দল জাপানী আমাদের মত পোষাক পরে এই গ্রামে ঢোকে। আমাদের কাছে তারা বলতে সুরু করে আমাদের দুঃখ কষ্টের কথা, বৃটীশের রাজত্বে আমাদের দুর্দশার কথা, রাণী গুই-দালোর ওপর অকথ্য অত্যাচারের কথা। আরও বলল, তারা যে যুদ্ধ করছে সে শুধু বৃটীশদের তাড়াতে। ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের ভাই। নাগাপাহাড় নাগাদের দেশ, সেখানে অন্য কেউ রাজত্ব করবে কেন?
একটু চুপ করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন, আমরাও ভাবলুম, সত্যিই বুঝি তাই! তাদের কথা আমরা বিশ্বাস করলুম, আমাদের বাড়ীতে তাদের লুকিয়ে রাখলুম, তাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলুম। তারা আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিল! আমরাই তাদের কাছে সহরের খবরাখবর এনে দিতে লাগলুম। রোজই তাদের দশ-বিশজন করে লোক বাড়তে থাকে। আমাদের খাবারে টান পড়তে সুরু হয়। এদিকে কোহিমার যুদ্ধও সুরু হয়ে গেল। ওদের লোক আরও বাড়তে লাগল! ওরা তখন আমাদের ওপর জোরজবরদস্তি সুরু করল, আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নিতে লাগল। আপত্তি জানালে ভয় দেখায়, এমন কি দুচারজনকে গুলিও করে।
—দেখতে দেখতে ওরা আমাদের বাড়ীগুলো দখল করতে লাগল! আমাদের খাওয়ার সমস্ত জিনিষ দখল করে নিল! বন্দুক হাতে যাবতীয়

জিনিষ পাহারা দিতে লাগল! নিজেদের খাবার জিনিষ নিজেরা চুরি করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরেছি, দিনের পর দিন আমরা না খেয়ে কাটিয়েছি। কোহিমার লড়াইয়ে তারপর যখন ওরা হারতে সুরু করল তখন ওরা আরও খারাপ ব্যবহার করতে লাগল! তখন ওরা সুরু করল আমাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার। বন্দুকের সঙ্গিন দেখিয়ে ওরা স্বামীর বুক থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়েছে! বাপের সামনে মেয়ের ওপর বলাৎকার করেছে!

চাপাক্ষোভে ভদ্রলোকের শরীরটা যেন ফুলে উঠতে থাকে, চোখ-দুটো কুঁচকে আসে, মুখটা পাথরের মত হয়ে ওঠে। তিনি বলে চলেছেন, এতদিনে আমাদের চোখ ফুটল, আমরাও তৈরী হতে লাগলুম! ঘরে ঘরে অস্ত্র দিলুম! আমাদের ওই একটী মাত্র অস্ত্র 'দাও'! আমাদের ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সকলকেই শক্ত হাতে 'দাও' ধরতে বললুম। লড়াই আমরাও সুরু করলুম। বাড়ীঘর ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ওদের আক্রমণ করেছি! সুযোগ পেলেই ওদের কুপিয়ে মেরেছি! দশজনের প্রাণ দিয়েও ওদের একজনকে মেরেছি! আমাদের মেয়েরা ভীরু নয়, তারাও অস্ত্র ধরল, নিজেদের মানমর্যাদা নিজেরা রক্ষা করতে লাগল। তারপর দেখলুম, জাপানীগুলো পালাতে সুরু করেছে! কিন্তু তখনও তাদের শয়তানি শেষ হয়নি। বাড়ী বাড়ী লুঠ করতে লাগল, যাকে-তাকে গুলি করে মারল, বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল—হঠাৎ তিনি চুপ করলেন। চোখ দুটো তাঁর জ্বলছে আর সেই জ্বলন্ত চোখ সমস্ত ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

অমল আরও একবার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে! প্রথম সে বিভ্রান্ত হয়েছিল বর্মার ইভ্যাকুয়েশন দেখে, তারপর অগষ্ট আন্দোলনের দোটানায় পড়ে আর এই তৃতীয়বার সে বিভ্রান্ত বোধ করছে মরণের এই অফুরন্ত মিছিল দেখে! মানুষ মরেছে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে! মরেছে বর্মা ইভ্যাকুয়েশনে, মরেছে দুর্ভিক্ষের তাড়নায়, মরেছে লাড়ইয়ের ময়দানে। যেন মরাটাই হল মানুষের জীবনে একমাত্র কাজ! প্রশ্নের পর প্রশ্ন বারবার তাকে খোঁচা দিচ্ছে, কেন এই মানুষ-

গুলো মরেছে? কি জন্য মরেছে? কার জন্য মরেছে? মৃত্যুর এই বিরাট জৌলুষ তার মনকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। যুদ্ধের নামে এই নরমেধ যজ্ঞ কার হিতার্থে? কোথায় বসে কারা এই ষড়যন্ত্র ফেঁদে চলেছে?

রবিবারের ছুটী। সকালের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। অমল চুপচাপ শুয়ে আছে। অনন্ত তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, কি হল অমল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছ! বাড়ী থেকে কোন খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?

অমল বলল, না বাড়ীর খবর ভালই, ভাবছি অন্যকথা!

কি কথা?

এই আমাদের জীবনের কথা।

আর কেন মন খারাপ করছ! এইবারতো বাছাধনদের ছাড়তেই হবে।

অমল ঝপ করে উঠে বসে সোজা অনন্তর চোখের ওপর চোখ রেখে বলে, মিলিটারী থেকে ছাড়া পেলেই কি আমাদের মুক্তি? আর কিছুকাল আগেতো আমরা সেখানেই ছিলাম! বাঁচতেতো সেখানে পারিনি! তাইতো এখানে এসে হাজির হয়েছি। তুমি কি মনে কর মিলিটারী থেকে ফিরে গিয়ে আমরা বাঁচতে পারব?

অনন্ত বলল, অতশত ভাবিনি অমল! এখানে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে! তাই একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, এখান থেকে ছাড়া কবে পাব? বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার নতুন করে জীবনকে গড়ে তুলব। লীলা আমায় ক্ষমা করেছে, আবার আমি তাকে নিয়ে ঘর বাঁধব!

অমলের উত্তেজনা মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায়। যে কথা সে অনন্তকে বলতে চেয়েছিল, সে কথা এখনই এই মুহূর্তে বলা চলে না। অনন্তর সুখের নীড় রচনা করার আকুল এই আগ্রহকে দমিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু অনন্ত কি পারবে ঘর বাঁধতে? পারবে কি সে শান্তিতে জীবন কাটাতে?

খগেন তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বলল, নাও হে অমল ইউনিফর্ম পরে নাও— অনন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে অনন্ত! এই দুপুর-বেলা শুয়ে আছ? চল, সহরে ঘুরে আসি, তোমাদের নামে পারমিট নিয়েছি।

বাজারে পেঁছে খগেন বলল, কোথায় আর রাস্তায়রাস্তায় ঘুরে বেড়াব, তার চেয়ে চল সিনেমা দেখা যাক!

অনন্ত বলল, বেঁচে থাকলে বহু সিনেমা দেখতে পাব কিন্তু কোহি-মাতে যে আর কোনদিন আসা হবে না সেকথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

অমল বলল, কোহিমাকে এরা বলে এশিয়ার ষ্টালিনগ্রাদ! চলনা ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।

অনন্ত বলল, ঘুরতে সুরু করাব আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া দরকাব!

ক্যানটীনে ঢুকে ওরা দেখল, এককোণে আসাম-রাইফেলের এক হাবিলদার বসে চা খাচ্ছে! অমল বলল, চল, ওর কাছে গিয়ে বসি, কিছু খবর-টবর ও নিশ্চয়ই দিতে পারবে।

টেবিলটায় গিয়ে বসতে গুর্খা হাবিলদার সাহেব হেসে অভ্যর্থনা করল। খগেন বলল, কোহিমা-লড়াইয়ের গল্প শুনব বলে আপনার কাছে এসে বসলাম হাবিলদার সাহেব।

হাবিলদার সাহেব খুব খুশী, হেসে বললেন, আমি নিজে জাপানীদের সংগে লড়াই করেছি। তখন আমি ছিলাম সিপাই।

অমল বলল, শুনেছি, আপনাদেব রেজিমেণ্টই নাকি শেষ পর্যন্ত জাপানীদেব ঠেকিয়েছিল?

হাবিলদার সাহেব বলল, আলবৎ, প্রথম প্রথমতো আমাদের লড়তেই দেয়নি, সারা কোহিমায় কেবল গার্ড-ডিউটী দিইয়েছে। তারপব বৃটীশ সৈন্যরা যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন আমাদেব নিয়ে এল জাপানীদের কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আমাদেব রেজিমেন্টেব অর্ধেক খতম হয়ে গেল। কিন্তু জাপানীদেব আমরা এক পা'ও এগোতে দিইনি!

অনন্ত বলল, বৃটীশ সৈন্য সব শেষ হয়ে গেল কি করে?

শেষ হবে নাতো কি! ওবা জংগলের মধ্যে না ঢুকে ওপরে বসেই কামান দাগতে লাগল! সে সময় জাপানীরা ঘাপটী মেবে বসে থাকে। যেই ওরা থামে তখন জাপানীরা আচমকা একসংগে চারিদিক থেকে আক্রমণ সুরু করে দেয়। সমস্ত ডিভিসনটা শেষ হয়ে গেল, তবুও ওরা জংগলে

ঢুকল না। ওরা শুধু কোহিমার প্রবেশপথ আটকে বসে রইল।

খগেন বলল, তারপরই বুঝি ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন এল!

না, তারপর এলাম আমরা। আমরা ছোট ছোট দলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, খাদে নামলাম, পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগলাম। আশ্চর্য যুদ্ধ করতে জানে এই জাপানীরা! কোথাও তারা গাছের ওপর উঠে ডালের সঙ্গে নিজের দেহটা বেঁধে নিয়ে মেশিন-গান চালাচ্ছে! কোথাও তারা খাদের মধ্যে নেমে স্নাইপ-সট করছে! কোথাও তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হ্যাণ্ড-গ্রেনেড মারছে! তবুও আমরা এগিয়ে গেলাম, বহু লোকের প্রাণ দিয়ে ওদের অনেকগুলো ঘাঁটি নষ্ট করলাম। তারপর এল ফিফথ-ইণ্ডিয়ান-ডিভিসন। তারা জঙ্গলের মধ্যে আরও বেশী করে ঢুকে পড়ল, আশপাশ দিয়ে, পিছন দিয়ে, জাপানীদের সমস্ত যোগাযোগের রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দিল। তখন জাপানীরা পালাতে সুরু করল, জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, নাগাদের বস্তিতে বস্তিতে ঢুকতে লাগল। কিন্তু নাগারাও তখন জাপানীদের ওপর ক্ষেপে উঠেছে। যে সমস্ত নাগাদের হাতে জাপানী রাইফেল দেখবেন, জানবেন, সে অন্তত একজন জাপানীকেও মেরেছে!

ক্যানটীন থেকে বেরিয়ে চলতে চলতে একটা চত্বরে ওরা পেঁছিল। একপাশে একটা পাথরের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা, হিয়ার দি জ্যাপস ওয়্যার হল্টেড। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য খগেন একটী নাগা যুবককে ডেকে নিয়ে এল। সে বলল, এই জায়গাটা হচ্ছে কোহিমার প্রবেশ-পথ, আর একটু এগিয়ে গেলেই মণিপুর রোড। এখানেই হয়েছিল শেষ লড়াই। আশপাশের গাছগুলো, তার ডালপালা সবই ফিল্ড-গানের গুলিতে গেছে উড়ে। টীনের বাড়ীগুলোর দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত রাইফেলের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে!

নাগা যুবকটীকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতে অনন্ত জিজ্ঞেস করল, লড়াইয়ের সময় তুমি ছিলে কোথায়?

সে বলল, নাগারা পাহাড় ছেড়ে আর কোথাও যায় না। কোহিমার ডি-সি যখন শিলঙে বসে জাপানী মাথাপিছু ত্রিশটাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল তখন তারা জাপানীদের মেরে গ্রাম পরিষ্কার করে ফেলেছে!

যুদ্ধের সময় পালিয়েছিল যত বিলেতি সাহেব আর বিদেশী বাবুরা।

কোহিমাতে এমন বুঝি কোন জায়গা নেই, যেখানে সামনাসামনি হাতাহাতি লড়াই না হয়েছে! লড়াই হয়েছে বস্তিতে বস্তিতে, মিলিটারী ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে। রাস্তার ধুলোবালির সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে বুলেট, এই দেড়বছর পরেও! চারিদিক দেখাতে দেখাতে যুবকটী ওদের নিয়ে গেল মিলিটারী ষ্টোরে। সেখানে তিনজন অফিসার আর চল্লিশজন সৈনিকের উদ্দেশে একটী স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা রয়েছে। তারপর গেল ছোট একটী পার্কের মধ্যে। সেখানেও একটী স্মৃতিস্তম্ভ, নাম-না-জানা সেই সব নাগা শহীদদের উদ্দেশে, জাপানীদের বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র ধরেছিল।

অমল হঠাৎ ফুঁসে ওঠে, ইতিহাসের পাতায় কিন্তু এদের জন্য একটা আঁচড়ও কাটবে না এই বৃটীশরা, কাকেও জানতে দেবে না কোহিমার লড়াই জেতার পেছনে এদের কতখানি সাহায্য রয়েছে!

ধীরে ধীরে ওরা এগিয়ে চলেছে চারিদিকে চাইতে চাইতে, নবজাতকের মত নতুন এই জগৎটাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে! এ জগতে জীবনের কোন কথা নেই, নেই বাঁচার কথা, নেই তাদের আশাআকাঙ্খার কোন আভাষ ইঙ্গিত! এখানে কেবল মৃত্যুর খবর! মৃত্যুর গৌরব যেন জীবন্ত মানুষদের জীবনবোধকে পরিহাস করছে!

সকলেই ওরা মিইয়ে যাচ্ছে, ঝিমিয়ে পড়ছে, চলার তাল শিথিল হয়ে আসছে! দূরে দেখা যাচ্ছে কোহিমা সিমেট্রির বিবাট ষ্টেডিয়াম, ধাপে ধাপে তার সাদা সাদা ক্রসের সারি।

সিমেট্রির প্রথমধাপে পা রেখে অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল! অনন্তর একটা হাত চেপে ধরে বলল, আচ্ছা অনন্ত, এইতো এতদিন মিলিটারীতে রয়েছ কিন্তু কোনদিন কি তোমার মনে শ্রদ্ধা জেগেছে এই যুদ্ধের ওপর?

অনন্ত বলল, শ্রদ্ধা না করি, ভয়তো করেছি!

কিন্তু কেন?

যেহেতু অসহায় বলে। দেখলে না, যুদ্ধ বাঁধল রাজায় রাজায় আর প্রাণ গেল আমাদের মত কাঙালদের।

অমল যেন মনে মনে কি একটা হিসেব করতে থাকে। হঠাৎ অনন্তর

হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, তাহলে কথাটা হল এই—আমরা কাঙাল বলেই কতকগুলো লোক রাজা হয়েছে, আর রাজা আছে বলেই যুদ্ধ বেধেছে?

অনন্ত অমলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর তাকে একহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে বলল, শেষকালে কি একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে অমল!

সদ্যগাঁথা সিঁড়ি দিয়ে ওরা সন্তর্পণে ওপরে উঠছে। সিঁড়ির দুধারে চওড়াচওড়া ধাপের মাঝে কাঁচামাটি, তার ওপর নতুন ঘাস গজিয়েছে। এক একটা ধাপের এক এক অংশে এক একটী রেজিমেন্টের কবর। প্রত্যেকটী কবরের মাথার দিকে একটী করে ক্রস, তার ওপর লেখা সৈনিকদের নাম, রেজিমেন্টাল নম্বর আর তিনটি অক্ষর—আর, আই পি।

খগেন জিজ্ঞেস করল, ওই আর, আই, পি, কথাটার মানে কি?

অনন্ত বলল, রেষ্ট ইন পীস।

অমল বলে ওঠে, কি মারাত্মক রসিকতা দেখ!

খগেন বলল, তার মানে?

তার মানে, যারা এই মানুষগুলোকে ঘরবাড়ী থেকে টেনে এনে মরতে বাধ্য করল, তারাই আজ সেই অভাগা মানুষগুলোর বুকের ওপর লটকে দিয়েছে রেষ্ট-ইন-পীস'এর লেবেল! যেন মরাটাই হল চরম ও পরম শান্তি!

ধাপ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওরা উঠছে, ঘুরে ঘুরে দেখছে সেই ডারহামস! ডি-সি-এল-আই! কে-আর-আর! কিংস-ওন-রেজিমেন্ট! কুইনস-ওন-রেজিমেন্ট! প্রাইভেট থেকে ব্রিগেডিয়ার! অমলের মনে পড়ে সেই মানুষগুলোর কথা, স্বাস্থ্যবান সবল স্বাধীন দেশের মানুষ সেই বৃটীশ সৈনিকদের কথা, যারা আর দেড়বছর আগে মণিপুর রোড স্টেশনে এসে নেমেছিল! তারাও কি তাদের দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল! তারাও কি পীস-টাইমে সকলের জন্য চাকরি চেয়েছিল? পেটভরে খেতে চেয়েছিল? তাই কি আজ তাদের মাটির গর্তে পুতে শান্ত করতে হয়েছে!

খগেন বলে ওঠে, যাই বল ভাই, আমার কিন্তু খুব আহ্লাদ হচ্ছে!

তবুওতো এতগুলো বৃটীশ মরেছে!

অনন্ত যেন আপন মনেই বলে ওঠে, আহ্লাদ করে আর লাভ কি! বৃটীশের রাজত্বও লোপ পায়নি আর আমাদের ওপর জুলুমও একতিল কমেনি! মাঝখান থেকে এতগুলো মানুষ শুধু শুধু মরে গেল!

শেষ ধাপে ওরা এসে পড়েছে। সামনেই এক বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ। খগেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে থাকে,

হোয়েন্ ইউ গো হোম্,
টেল্ দেম্ অফ্ আস্
এ্যান্ড সে—
ফর্ দেয়ার টুমরো
উই গেভ্ আওয়ার টুডে।

খগেন বারবার লেখাটা পড়তে থাকে! তার গলার স্বর ধীরে ধীরে নেমে আসে! আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা ম্লান হয়ে যায়! ব্যাথায় ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে!

অমল, অনন্ত আর খগেনকে জড়িয়ে ধরে বলল, হ্যাঁ অনন্ত, আমরা ফিরে গিয়ে সকলকেই বলব—সক্কলকে বলব, আর না, আর মৃত্যু নয়, আর যুদ্ধ নয়, আমরা বাঁচব—বেঁচে থাকব! এরা মরার মুহূর্ত পর্যন্ত চেয়েছিল আমাদের বাঁচাতে!

ঊনিশ

কোম্পানি হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুম এসেছে চব্বিশঘণ্টার মধ্যে কোহিমা-ডিট্যাচমেণ্ট গুটিয়ে ডিমাপুরে ফিরতে হবে। ছেলেরা কেমন যেন গুম হয়ে গেছে। বারবার তাদের মনে হচ্ছে, আবার যেন তারা নতুন করে কোম্পানিতে ফিরছে।

জাপান সারেণ্ডার করেছে, তাতে ছেলেদের খুশীর অন্ত নেই কিন্তু আনন্দ কববার জন্য ছুটি চায়নি। মনে আছে তাদের, জার্মানী-সারেণ্ডার উৎসবের কথা! মদ খেতে অস্বীকার করায় একজনের চোদ্দ-দিনের কয়েদ!

সুনীল বলল, ফিরছিতো ক্যাম্পে, কিন্তু সেখানেতো দক্ষযজ্ঞ

চলেছে! না জানি আমাদের ভাগ্যেই বা কি আছে!

খগেন বলল, ভাগ্যে যা আছে সেখানে গেলেই দেখতে পাবে!

কিন্তু বেশী দিনতো আর নয়! আরতো মাত্র তিনশ'চুয়াল্লিশ দিন।

অনন্ত বলে ওঠে, দিন গুনলে কি হবে সুনীল তার আগে রসটুকু নিঙড়ে ছিবড়েটা বানিয়ে দেবে!

রবীন তেড়ে ওঠে, তাবলে যা ইচ্ছা তাই করবে! সেটীও হচ্ছে না!

কনভয় ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকল। ট্রাকের মধ্যে থেকে লাফিয়ে উঠে ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল। ক্যাম্পের ছেলেরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল অভ্যর্থনা জানাতে, কোলাকুলি করতে লাগল সকলের সঙ্গে, ছুটোছুটী করে চা নিয়ে এল তাদের জন্য।

হঠাৎ নায়েক রামজীবনের 'ডবল আপ' হাঁক শুনে কোহিমা-ফেরৎ ছেলেরা ঘুরে দাঁড়ায়। প্রায় দশটি ছেলে মাথার ওপর হাত তুলে পিঠঠু প্যারেড করছে। দুপুর রোদে গলগল করে ঘামছে, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, মাথাগুলো তাদের পায়ের তালেতালে লটপট করছে।

নায়েক রামজীবন আবার হাঁকল, ডবল মার্ক টাইম!

কয়েদীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও মাটী থেকে ছ'ইঞ্চি ওপরে পা তুলতে পারছে না, শরীরটা তাদের ক্রমেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। হঠাৎ সুবেদার নন্দী গাছের ছায়া থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এসে ছড়ি নেড়ে বলতে থাকেন, টাং ঔর্ উপর্ উঠাও! ঔর্!

খগেন পাঁচকড়িকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কি?

পাঁচকড়ি, অমল খগেন আর অনন্তকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, তোমরা ফিরে এসেছ এইবার একটা ব্যবস্থা কর, আর পারছি না ভাই!

অমল বলল, সব কথা খুলে বল পাঁচকড়ি!

পাঁচকড়ি বলল, মেজর নেলসন অর্ডার দিয়েছে, যে যে এন-সি-ও সপ্তাহে অন্তত তিনজনকে অর্ডারলি-রুমে পেশ করতে না পারবে, একমাসের মধ্যে তাদের র‍্যাঙ্ক চলে যাবে।

খগেন বলল, তাই এন-সি-ও'রা বুঝি র‍্যাঙ্ক বজায় করছে?

পাঁচকড়ি বলল, তা করছে বটে কিন্তু সকলে নয়। ল্যান্স-নায়েক দত্ত'র র‍্যাঙ্ক চলে গেছে, সিক এন-সি-ও হাবিলদার ব্যানার্জি'রও ওই

একই হাল. জমাদার রামকিষণ ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেছে। আর এদের জায়গায় বি-ও-আর'দের এন-সি-ও করা হয়েছে!

অনন্ত বলল, চালটা দেখছি নতুন!

পাঁচকড়ি বলে চলে, তা নতুনই বটে! কিন্তু তারই জন্য ক্যাম্পের সমস্ত ব্যবস্থাও নতুন হয়ে উঠেছে। ঠিক ছ'টার মধ্যে মশারী না ফেললে সাতদিন কয়েদ। মশারীতে যদি একটা ফুটো থাকে তাহলে তিনদিন, আর বাড়বে ফুটোপ্রতি তিনদিন হিসাবে। মুখে হাতে যদি এ্যাণ্টী-ইন্‌সেক্ট-ক্রীম না মাখ তাহলে পাঁচদিন : সন্ধ্যা হলেই এন-সি-ও'রা ছেলেদের গালে হাত বুলিয়ে মুখ শুঁকে বেড়াবে। প্যারেডে ফল-ইন করতে দেরী করলে মিনিটপ্রতি তিনদিন। দাড়ি ঠিকভাবে কামান না হলে তিনদিন। বিনা হুকুমে ক্যাম্পের বাইরে গেলে চোদ্দদিন, কোন এন-সি-ও'র হুকুম না মানলে আঠাশদিন. আর ভি-সি-ও'র অবাধ্য হলে ফিল্ড পানিশমেণ্ট।

খগেন চোখ কুঁচকে পাঁচকড়ির ক্লান্ত মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, এটা কি শেষ মহড়া নাকি ?

ম্লান হেসে পাঁচকড়ি বলল. আর এসবের ওপর অন্তরীক্ষে ভগবানের মত কাজ করছে তিনজন বি-ও-আর সিকিউরিটি-এন-সি-ও। তারা রিপোর্ট করে খোদ মেজর সাহেবের কাছে আর তাদের রিপোর্টের ওপর ভি-সি-ও'র কমিশনও ঘুচে যেতে পারে।

অমল বলল, তারপর ?

শুনছিতো রিলিজ-রোল তৈরী করার হুকুম এসে গেছে। আমাদের কোম্পানি এখন ষ্ট্যাণ্ড-বাই, যে কোনদিন নাকি মুভ করতে পারি!

খগেন বলল, এটা তাহলে একটা সুখবর বল ?

সব খবরই চাপা পড়ে গেছে খগেন. এদের জুলুমের ঠেলায়। আজকে মনে হচ্ছে, কোম্পানির এ অবস্থাকে বদলাতে যদি না পারি তাহলে বোধহয় আমরা রিলিজও হতে পারব না!

মোটঘাট নামিয়ে, ফেটীগ শেষ করে কোহিমা-ফেরৎ ছেলেরা আবার যে যার ব্যারাকে এসে ওঠে।

সুনীল শিবেনকে জিজ্ঞেস করল. রেলের কাজ কি একেবারে শেষ হয়ে গেছে ?

শিবেন বলল, আর রেলের কাজ! আমাদের দফাই শেষ। কেবল তিনজন ষ্টেশন-মাষ্টার মিলিটারী সংক্রান্ত কাজগুলো দেখাশুনা করে। বাকী সমস্ত ছেলে প্যারেডে। তোরাতো তবুও কটা দিন বেশ মজা লুটে এলি!

স্বরাজ বলল, একটা নতুন জিনিস দেখিসনিতো? কোম্পানিতে হাসপাতাল হয়েছে। সেখানে যত হাতভাঙ্গা, পা-মচকান, মাথায় চোট-লাগা রুগীরা আছে। পাছে বড় হাসপাতালের ডাক্তাররা জানতে পেরে এইসব প্রোগ্রাম বাতিল করে দেয়, সেই ভয়ে মেজর নেলসন আর সুবেদার নন্দী মতলব করেছে, প্যারেডের মাঠে যেসব এ্যাকসিডেণ্ট হবে তাদের পুরে রাখবে কোম্পানির ওই হাসপাতালটীতে!

সুনীল বলল, এমন কি প্যারেড বাবা যে রোজ এত এ্যাকসিডেণ্ট!

কালই বুঝতে পারবে। এদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে অক্ষত শরীরে আর কাকেও বাড়ী ফিরতে দেবে না।

কিন্তু মোদ্দা কথাটা কি! কেন এরা এমন করছে?

আর কেন! লড়ায়ে জিতে ওদের ল্যাজ হয়ে গেছে মোটা! এইবার একপক্কড় দেখে নিচ্ছে!

শিবেন বলল, হেডকোয়ার্টারে আমাদের কোম্পানির নাকি ভীষণ বদনাম হয়েছে! সেখান থেকে নেলসনের কাছে কড়া চিঠি এসেছে, আমাদের জন্য নাকি আশপাশের কোম্পানিগুলোও বিগড়ে যাচ্ছে!

স্বরাজ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, শোন তবে আসল কথা, ভয়ে বাছাধনদের পিলে চমকে গেছে। ৩৩৩ কোম্পানিতে বিদ্রোহ হয়ে গেছে! কোম্পানির সবকটা অফিসারকে রাতারাতি দিয়েছে সাবড়ে!

ব্যারাকে ফিরে বিস্তারা লাগিয়ে ছেলেরা চিঠি লিখতে বসেছে। রিলিজ-রোল তৈরীর খবর সকলেই পেয়েছে। সেই সুখবরটি দেওয়ার জন্য বাড়ীতে চিঠি লেখার ব্যগ্রতা আর বাধা মানে না। একটী ছেলে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কিরে, কি লিখব, আর কতদিনের মধ্যে বাড়ী ফিরছি?

সন্তোষ বলল, ফিরতে আর হচ্ছে না বাছাধন, প্রাণটাকে এখানেই রেখে যেতে হবে!

কেন !

কালই বুঝতে পারবে, পি-টি প্যারেডের নমুনাতো এখনো দেখনি !

আরে হ্যাঃ, জার্মানি জাপানই খতম হয়ে গেল আর এ শালারা কোন ছার ! এইবার এই শালাদের খতম করার পালা !

সন্তোষ উঠে এসে ছেলেটীর কানে কানে ফিসফিস করে বলল, শুনেছিস ৩৩৩ কোম্পানির খবর ?

সে আর শুনিনি ! কাজতো সুরু হয়ে গেছে !

অর্ডারলি এন-সি-ও বলে গেল, কোহিমা থেকে যারা ফিরেছ তারা পাঁচমিনিটের মধ্যে সুবেদার সাহেবের ঘরের সামনে ফল-ইন।

কোহিমা-ফেরৎ ছেলেরা গিয়ে দাঁড়াল। সুবেদার সাহেব বললেন, কোহিমাতে তোমরা খুব ভালভাবে ছিলে শুনে আমি খুশী হয়েছি। তোমরা শুনেছ বোধহয় রিলিজ-রোল তৈরী হচ্ছে ! কিন্তু সেই আনন্দে কোম্পানিটাকে বাড়ী বানিয়ে তুল না। আমি চাইনা কাকেও আটকে রাখতে। কিন্তু আমি সাফ বলে দিচ্ছি, কোনরকম গন্ডগোল আমি বরদাস্ত করব না। মেজর সাহেবও বলেছেন, স্যাপারদের তরফ থেকে একতিল বেয়াদপি বরদাস্ত করবেন না। যদি সত্যিই তোমরা বাড়ী ফিরতে চাও তাহলে মুখটী বুজে কোম্পানির ডিসিপ্লিন মেনে চল।

সুবেদার সাহেবের বক্তৃতা শুনে অমলের মনে হয়, তিনি যা বলছেন তা যেন একটা চ্যালেঞ্জ ! কোম্পানিটা যেন পরিষ্কার দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে ! একদল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, মুখ বুজে তাদের হুকুম তামিল করতে হবে ! আর অপরদল শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেও বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারছে না ! অমল ভাবে, এই দুয়ের মাঝামাঝি কি কোন রাস্তা নেই !

অমল দেখে অফিসারদের পেছনে রয়েছে গভর্ণমেণ্ট, সামরিক বিভাগ, গোলাবারুদ, সবকিছু তাদের মুঠোর মধ্যে। আর স্যাপারের দলে শুধু অনেকগুলো মানুষ ! কিন্তু তাদের অবস্থাটা কি ! বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ! তাদের নিজেদের মধ্যেই অজস্র বিভাগ ! প্রথমেই রয়েছে অফিসারদের কৃপাপুষ্ট ভি-সি-ও আর এন-সি-ও'র দল ! সকলেই তারা নির্মম নয়, তবুও তারা ওই অফিসারদের হাতের পুতুল ! তারপর রয়েছে

এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের দল, ময়ূরপুচ্ছধারি দাঁড়কাক! শেষ পর্যায়ে এসে আজ এদেরই ওপর কোম্পানির সিকিউরিটীর ভার দেওয়া হয়েছে! তারপর রয়েছে সেন্সরসীপের ধারাল কাঁচি! সেই কাঁচির ধারে তাদের মনের সমস্ত খবর, সমস্ত ব্যথা বেদনা ছেঁটে ফেলে, তাদের পোষাক-টাকেই দুনিয়ার চোখে তুলে ধরা হয়েছে! তাই অগষ্ট আন্দোলনের সময়ে আখ্যা পেয়েছে 'দেশের শত্রু', দুর্ভিক্ষের সময় দেশের লোক মনে করেছে তাদের আরাম আর ফূর্তির জন্যই মরেছে লাখে লাখে মানুষ খেতে না পেয়ে! সাধারণ মানুষ জেনেছে তারা বর্বর, তারা পশু, তাদের মধ্যে মানবীয় কোন বৃত্তি নেই!

কিন্তু কোম্পানির মধ্যে এত উত্তেজনা, এত ধৈর্যচ্যুতি আর কখনো সে দেখেনি! আসন্ন একটা দুর্যোগ যেন মাথার ওপর খাঁড়ার মত ঝুলছে!

পাঁচকড়ি আর সাদেক লাইট-আউট'এর পর চুপিসাড়ে অমলের বিছানায় এসে বসল। পাঁচকড়ি বলল, ৩৩৩ কোম্পানির খবর শুনেছ অমল?

আঁতকে উঠে অমল বলল, শুনেছি, কিন্তু কেন?

সাদেক বলল, আপনি একবার বলুন অমলবাবু, দিই শালাদের সাবাড় করে।

অমল সাদেকের হাতটা চেপে ধরে। কি যেন সে বলতে যায়, কিন্তু তার ঠোঁটদুটো বারকয়েক কেঁপে উঠে থেমে যায়, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে।

সাদেক বলল, কি অমলবাবু, ডর লাগছে?

হ্যাঁ সাদেক, আমার খুব ডর লাগছে। আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না, কি করলে এ অবস্থার শেষ হয়!

পাঁচকড়ি বলল, তাহলে?

সেই কথাই বারবার ভাবছি। আজ বারবার জয়ন্তর কথা মনে পড়ছে! মনে হচ্ছে, সে থাকলে বোধহয় একটা রাস্তা বাতলাতে পারত।

সাদেক বলল, তাবলে কি আমরা পড়ে পড়ে মার খাব?

নিশ্চয়ই না, কক্ষনো না! এ অবস্থাকে আমরা বদলাবই। কিন্তু একা একা কেউ কিছু করতে যেও না। সেদিন আমিও ভেবেছিলাম, কয়েদ

মেনে নিয়ে আমি যে আত্মত্যাগ করলুম, তার মধ্যে দিয়ে কোম্পানিতে আসবে সুবিচার! কিন্তু সেদিন তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছিলে সাদেক। একা একা কিছু করা যায় না! কোম্পানির সমস্ত ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে লড়তে হবে—তবেই আমাদের জয় হবে!

কুড়ি

পরদিন সকালে যথারীতি পি-টি হল, কিন্তু নমুনাটা একটু অন্য ধরণের। প্রথমত মাইলদুয়েক একদমে দৌড়ে আসা! তার মধ্যে জনদুই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর দুটো গাছের ডালে দড়ি বেঁধে, সেই দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে নালা পার হওয়া। বয়লার-মেকার শশধর পড়ে গিয়ে হাতে চোট খেয়েছে। তার ডানহাতটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে!

পি-টি ব্রেক-অফফের সময় সুবেদার সাহেব ঘোষণা করলেন, মেজর সাহেব খুশী হয়ে তোমাদের জন্য একটা সুইমিং-পুল মঞ্জুর করেছেন। সেই সুইমিং-পুলের কাজ আজ থেকেই সুরু করতে হবে। আমি কথা দিয়েছি একসপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই একসপ্তাহ প্যারেড মাফ।

ব্যারাকে ফিরতে ফিরতে একজন মন্তব্য করে, প্যারেডতো মাফ, এদিকে কোদাল চালাতে চালাতে যে বাঁধন ছিঁড়ে যাবে! আসলে শালারা আমাদের শাস্তি দিচ্ছে!

আর একজন বলল, সুইমিং-পুল আমাদের জন্য হচ্ছে না আরও কিছু! ওখানেতো মেজর সাহেব তাঁর গোপিনীদের নিয়ে জলকেলি করবেন আর আমরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখব।

সুইমিং-পুলের কাজ সুরু হল। মাপ-জোক করে, পেগ পুঁতে, দড়ি বেঁধে সীমানা ঠিক হল। মাটি কাটার জন্য আই-টি-এ লেবার-ক্যাম্প থেকে এল একশ কোদাল আর একশ ঝুড়ি।

খগেন সকলের কানে কানে বলে গেল, কোদালটা কেবল মাটিতে ঠুকবি কিন্তু মাটি কাটবি না।

কোদালের কোপ পড়ছে ঘনঘন কিন্তু নরম মাটিতেও একইঞ্চির বেশী ফলা বসছে না!

হাবিলদার সরকার বলল, কাটতে যখন হবেই তখন যত তাড়াতাড়ি

কাজ শেষ করতে পার ততই ভাল।

কে একজন বলে উঠল, তাহলে যে মেজর সাহেব আরও বেশী খুশী হয়ে একটা নদী মঞ্জুর করে বসবেন!

সুবেদার সাহেব সাইকেল চড়ে সমস্ত ক্যাম্প এলেকার যাবতীয় কাজ তদারক করে বেড়াচ্ছেন। রোদে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। সুইমিং-পুলের সামনে এসে সাইকেল থেকে নেমে বললেন, এইভাবে কাজ চললে সাতদিন ছেড়ে সাতমাসেও কাজ শেষ হবে না!

ফায়ারম্যান রহমান সেদিন সিক-প্যারেডে ফল-ইন করেছিল। কিন্তু মেজর সাহেবের হুকুম ১০০ ডিগ্রীর নীচে জ্বর হলে কাকেও 'বি ডিউটী' অর্থাৎ হাল্কা কাজ দেওয়া হবে না! তাই রহমানকে ইউনিট-মেডিক্যাল-অফিসার দিয়েছেন 'এম্ এ্যাণ্ড ডি' অর্থাৎ ওষুধ খেয়ে কাজ। কিন্তু রোদের তাপে রহমানের জ্বর বেড়ে যায়। ছেলেরাই তাকে বসিয়ে দেয়।

সুবেদার সাহেব তার দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, এই, তুই যে দিব্যি মজাসে বসে আছিস?

রহমান উঠে এ্যাটেনশান হয়ে বলল, শরীরটা বড় খারাপ লাগতেছে, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম স্যার!

জিরিয়ে নিচ্ছিলে? কে তোকে জিরবার হুকুম দিয়েছে?

হুকুম আর কি নেব একটু জিরিয়ে আবারতো কাম করব!

কাম করবে! নিজের মর্জিমাফিক কাম করবে নাকি? হঠাৎ সুবেদার সাহেব তার ঘাড়টা চেপে ধরলেন।

রহমানের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। সুবেদার সাহেবের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে, সে তার কোদালটার দিকে যাওয়ার জন্য পা তুলল।

সুবেদার সাহেব তার ঘাড় ধরে একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, ওসব চোখরাঙানি আমাকে দেখাসনি, বুঝলি! তোদের চোখ রাঙানিকে আমি বুটের তলায় রাখি।

রহমান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ও বুট আমারও পায়ে আছে!

কি? সুবেদার সাহেব তেড়ে গেলেন রহমানের দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠে রহমানকে আগলে দাঁড়াল।

সাদেক সুবেদার সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, মিলিটারীতে সকলেরই পায়ে বুট আছে স্যার!

নানান দিক থেকে কলরব ফেটে পড়ে, দেনা শালাকে বুটটা দেখিয়ে। হাত তুলে দেখুকতো একবার, শালার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব! দেনা শালার খুলিটা ফাটিয়ে সুইমিং-পুল বানিয়ে!

সুবেদার সাহেব বিস্ফারিত চোখে ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। ক্রমেই ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে উঠছে, রাশ তাদের আলগা হয়ে আসছে। পেছন থেকে তাঁর কানের পাশে একজন বলে উঠল, নেলসনের কুত্তাব সঙ্গে অত কথার দরকার কি! দাও ৩৩৩ কোম্পানি বানিয়ে!

সুবেদার সাহেব আর ঘাড় ফেরালেন না, দৌড়ে গিয়ে সাইকেলটায় লাফিয়ে উঠলেন। পেছন থেকে ছেলের দল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

জনদুয়েক এন-সি-ও এতক্ষণ ভীড়ের মাঝখানে ঘাপটী মেরে ছিল, বলল, তোমরা বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করে বসলে!

একটী ছেলে বলে উঠল, তোমাদের কোন ভয় নেই নায়েক সাহেব ও শালাদের আমরাই সায়েস্তা করব।

কোদাল ফেলে ছেলেরা জটলা সুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে হাবিলদার সরকার এসে ছুটী দিয়ে দিল। একজন বলে উঠল, দেখলিতো, শালারা ভয় পেয়ে গেছে। বুঝলিনা, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!

ছুটী পেয়ে যাওয়ায় ছেলেরা ভীষণ খুশী। তাই ব্যারাকে বসে না থেকে কেউ কেউ স্নান করতে গেছে, কেউ গেছে কাপড়ে সাবান দিতে, কতক গেছে চুল ছাঁটতে, এমনিভাবে ছেলেরা পড়েছে ছড়িয়ে। এরই একফাঁকে হাবিলদার সরকার রহমানকে ডেকে নিয়ে গেছে অফিসে।

খবর পেয়ে অমল সাদেক পাঁচকড়ি স্বরাজ সকলেই গুম হয়ে বসে আছে। পরপর দুজন সিকিউরিটী এন-সি-ও তাদের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে।

স্বরাজ বলল, শালারা আমাদের ওপর নজর রাখছে।

খগেন বলল, তাহলে নিশ্চয়ই রহমানকে ফাঁসাবে।

পাঁচকড়ি খেঁকিয়ে ওঠে, তা নাতো রহমানের ওপর খুশী হয়ে তাকে ল্যান্স-নায়েক বানাবার জন্য নিয়ে গেছে নাকি!

একজন সেণ্ট্রী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল রহমানকে আঠাশ-দিনের ফিল্ড-পানিশমেণ্ট দিয়েছে! অর্ডারলি-রুমে রহমানকে ভীষণ মেরেছে, এখনও তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

সাদেক বলল, রহমানের ফিল্ড-পানিশমেণ্ট আমরা হতে দেব না।

অনন্ত বলল, কেমন ভাবে?

অমল বলল, রহমানকে আমরা ছিনিয়ে আনব!

পাঁচকড়ি লাফিয়ে উঠল, ঠিক হ্যায়! আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে!

অনন্ত সেণ্ট্রীকে বলল, তোমরা কি করবে?

সেণ্ট্রীর চোখদুটো চকচক করে ওঠে। সে বলল, গার্ড-কমাণ্ডার বাদে সেণ্ট্রী আর কয়েদী মিলিয়ে আমরা একুশজন আছি!

রহমানের ফিল্ড পানিশমেণ্ট—বেলা একটার সময়! রহমানকে শাস্তি দিয়ে মেজর নেলসন কোম্পানিতে একটা নমুনা খাড়া করতে চান, কোম্পানির ছেলেদের সায়েস্তা করতে চান, আবার ডিসিপ্লিন ফিরিয়ে আনতে চান।

খেতে বসেছে ছেলেরা ডাইনিং হলে লাইন বেঁধে পাশাপাশি। একটী ছেলে বলে, কেন, ডিসিপ্লিন কি কোম্পানিতে নেই নাকি!

তার পাশের ছেলেটী জবাব দেয়, কোথায় আর ডিসিপ্লিন! আমরা যদি পোকামাকড়ের মত ওদের বুটের তলায় পড়েই না রইলুম তবে আর ডিসিপ্লিনটা কোথায়!

ফিসফিসানি চলেছে সর্বত্র। সকলেই শুনেছে রহমানের ফিল্ড-পানিশমেণ্টের কথা। একজন জিজ্ঞেস করল, ফিল্ড-পানিশমেণ্টটা আবার কি রকম!

তার সাথি জানাল, অফিসের কেরাণীবাবুরা বলেছে এমন কিছুই নয়, কেবল একঘণ্টা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবে।

ছেলেটী মুখে ভাত তুলতে যাচ্ছিল, আতঙ্কে তার হাত কেঁপে উঠল, ভাতগুলো ঝরঝর করে পড়ে গেল মাটিতে। বলল, তার মানেতো ফাঁসি। যাঃ, সে হতেই পারে না! শুধুশুধু রহমানকে এত কড়া শাস্তি

দিতেই পারে না! হাজার হোক এরা মানুষতো!

সাথি তার ফুঁসে ওঠে, এখনও এদের মানুষ মনে করিস! এরা মানুষ নয়, এরা অফিসার! আমরা খেটে মরি এদের প্রমোশন হয়! আমরা প্রাণ দিই এরা বীরত্বের মেডেল পায়! আর আমরা মাথা উঁচু করলে বুটশুদ্ধ লাথি মেরে আমাদের মাথা থেঁতলে দেয়!

সুবেদার সাহেব একটা হান্টার হাতে খাওয়া পরিদর্শন করতে এসেছেন। সারবাঁধা ছেলেদের সামনে দিয়ে তিনি গটমট করে হেঁটে চলে যান। রবীন কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমিন তাকে ঠেলা মেরে বলল, কিরে, চোখ দিয়ে যে তুই গিলে ফেলবি দেখছি।

রবীন বলল, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস? ইচ্ছে করছে, লাফিয়ে ওই শালা কুত্তার টুঁটিটা কামড়ে ধরি! মবারকের যতটা রক্ত মাটির ওপর পড়েছিল ঠিক ততটা চুষে নিয়ে মবারকের কবরের ওপর ছড়িয়ে দিই!

খগেন ভাতের প্লেট নিয়ে রবীনের সামনে এসে বলল, রবীন, রহমানের ফিল্ড-পানিশমেণ্ট আমরা হতে দেব না, তাকে আমরা ছিনিয়ে আনব।

সুনীল কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। খগেনকে ডেকে বলল, কি দরকার খগেন এতসব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার! ঘরে ফেরার দিনতো এগিয়ে এসেছে! আর এই ক'টা দিন কোনরকমে মুখ বুজিয়ে কাটিয়ে দিলে হয় না?

খগেন কোন উত্তর না দিয়ে রবীনের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, সুনীলের ওপর নজর রাখবে রবীন, ভয় পেয়ে ও সমস্ত কথা হয়তো ফাঁস করে দিতে পারে।

গার্ডরুম থেকে একজন সেণ্ট্রী এসেছে ভাত নিতে। জনকয়েক তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করল, রহমান কেমন আছে রে?

সেণ্ট্রী বলল, রহমান চাঙ্গাই আছে। ভুলিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অফিসঘরের মধ্যে। অনেক কথাই রহমানকে জিজ্ঞেস করেছে! ও কিন্তু একটা কথাও বলেনি। তাইতে ক্ষেপে গিয়ে মেজর সাহেব আর সুবেদার সাহেব দুজনে মিলে রহমানকে মেরেছে! এমন মেরেছে যে তার

মুখ দিয়ে রক্ত ছুটেছে, তার দাঁতগুলো সব নড়বড়ে হয়ে গেছে! জানিস্, রহমান ভাতের থালা মুখের সামনে নিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে, একমুঠো ভাতও মুখে দিতে পারেনি!

যারা শুনছিল, তারা স্তম্ভিত হয়ে সেণ্ট্রীর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তাদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, রহমান যখন খেতে পারেনি তখন আমরাও খাব না! আগে এর একটা বিহিত করব তবে ভাত মুখে দেব।

হুড়মুড় করে অনেকগুলো ছেলে ডাইনিং-হল থেকে বেরিয়ে অফিস-ঘরের দিকে চলতে থাকে। পাঁচকড়ি তাদের বলে, আর একটু অপেক্ষা কর ভাই! বেলা একটা পর্যন্ত! তারপর রহমান আমাদেরই সঙ্গে বসে খাবে! রহমানকে আমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসব।

সমস্ত কোম্পানিটা যেন ফুঁসে উঠছে। খাওয়ার পালা শেষ করে ছেলেরা ব্যারাকে ফিরেছে, তখনও প্রায় একঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার সময় আছে। তবুও ছেলেরা একজায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না, আরাম করে শুতে পারছে না! কখনো বসছে, কখনো শুচ্ছে, আবার তখনই উঠে ব্যারাকের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত টহল দিচ্ছে!

কোয়ার্টার-গার্ডের পেটা-ঘড়িতে একটার ঘণ্টা পড়ল! ছেলেরাও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একজন দুজন করে একে একে ছেলেরা এক আর তিননম্বর ব্যারাকে এসে জমা হচ্ছে। ওখান থেকে প্যারেড-গ্রাউণ্ডের সবটাই দেখতে পাওয়া যায়।

মেজর নেলসন, সুবেদার নন্দী, হাবিলদার সরকার প্যারেড-গ্রাউণ্ডের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। নায়েক রামজীবন রহমানকে কোয়ার্টার-গার্ড থেকে নিয়ে আসছে। গার্ড-কমাণ্ডার আসছে দড়িদড়া নিয়ে।

ছেলেরা দুচোখ বিস্ফারিত করে দেখছে রহমানকে, তাদের অতি আপনার রহমান! রহমানের সমস্ত মুখটা ফুলে উঠেছে, চোখদুটো তার টকটকে লাল! তবুও রহমান মাথা উঁচু করে হেঁটে আসছে! না না, রহমান ভয় পায়নি, ঘাবড়ে যায়নি! রহমান বোধহয় জানতে পেরেছে, আজ আর সে একা নয়! কোম্পানির প্রতিটি সাধারণ সৈনিক আজ তার ফিল্ড-পানিশমেণ্ট প্রতিরোধ করবে! তারা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে! ফিরিয়ে

নিয়ে আসবে তাদের গরম বুকের মধ্যে!

রহমানকে বাঁধাবাঁধির কাজ সুরু হয়ে গেছে। নির্জীব রহমান শুধু বারকয়েক ব্যারাকগুলোর দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে, চোখদুটো জ্বালা করতে সুরু করেছে!

নায়েক রামজীবন রহমানের হাতদুটো পিছমোড়া করে গোলপোষ্টের সঙ্গে বেঁধে দিল। সুবেদার সাহেব এগিয়ে গিয়ে উদ্বৃত্ত দড়িটুকু দিয়ে রহমানের সমস্ত শরীরটা গোলপোষ্টের সঙ্গে জড়াতে সুরু করলেন।

মেজর নেলসন নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা মাটিতে আছড়ে ফেলে সুবেদার সাহেবের হাত থেকে দড়িটা টেনে নিয়ে বললেন, এইসা নহি সুবেদার সাব—বলে রহমানের গা থেকে দড়ির পাকগুলো খুলে ফেললেন। হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় টানতে টানতে গোলপোষ্টের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। ক্রসবারের ওপর দড়িটা ছুড়ে দিয়ে বললেন, হ্যাং দি ব্লাডি রোগ্!

সুবেদার সাহেব রহমানের পিছমোড়া বাঁধন খুলে, হাতদুটো মাথার ওপর জোড়া করে বেঁধে দিলেন। ক্রসবারের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়া দড়ির প্রান্তটা ধরে একটা টান দিয়ে মেজর নেলসন বললেন, পুল নন্দী!

দড়ি ধরে সুবেদার সাহেব টানতে লাগলেন। রহমানের শরীরটা সোজা টানটান হয়ে গেল, কিন্তু মাটীর ওপর উঠল না।

মেজর নেলসন রহমানের সামনে এসে বললেন, জাম্প—কুদো—

নায়েক রামজীবন আর সুবেদার নন্দী পেছন দিকে হেলে পড়ে দড়িটা ধরে টানছেন। যন্ত্রণায় রহমানের মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠেছে! সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে!

মেজর নেলসন ষ্টাফটা নেড়ে মারতে যাওয়ার ভঙ্গিতে ধমক দিলেন, আই সে, জাম্প—ব্লাডি তুম্ জল্দি কুদো—

রহমান লাফ দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, সমস্ত শরীরটা তার থরথর করে কেঁপে উঠল।

হাবিলদার সরকার ঠোঁট কামড়ে একধারে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব তাকে ধমক দিলেন, ক্যা, মজা দেখ্তা? লিফ্ট হিম্ এবভ্ দি গ্রাউন্ড!

তিনজনে মিলে দড়ি ধরে টানছে। মনে হল, রহমানের শরীরটা যেন আরও খানিকটা ওপরে উঠে গেল, কেবল পায়ের ডগাটা তখনো মাটিতে ঠেকে আছে।

মেজর নেলসন ষ্টাফটা দিয়ে রহমানের পেটে একটা গুঁতো মেরে বললেন, ব্লাডি তুম্ নহি কুদেগা তো ম্যায় তুম্কো ডাণ্ডা লাগায়গা!

রহমান আরও একবার চেষ্টা করল। চেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ তার দেহটা কেবল নড়ে উঠল।

মেজর নেলসন তেড়ে গিয়ে তার হাঁটুর ওপর ষ্টাফ দিয়ে একটা ঘা বসিয়ে দিলেন।

রহমান আর্তনাদ করে উঠল, ওঃ মা—

সুনীল বলে উঠল, না না, বসে বসে আর এ দৃশ্য দেখা যায় না!

রবীন মুহূর্তের জন্যও সুনীলের পাশ থেকে নড়েনি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দেখতে ভাল না লাগেতো চোখ বুজে থাকুন!

সুনীলের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে, অস্বস্তিতে সে ছটফট করছে! বারবার সে রহমানের দিকে তাকাচ্ছে, আবার তখনই ব্যারাকের মধ্যে ছেলেদের মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

গোলপোষ্টের ক্রসবারটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে। মেজর নেলসন সুবেদার সাহেবকে তাড়া দিয়ে উঠলেন, নন্দী, জোরসে খিঁচো—

সুবেদার নন্দী মাটিতে গোড়ালি লাগিয়ে, পেছন দিকে হেলে পড়ে এক হেঁচকা দিলেন। রহমানের শরীরটা মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে গেল। রহমানের আর্তনাদ সমস্ত ক্যাম্পটাকে বিদীর্ণ করে ফেলল, উঃ, মা—গো!

সুনীল মাচা থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল। রবীনের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, আর দেরী কেন! চল, শিগগীর চল—

তিননম্বর ব্যারাক থেকে আওয়াজ উঠল, বৃটীশ—ভারত ছাড়!

সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবকটা ব্যারাক থেকে আওয়াজ ফেটে পড়ল, বৃটীশ—ভারত ছাড়!

প্রত্যেকটা ব্যারাক থেকে আওয়াজ উঠেছে, ছেলেরা উল্কার মত ছুটে চলেছে প্যারেড-গ্রাউণ্ডের দিকে। মাঠের মাঝখানে সমস্ত কোম্পানিটা

বজ্রনিনাদে ঘোষণা করল, বৃটীশ—ভারত ছাড়!

উন্মত্ত ছেলেরা রহমানকে ঘিরে ধরেছে. তুলে ধরেছে তাদের বুকের ওপর. চেপে ধরেছে তাদের গরম বুকের মাঝখানে! হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দড়িটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, সকলে মিলে দিয়েছে তাতে আগুন লাগিয়ে! গোল-পোস্টের বাঁশগুলো টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়েছে! রহমানের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে বুকের ওপর নিয়ে মাঠময় ছুটোছুটি করছে! লাফাচ্ছে! নাচছে! হাসছে! কাঁদছে! চেঁচাচ্ছে! চিৎকার করছে .

সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে মেজর নেলসনের আর্তনাদ ভেসে উঠল, সুবেদার সাব. সেভ্ মি!

সুবেদার নন্দী তখন দৌড়চ্ছেন. ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছেন কোয়ার্টার-গার্ডের দিকে!

গেটের সামনে পৌঁছতেই সেণ্ট্রী তার সমস্ত শক্তি গলায় ঢেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল. হল্ট—